প্রবাস বন্ধু

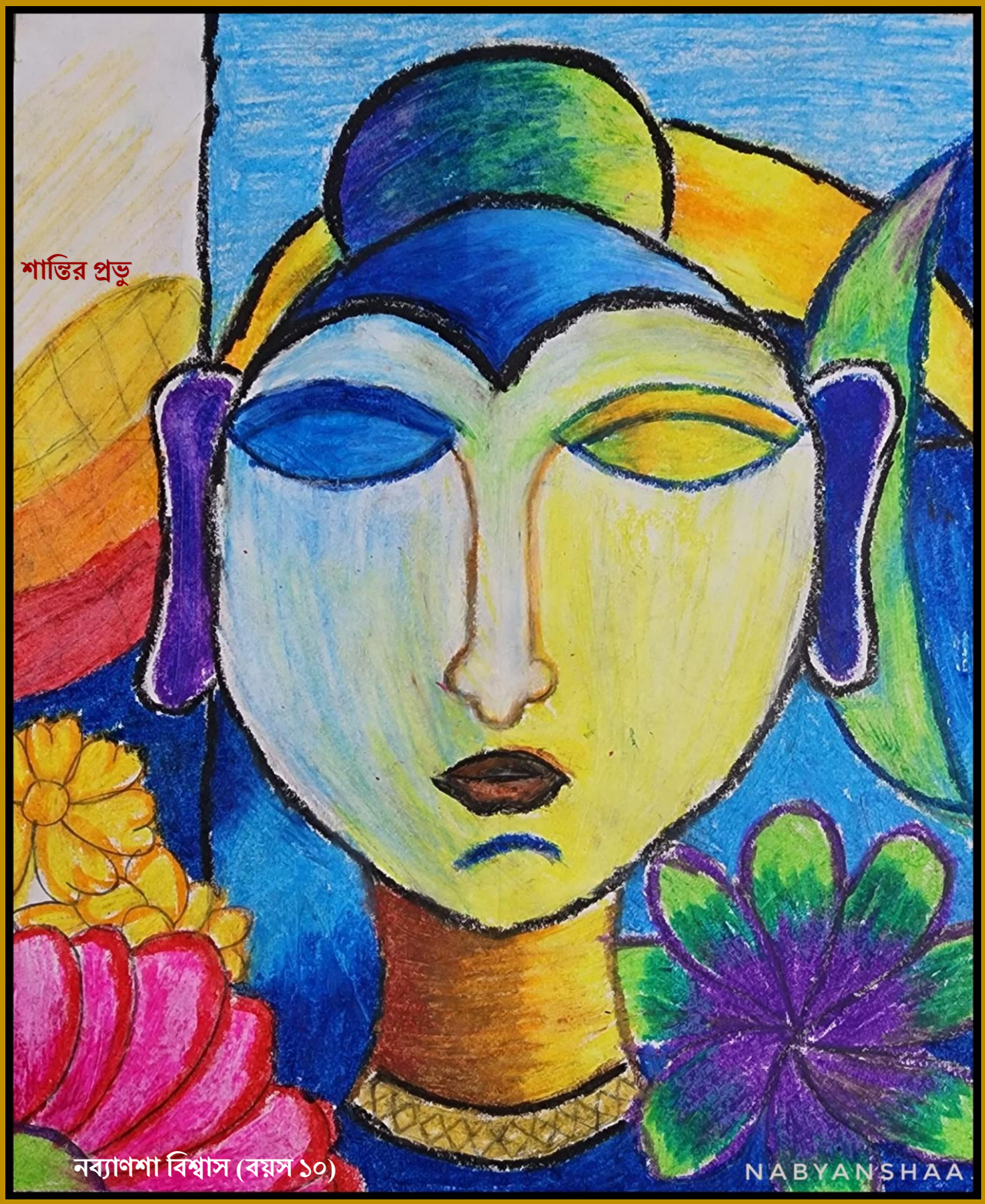

শারদীয়া সংখ্যা ১৪৩২

৯ ১৪৩২ প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : শারদীয়া সংখ্যা 2025 ৯

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	2
গদ্য		
দুর্গাকথা	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	3
যুধিষ্ঠির এবং পাশাখেলা	ডাঃ শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত)	9
তিন তপস্বী মূল গল্প: (The Three Hermits) লিও টলস্টয়	তর্জমা: সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	13
অ্যানা প্যাবলোভনা	বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	18
ধাতু ও মানব সভ্যতা	উদয় চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	26
ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	28
ভারতের নারীবাদী আন্দোলন	সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	29
বাঁচিয়ে রেখো	আশীষ দত্ত রায় (মানালি, ভারত)	36
ফিরে পাওয়া	অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস (ফিনিক্স, অ্যারিজোনা)	38
অন্তরকথা	বিষ্ণুপ্রিয়া (ইউ এস এ)	55
সিধুজ্যাঠার সঙ্গে সিনসিন্যাটিতে	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	59
কালক্রমিক চিরকালীন আধুনিক	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	63
আকাশে ওড়ার বিড়ম্বনা	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	73
হকুণ্ড'র দার্জিলিং ভ্রমণ	স্যমন্তক দত্ত (কলকাতা, ভারত)	76
চিলে কোঠার আয়না: দ্বিতীয় পর্ব	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	77
দুটি পাতা একটি কুঁড়ি	শান্তনু চক্রবর্তী (এডিনবার্গ, টেক্সাস)	79
খোলা মনে	প্রদ্যুৎ কুমার গুপ্ত (লস্ অ্যাঞ্জেলস্, ক্যালিফোর্নিয়া)	81
আমার মা	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	84
কলহ	সিদ্ধার্থ সিংহ (কলকাতা, ভারত)	87
চারশো কত যেন...	আনন্দিতা চৌধুরী (ইস্ট ব্রান্সউইক, নিউ জার্সি)	90
একলা পথ	বাপন দেব লাড়ু (মেদিনীপুর, ভারত)	92
কবিতা		
মনসঙ্গীত ১, মনসঙ্গীত ২	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	39
যাত্রাপথের গান	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	40
একটা জন্ম	সুপর্ণা বসু (কলকাতা, ভারত)	40
শারদীয়া, স্মৃতি, চলাচল, যান্ত্রিকতা	পারমিতা বসু (কলকাতা, ভারত)	41
আয়নার আলো, আজ এখন, গানের পাখি	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	42, 43
এখনো স্বপ্ন	ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	43
শিশুর স্বর্গ	স্বাতী বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	44
ঘুম	অজয় সাহা (কলকাতা, ভারত)	44
ইচ্ছা ছিল রাজা হব, সুনীতি ও দুর্নীতির বাজার, বাংলাদেশে এরা কারা	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	45, 46
ফাঁকি, বিজ্ঞ	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	48
ভাঙা মুজিবর, বত্রিশ নম্বর, আগস্টের অভিশাপ, রক্ত দাও	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	49, 50
একটি উদ্দেশ্যের মৃত্যু	নূপুর রায়চৌধুরী (অ্যান আর্বার, মিশিগান)	51
নামহীন নীরবতা	বাপন দেব লাড়ু (মেদিনীপুর, ভারত)	51
অনুরাগের ছোঁয়া	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	52
জমাট ভালবাসা	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	52
দূরত্ব	অযান্ত্রিক (কলকাতা, ভারত)	53
শেষ কোথায়	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	54

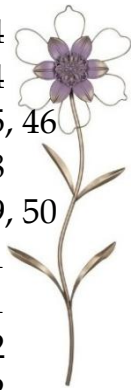

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন ১৪৩২, অক্টোবর ২০২৫

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ (হিউস্টন, টেক্সাস)

প্রচ্ছদ চিত্র:

নব্যাণশা বিশ্বাস (বয়স ১০)

কার্যনির্বাহী সদস্য:

চন্দ্রা দে

শ্যামলী মিত্র

অসিত কুমার সেন

সুজয় দত্ত

মালবিকা চ্যাটার্জী

প্রবাস বন্ধু পত্রিকা কেবলমাত্র

‘প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট’-এ প্রকাশিত হয়

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদকীয়

আমরা প্রায়শই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আমাদের স্বপ্ন আর মনের ইচ্ছেগুলোকে সাজিয়ে একান্তই নিজের একটা বৃত্ত বা জগৎ তৈরী করে রাখি। সেটা যে তাসের ঘর তা সম্পূর্ণরূপে বলতে পারি না; কিন্তু সেটা হয়তো নানান ক্ষেত্রে বাস্তবতার সঙ্গে মিলে যায় না। তাতে অবশ্য আমরা আশাহত হই না, আমাদের এটুকু বুঝবার ক্ষমতা আছে যে স্বপ্ন এবং বাস্তব সবসময় হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না। কল্পিত জগৎটা খানিক ভুলত্রুটি বর্জিত। আর বাস্তব চলে বহুজন, বহুমত সঙ্গে নিয়ে; সেখানে অবশ্যই বিভিন্ন গতিবিধি চলতে থাকে, যার সবটা আমাদের মনঃপুত নাও হতে পারে। তবে তাই বলে তো আর মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না, ধীর চিত্তে সমস্ত অবস্থার মোকাবিলা করতেই হয়। বলা বাহুল্য আমাদের পথ মসৃণ নয়, ইদানীং নানারকম উৎকণ্ঠা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। আশা রাখি ঈশ্বরের শান্তিবারি বর্ষিত হবে তৃষিত পৃথিবীর উপর।

মা দুর্গার আরাধনা বাঙালির বিশেষ উৎসব। সেখানে যেমন সকলে বিরোধিতা দূরে রেখে আনন্দে মেতে ওঠে, তেমনই যদি এই অকলুষিত চিত্র বছরব্যাপী বিরাজ করে তো বেশ হয় – এবং তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের সবার।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী নব্যাণশা বিশ্বাস; বয়স ১০ বছর। ছবিটি বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গৌতম বুদ্ধের সাথে শান্তি ও আনন্দের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এখন নানা দেশে নানান অশান্তি নব্যাণশাকে বিচলিত করে; তাই এই ছবিটি আঁকার প্রেরণা আসে... । শান্তির প্রভু, বুদ্ধ যথার্থই শান্তির প্রতীক, আর সেটিই নব্যাণশার তুলিতে ধরা পড়েছে! প্রাণজিৎ ও অনিন্দিতা বিশ্বাসের কন্যা নব্যাণশা। এই বিশ্বাস পরিবার তাদের জীবনের খানিকটা সময় হিউস্টনে কাটিয়েছে। বর্তমানে তাদের ঠিকানা ফিনিক্স, অ্যারিজোনায়। নব্যাণশাকে আমাদের অনেক ধন্যবাদ ও ভালবাসা জানাই।

সকল পাঠককে পত্রিকার পক্ষ থেকে শারদীয়া শুভেচ্ছা জানাই।

মালবিকা চ্যাটার্জী

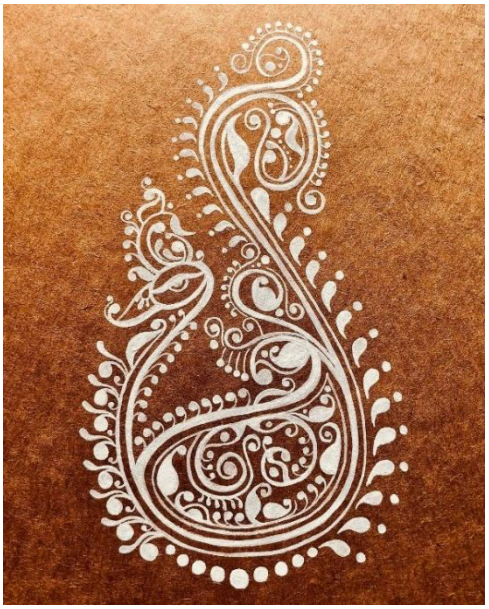

পত্রিকায় ব্যবহৃত অনুল্লিখিত ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

দুর্গাকথা

কৃষ্ণা গুহ রায়

"বাজল তোমার আলোর বেণু"

বাঙালিদের কাছে দুর্গাপূজা একটি মহোৎসব | জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই পূজা সার্বজনীন | কাশফুল, বাতাসে শিউলির গন্ধ মেখে প্রতি বছর শরৎকালে মা দুর্গা আসেন |

পুরাণে বলা আছে বসন্তকাল হচ্ছে দেবী দুর্গার পুজো করার আসল সময় | কিন্তু রাবণকে বধ করার জন্য রামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর আবাহন করেন তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য | সেজন্য এই পুজোকে অকাল বোধন বলা হয় | প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে দেবী দুর্গা অনেক প্রাচীন দেবী | আদতে দুর্গাপুজোর সূচনা যে কবে হয়েছিল সেই নিয়ে মতান্তর আছে | তবে অবিভক্ত বাংলায় ধনী বাড়িগুলোতে খুব সম্ভবত মোঘল আমল থেকেই দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল | প্রায় ২২ হাজার বছর পূর্বে ভারতের প্যালিওলিথিক জনগোষ্ঠী থেকেই দেবীপুজা প্রচলিত | ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যায় ভারতবর্ষে দ্রাবিড় সভ্যতার সময় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল | আবার সিন্ধু সভ্যতায় দেবীমাতার, ত্রিমস্তক দেবতা, পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল | তবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দুর্গাপুজোর উল্লেখ আছে | এগারোশ শতকে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'তে দুর্গাবন্দনা পাওয়া যায় | ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, কৃষ্ণ প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন | বিভিন্ন দেবদেবীরা কীভাবে দুর্গাপূজা করেছিলেন, তার একটি তালিকা এই পুরাণে পাওয়া যায় | তবে এই প্রসঙ্গে কোনো পৌরাণিক গল্পের বিস্তারিত বর্ণনা পুরাণে দেওয়া হয়নি | বলা হয়েছে –

প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা |
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদ্যৌ গোলকে রাগমণ্ডলে |
মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ |
ত্রিপুরপ্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা |
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেন শাপাদ্দুর্বাসসঃ পুরা |
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী |
তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্দেবৈশ্চ মুনিমানবৈঃ |
পূজিতা সর্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা |

অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমাত্মা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের আদি-বৃন্দাবনের মহারাসমণ্ডলে প্রথম দুর্গাপূজা করেন | এরপর মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে ব্রহ্মা দ্বিতীয় দুর্গাপূজা করেছিলেন | ত্রিপুর নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শিব বিপদে পড়ে তৃতীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেন | দুর্বাসা মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে ইন্দ্র যে পূজার আয়োজন করেছিলেন, সেটি ছিল চতুর্থ দুর্গাপূজা | এরপর থেকেই পৃথিবীতে মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ, দেবতা ও মানুষেরা নানা দেশে নানা সময়ে দুর্গাপূজা করে আসছেন |

শাক্তধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু পৃথিবীর শাসক হয়ে ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে দুর্গার মাটির মূর্তি তৈরি করে পূজা করেন | এই সময় তিনি 'বাগ্‌ভব' বীজ জপ করতেন এবং আহার ও শ্বাসগ্রহণ ত্যাগ করে একপায়ে দাঁড়িয়ে একশ বছর ধরে ঘোর তপস্যা করেন | এর ফলে তিনি শীর্ণ হয়ে পড়লেও, কাম ও ক্রোধ জয় করতে সক্ষম হন এবং দুর্গানাম চিন্তা করতে করতে সমাধির প্রভাবে স্থাবরে পরিণত হন | দুর্গা প্রীত হয়ে তাঁকে বর দিতে আসেন | মনু তখন দুর্লভ একটি বর চাইলেন | দুর্গা সেই প্রার্থনা রক্ষা করেন | সেই সঙ্গে দুর্গা তাঁর রাজ্যশাসনের পথ নিষ্কন্টক করেন এবং পুত্রলাভের বরও দেন মনুকে |

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যতগুলি পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পটি পাওয়া যায় শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যম্-এ | এই গল্পটি হিন্দুরা এতটাই মান্য করে যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাঠ দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছে | দেবীমাহাত্ম্যম্ আসলে মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি নির্বাচিত অংশ | এতে তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশটি শ্লোক আছে | এই বইতে দুর্গাকে নিয়ে প্রচলিত তিনটি গল্প ও দুর্গাপূজা প্রচলনের একটি গল্প রয়েছে | প্রতিটি গল্পের মূল চরিত্র দুর্গা |

রাজা সুরথের গল্প –

রাজা সুরথের গল্পটি শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রধান তিনটি গল্পের অবতরণিকা ও যোগসূত্র | সুরথ ছিলেন পৃথিবীর রাজা | সুশাসক ও যোদ্ধা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল | কিন্তু একবার এক যুদ্ধে এক যবন জাতির হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে | সেই সুযোগে তাঁর মন্ত্রী ও সভাসদেরা তাঁর ধনসম্পদ ও সেনাবাহিনীর দখল নেয় | সুরথ মনের দুঃখে বনে চলে যান | বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মেধা নামে এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন | মেধা রাজাকে

সমাদর করে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দেন | কিন্তু বনে থেকেও রাজার মনে সুখ ছিল না | সব সময় তিনি তাঁর হারানো রাজ্যের ভালমন্দের কথা ভেবে শঙ্কিত হতেন | এমন সময় একদিন রাজা সুরথ বনের মধ্যে সমাধি নামে এক বৈশ্যের দেখা পেলেন | তাঁর সঙ্গে কথা বলে সুরথ জানতে পারলেন, সমাধির স্ত্রী ও ছেলেরা তাঁর সব টাকাপয়সা ও বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে | কিন্তু তাও তিনি সবসময় নিজের স্ত্রী ও ছেলেদের কল্যাণ-অকল্যাণের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হন | তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগল, যারা তাঁদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, তাদের প্রতি এঁদের রাগ হচ্ছে না কেন? কেনই বা তাঁরা সেইসব লোকেদের ভালমন্দের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হচ্ছেন? দুজনে মেধা ঋষিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, ঋষি বললেন, পরমেশ্বরী মহামায়ার প্রভাবেই এমনটা হচ্ছে | সুরথ তাঁকে মহামায়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি একে একে তাঁকে তিনটি গল্প বলেন | এই গল্পগুলিই শ্রীশ্রীচণ্ডী-র মূল আলোচ্য বিষয় | বইয়ের শেষে দেখা যায়, মেধার গল্প শুনে সুরথ ও সমাধি নদীর তীরে তিন বছর কঠিন তপস্যা ও দুর্গাপূজা করলেন এবং শেষে দুর্গা তাঁদের দেখা দিয়ে সুরথকে হারানো রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং বৈশ্যকে তত্ত্বজ্ঞান দিলেন |

মধুকৈটভের কাহিনী –

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে মধুকৈটভের উপাখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে | প্রলয়কালে পৃথিবী এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হলে বিষ্ণু সেই সমুদ্রের উপর অনন্তনাগকে শয্যা করে যোগনিদ্রায় মগ্ন হলেন | এই সময় বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য নির্গত হয়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে স্থিত ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হল | ভীত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্যে তাঁর নয়নাশ্রিতা যোগনিদ্রার স্তব করতে লাগলেন | এই স্তবটি গ্রন্থে উল্লিখিত চারটি প্রধান স্তবমন্ত্রের অন্যতম | এই স্তবে সন্তুষ্টা দেবী বিষ্ণুকে জাগরিত করলে তিনি পাঁচ হাজার বছর ধরে মধু ও কৈটভের সঙ্গে মহাসংগ্রামে রত হলেন | মহামায়া শেষে ঐ দুই অসুরকে বিমোহিত করলে তারা বিষ্ণুকে বলে বসে, "আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা প্রীত; তাই আপনার হাতে মৃত্যু আমাদের শ্লাঘার বিষয় হবে | পৃথিবীর যে স্থান জলপ্লাবিত নয়, সেখানে আপনি আমাদের উভয়কে বিনাশ করতে পারেন |" বিষ্ণু বললেন, "তথাস্তু |" এবং অসুরদ্বয়ের মাথা নিজের জংঘার উপর রেখে তাদের বধ করলেন |

মহিষাসুরের কাহিনী –

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত দেবী দুর্গার কাহিনীগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় মধ্যম চরিত্রে উল্লিখিত মহিষাসুর বধের কাহিনীটি | এই কাহিনী অনুসারে পুরাকালে মহিষাসুর দেবতাদের শতবর্ষব্যাপী এক যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার কেড়ে নিলে বিতাড়িত দেবগণ প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পরে তাঁকে মুখপাত্র করে শিব ও নারায়ণের সমীপে উপস্থিত হলেন | মহিষাসুরের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন | সেই ক্রোধে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করল | প্রথমে বিষ্ণু ও শিব ও পরে ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হতে এক মহাতেজ নির্গত হ'ল; সেই সঙ্গে অন্যান্য দেবতাদের দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে সেই মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হ'ল | সুউচ্চ হিমালয়ে ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে সেই বিরাট তেজঃপুঞ্জ একত্রিত হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করল | কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূত হওয়ায় এই দেবী 'কাত্যায়নী' নামে অভিহিতা হলেন | আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে দেবী কাত্যায়নী আবির্ভূতা হয়েছিলেন; শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কাত্যায়ন দেবীকে পূজা করেন এবং দশমীতে দেবী মহিষাসুর বধ করেন |

যাইহোক, এক এক দেবতার তেজপ্রভাবে বহুবর্ণময়ী দেবীর এক এক অঙ্গ উৎপন্ন হ'ল – শিবের তেজে মুখমণ্ডল, যমের তেজে কেশদাম, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, অগ্নিতেজে ত্রিনয়ন | প্রত্যেক দেবতা তাঁদের আয়ুধ বা অস্ত্র দেবীকে দান করলেন | হিমালয় দেবীকে তাঁর বাহনরূপে সিংহ দান করলেন | এই মহাদেবীই অষ্টাদশভুজা জয়া মহালক্ষ্মী রূপে মহিষাসুর

বধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দেবী ও তাঁর বাহনের সিংহনাদে ত্রিভুবন কম্পিত হতে লাগল। মহিষাসুর সেই প্রকম্পনে ভীত হয়ে প্রথমে তার সেনাদলের বীরযোদ্ধাদের পাঠাতে শুরু করল; দেবী ও তাঁর বাহন সিংহ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে একে একে সকল যোদ্ধা ও অসুরসেনাকে বিনষ্ট করলেন। তখন মহিষাসুর স্বয়ং দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল। যুদ্ধকালে মায়াবী মহিষাসুর নানা রূপ ধারণ করে দেবীকে ভীত বা বিমোহিত করার প্রচেষ্টায় রত হ'ল; কিন্তু দেবী সেই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। তখন অসুর অহঙ্কারে মত্ত হয়ে প্রবল গর্জন করল। দেবী বললেন,

"গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ।"

অর্থ – রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধুপান করি, ততক্ষণ তুই গর্জন করে নে। আমি তোকে বধ করলেই দেবতারা এখানে শীঘ্রই গর্জন করবেন।

এই বলে দেবী লম্ফ দিয়ে মহিষাসুরের উপর আরোহণ করে তার কণ্ঠে পা দিয়ে শূলদ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করে তাকে বধ করলেন। অসুরসেনা হাহাকার করতে করতে পলায়ন করল এবং দেবতারা স্বর্গের অধিকার ফিরে পেয়ে আনন্দধ্বনি করতে লাগলেন।

শুম্ভ-নিশুম্ভের কাহিনী –

দেবীমাহাত্ম্যম্-এ বর্ণিত দেবী পার্বতী সংক্রান্ত তৃতীয় ও সর্বশেষ কাহিনীটি হ'ল শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনী। গ্রন্থের উত্তর চরিত্র বা তৃতীয় খণ্ডে বিধৃত পঞ্চম থেকে একাদশ অধ্যায়ে এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে – শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুরভ্রাতা স্বর্গ ও দেবতাদের যজ্ঞভাগ অধিকার করে নিলে দেবগণ হিমালয়ে গিয়ে আদিদেবী মহাদেবীকে স্তব করতে লাগলেন (পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত এই স্তবটি অপরাজিত স্তব নামে পরিচিত; এটি হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র ও নিত্যপাঠ্য একটি স্তবমন্ত্র; "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" এবং সমরূপ মন্ত্রগুলি এই স্তবের অন্তর্গত।

এমন সময় সেইস্থানে পার্বতী গঙ্গাস্নানে উপস্থিত হলে, দেবতাদের কষ্ট দেখে আদ্যাদেবী ইন্দ্রাদি দেবতার স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে তাঁর দেহকোষ থেকে সৃষ্টি করেন এই দেবীকে আর পার্বতী এই দেবীর সাথে বিন্ধ পর্বতে যান ও বিন্ধবাসিনী নামে অভিহিত হন। এই দেবী কৌশিকী নামে আখ্যাত হলেন এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের চর চণ্ড ও মুণ্ড তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজ প্রভুদ্বয়কে বলল যে এমন স্ত্রীলোক আপনাদেরই ভোগ্যা হবার যোগ্য। চণ্ড-মুণ্ডের কথায় শুম্ভ-নিশুম্ভ মহাসুর সুগ্রীবকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করে দেবীর নিকট প্রেরণ করল। সুগ্রীব দেবীর কাছে শুম্ভ-নিশুম্ভের কুপ্রস্তাব মধুরভাবে ব্যক্ত করল। দেবী মৃদু হেসে বিনীত স্বরে বললেন, "তুমি সঠিকই বলেছ। এই বিশ্বে শুম্ভ-নিশুম্ভের মতো বীর কে আছে? তবে আমি পূর্বে অল্পবুদ্ধিবশত প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে আমাকে যুদ্ধে পরাভূত করতে পারবে, কেবলমাত্র তাকেই আমি বিবাহ করব। এখন আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করি কী করে! তুমি বরং মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভকে বলো, তারা যেন এখানে এসে আমাকে পরাস্ত করে শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করে। আর বিলম্বে কী প্রয়োজন?" সুগ্রীব ক্রোধান্বিত হয়ে দেবীকে নিরস্ত হতে পরামর্শ দিল। কিন্তু দেবী নিজবাক্যে স্থির থেকে তাঁকে শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে প্রেরণ করলেন।

দেবীর কথায় কুপিত হয়ে অসুররাজ শুম্ভ তাঁকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করল। ধূম্রলোচনের সঙ্গে দেবীর ভয়ানক যুদ্ধ হ'ল এবং সেই যুদ্ধে ধূম্রলোচন পরাজিত ও নিহত হ'ল। এই সংবাদ পেয়ে শুম্ভ এবার চণ্ড-মুণ্ড ও অন্যান্য অসুরসৈন্যদের যুদ্ধে পাঠাল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দেবী নিজদেহ থেকে দেবী কালীর সৃষ্টি করলেন। চামুণ্ডা ভীষণ যুদ্ধের পর চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করলেন। তখন দেবী কৌশিকী তাঁকে চামুণ্ডা আখ্যায় ভূষিত করলেন।

চণ্ড-মুণ্ডের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শুম্ভ সকল দৈত্যসেনাকে সুসজ্জিত করে প্রেরণ করল দেবীর বিরুদ্ধে। তখন দেবী পার্বতী প্রত্যেক দেবতার শক্তিরূপে তাঁর এক এক অঙ্গ থেকে এক এক দেবীকে সৃষ্টি করেন। এই দেবীরা হলেন ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী প্রমুখ। এঁরা প্রচণ্ড যুদ্ধে দৈত্যসেনাদের পরাভূত ও নিহত করতে লাগলেন। এই সময় রক্তবীজ দৈত্য সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হ'ল। তার রক্ত একফোঁটা মাটিতে পড়লে তা থেকে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ দৈত্য সৃষ্টি হয়। এই কারণে কৌশিকী কালীর সহায়তায় রক্তবীজকে বধ করলেন। কালী রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়তে না দিয়ে নিজে পান করে নেন।

এরপর শুম্ভ আপন ভ্রাতা নিশুম্ভকে যুদ্ধে পাঠায়। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দেবী দুর্গা নিশুম্ভকে বধ করলেন। প্রাণপ্রতিম

ভাইয়ের মৃত্যুর শোকে আকুল হয়ে শুম্ভ দেবীকে বলল, "তুমি গর্ব করো না, কারণ তুমি অন্যের সাহায্যে এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছ।"

তখন দেবী বললেন,

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মামপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট মধ্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।"

অর্থ – একা আমিই এ জগতে বিরাজিত। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে আছে? রে দুষ্ট, এই সকল দেবী আমারই বিভূতি। দেখ, এরা আমার দেহে বিলীন হচ্ছে। তখন অন্যান্য সকল দেবী কৌশিকী দেহে মিলিত হয়ে গেলেন। দেবীর সঙ্গে শুম্ভের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যুদ্ধান্তে দেবী শুম্ভকে শূলে গেঁথে বধ করলেন। দেবতারা

পুনরায় স্বর্গের অধিকার ফিরে পেলেন। যুদ্ধের পর কৌশিকী পার্বতীর দেহে বিলীন হয়ে যান। পরে দেবী পার্বতী মালভূমের রাজার মাধ্যমে নিজের এই রূপের পুজো শুরু করেন।

কালিকা পুরাণের মূল উপজীব্য বিষয় কামাখ্যা মন্দির ও নরকাসুর বৃত্তান্ত – তবুও এর ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১তম অধ্যায়ে দুর্গাপূজার রীতিনীতির বিস্তারিত বিবরণ আছে, পূজায় ব্যবহার্য "জটাজুটসমাযুক্তাং..." ধ্যানমন্ত্রটির উল্লেখ আছে, আর তাই এই পুরাণের আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। বিশেষতঃ ৬০তম অধ্যায়ে মহিষাসুর বধের কাহিনী আছে যা দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয় বা বামন পুরাণের কাহিনী থেকে স্বতন্ত্র। মহাদেব এবং বেতাল-ভৈরবের কথোপকথনের মাধ্যমে উপাখ্যানটির বিন্যাস। কাহিনীর সূচনায় মহিষাসুরের বিনাশ কামনায় দেবতাদের সম্মিলিত স্তুতিতে প্রসন্নচিত্ত মহামায়া ষোড়শভুজা ভদ্রকালী রূপে আবির্ভূতা হয়ে দেবতাদের কাত্যায়নের আশ্রমে যেতে আদেশ করেন। সেখানে দেবতারা আদ্যাদেবীর দর্শনলাভের আশায় যান ও ত্রিমূর্তির (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) সাক্ষাৎ লাভ করেন। ক্রমে তাঁরা মহিষাসুরের অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা জানালে ত্রিমূর্তি কোপাবিষ্ট হন। তাঁদের ও অন্যান্য দেবতাদের ক্রোধরশ্মি সুবৃহৎ এক তেজচক্র সৃষ্টি করে, যা ক্রমে দশভুজা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দেবী দুর্গার রূপ নেয়।

এদিকে মহিষাসুর দুঃস্বপ্নে দেবী ভদ্রকালীকে খড়্গাঘাতে তার শিরচ্ছেদ করে রক্তপান করতে দেখে। সন্ত্রস্ত অসুররাজ সপার্ষদে পরদিন সকালে দেবীর আরাধনা করলে দেবী মহামায়া তাঁকে ষোড়শভুজা অতসীপুষ্পবর্ণা ভদ্রকালী রূপে দর্শন দেন। মহিষ শিবাংশী – শিবের বরে রম্ভাসুরের ঔরসে তাঁর জন্ম, শিবের প্রসাদেই তাঁর ত্রিলোক বিজয়ের বৈভব-প্রতিপত্তি, আবার নিয়তির নির্দেশে তিনি নারীরই বধ্য, তাই জাগতিক অন্যান্য কামনার পরিবর্তে তাঁর মনে জাগে ভিন্ন এক 'অমরত্ব' লাভের আকাঙ্ক্ষা। মহামায়ার হাতে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তাঁর কাছেই মহিষাসুর আসুরিক মনোবৃত্তি স্খলন আর যজ্ঞভাগ লাভের বর প্রার্থনা করে। দেবী তাকে অসুরত্ব মোচনের বর দিলেও যজ্ঞভাগের মনোবাঞ্ছাটি অপূর্ণ রাখেন, বিকল্পে দেন ত্রিলোকপূজ্য হওয়ার বর। তিনি জানান যে তাঁর মহিষাসুর বধ এক সন্ততঃ ঘটনা – যুগ-যুগান্তরে, কল্পে-কল্পান্তরে যা ঘটে চলেছে। ইতোপূর্বে অঞ্জননিভা অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা ও অতসীপুষ্পবর্ণা ষোড়শভুজা ভদ্রকালী রূপে মহিষাসুরকে তিনি বধ করেছেন আর পরবর্তীতে দশভুজা তপ্তকাঞ্চনাভা কাত্যায়নী দুর্গা রূপে তাঁকে আবারও বধ করবেন। আর এই তিন রূপে দেবীর পদলগ্ন হয়ে মহিষাসুর দেব-দানব-মানব সবার পূজা পাবেন। প্রতিশ্রুতি মতোই দেবী দশভুজারূপে অন্তিমকল্পের যুদ্ধে মহিষকে বধ করেন আর মহিষও দেবীর পদসংলগ্ন হয়ে দেবীর সাথে সাথে পূজা পেতে থাকে। আদ্যাশক্তির আশীর্বাদে মহিষের অসুর-স্বভাব মুছে যায়, চলে যায় দেবতাদের প্রতি বিদ্বেষ আর পুনর্জন্মের চক্র থেকে অব্যাহতি মেলে।

এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অবশ্য আরও দুটি প্রতিশ্রুতির আখ্যান কালিকা পুরাণের এই অধ্যায়ে বর্ণিত আছে – একটি হ'ল রম্ভাসুরের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট মহাদেবের বরদান আর সেই অঙ্গীকারের দায়বদ্ধতা থেকে মহিষাসুর রূপে তিন কল্পে রম্ভের পুত্রত্ব স্বীকার। অন্যটি মহাদেবীর কাছে মহাদেবের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া – তিন কল্পে যোগবদ্ধ মহিষ শরীরে দেবীর পদপ্রান্তে থেকে তাঁর সাযুজ্যলাভ ও মহিষ শরীরে সিংহরূপী হরির সঙ্গে দেবীর ভারবহন।

এবার আসা যাক কৃত্তিবাস ওঝা রচিত রামায়ণের কথায় – বাল্মীকির রামায়ণে রামের দুর্গাপূজার কোনো বিবরণ নেই | কিন্তু রামায়ণের পদ্যানুবাদ করার সময় কৃত্তিবাস ওঝা কালিকাপুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণের কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে সংযোজিত করেছেন| কৃত্তিবাসি রামায়ণ অনুসারে রাবণ ছিলেন শিবভক্ত; মা পার্বতী তাঁকে রক্ষা করতেন | তাই ব্রহ্মা রামকে পরামর্শ দেন, পার্বতীর পূজা করে তাঁকে তুষ্ট করতে | তাতে রামের পক্ষে রাবণ বধ সহজসাধ্য হবে | ব্রহ্মার পরামর্শে রাম শরৎকালে পার্বতীর দুর্গতিনাশিনী রূপের বোধন, চণ্ডীপাঠ ও মহাপূজার আয়োজন করেন | আশ্বিন মাসের শুক্লাষষ্ঠীর দিন রাম কল্পারম্ভ করেন| তারপর সন্ধ্যায় বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস করেন | মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও সন্ধিপূজার পরেও দুর্গার আবির্ভাব না ঘটায়, রাম একশ আটটি নীল পদ্ম দিয়ে মহানবমী পূজার পরিকল্পনা করেন | হনুমান তাঁকে একশ আটটি পদ্ম জোগাড় করে দেন| মহামায়া রামকে পরীক্ষা করার জন্য একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন | একটি পদ্ম না পেয়ে রাম পদ্মের বদলে নিজের একটি চোখ উপড়ে দুর্গাকে নিবেদন করতে গেলে, দেবী পার্বতী আবির্ভূত হয়ে রামকে কাঙ্ক্ষিত বর দেন| তবে কৃত্তিবাস ওঝা যে কাহিনী সংকলন করেছেন, তা রামচন্দ্রের প্রকৃত জীবনী বাল্মীকি রামায়ণে বা রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদসমূহ যেমন, তুলসীদাস রচিত হিন্দি রামচরিতমানস প্রভৃতি রামায়ণে উক্ত হয়নি|

ভগবতী দুর্গা | ভগ মানে ঐশ্বর্য, তাই ভগবতী মানে ঐশ্বর্যশালিনী | ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি ঐশর্যের নাম 'ভগ' | এই ছয়টিই মা দুর্গার মধ্যে পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত | আবার তিনি 'মহামায়া' | মায়া কথাটি এসেছে মা-ধাতু থেকে, অর্থ – পরিমাপ করা| মহামায়া মানে মহাপরিমাপন-কর্ত্রী| পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "এই যে মায়া দেখছ, মায়ার যা সব খেলা, এ মায়া কিন্তু আমারই |" (গীতা ৭/১৪) অর্থাৎ মায়াও তাঁরই সৃষ্টি | ঈশ্বর স্বীয় মহাশক্তি দ্বারা জগৎ পরিমাপ করেন| মায়া আবার প্রকৃতি নামেও আখ্যায়িত হয়| দেবীপূজার প্রাক্কালে বিল্ববৃক্ষে বোধন হয়| বোধন মানে জাগরণ|
এই প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "বোধন মানে বোধসূত্র, যাকে আশ্রয় করে অন্তরে বাহিরের যা কিছুকে বুঝেসুঝে চলতে পারা যায়|"

বলি হ'ল উৎসর্গ| মায়ের পায়ে আমাদের ষড়রিপুকে উৎসর্গ করে মনকে ভাগবৎমুখী করে গড়ে তোলা | কিন্তু তার পরিবর্তে হয়ে চলেছে নিষ্ঠুরভাবে পশুহত্যা এবং তাতে পূজার উদ্দেশ্য কতখানি সফল হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য!

বিসর্জন শব্দটি বি-সৃজ ধাতু থেকে উৎপন্ন, বিশেষ প্রকারে সৃষ্টি করা | যে মাতৃপূজা করলাম, সেই মায়ের সর্বমঙ্গলকারিণী স্নেহসুন্দরভাবকে নিজের অন্তরে বিশেষভাবে সৃষ্ট, অর্থাৎ দৃঢ়নিবন্ধ করাই লক্ষ্য | মায়ের সেবায় আমাদের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়োজিত করাই হ'ল বিসর্জনের সার্থকতা|

পরিব্রাজক, বৌদ্ধ পন্ডিত হিউয়েন সাঙের লেখায়ও দুর্গাপুজার কথা পাওয়া যায় | চীনা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের মূল পান্ডুলিপি সংগ্রহে ৬৩০ সালে ভারতে আসেন | ভারতবর্ষের নানা বিহারে বিদ্যা অর্জন করেন| ৬৩৫-৬৪৩ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর তিনি হর্ষবর্ধনের রাজসভায় ছিলেন | তবে তাঁর রচনায় দুর্গা, কালী, কালীর আরেক রূপ চন্ডী নাকি বনদেবীকে নিয়ে – সেই বিষয়ে মতভেদ আছে|

পনেরোশ শতকের প্রথমদিকে খুব সম্ভবত এই পুজোর সূচনা হয়েছিল | মনে করা হয় দিনাজপুরের জমিদার দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে প্রথম এই পুজো শুরু করেছিলেন পারিবারিকভাবে| তবে সেই দেবী দুর্গার রূপ অন্যরকম ছিল|

লোকমুখে শোনা যায় এই বাড়ির দেবীর বাহন হচ্ছে সাদা বাঘ এবং সবুজ সিংহ। অন্যদিকে দেবীর চোখ হচ্ছে গোলাকার। তবে আরও একটি লোকগাথা অনুযায়ী বাংলার দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ কিংবা নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার মহাশয়ের হাত ধরে।

১৬১০ সালে বড়িশার রায়চৌধুরী পরিবার প্রথম দুর্গাপুজার আয়োজন করেছিল বলেও উল্লেখ আছে। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ১৭৫৭ সালে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা নবকৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভের সম্মানে দুর্গাপূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তি দেখা যায় সেটি পরিবারসমন্বিতা বা সপরিবার দুর্গার মূর্তি। কলকাতায় সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার ১৬১০ সালে এই সপরিবার দুর্গার প্রচলন করেন। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী ও মহিষাসুরমর্দিনী; তাঁর ডানপাশে উপরে দেবী লক্ষ্মী ও নিচে গণেশ; বামপাশে উপরে দেবী সরস্বতী ও নিচে কার্তিকেয়।

এবার আসি বারোয়ারি দুর্গাপুজোর কথায়। এই বারোয়ারি পুজোর একটি ইতিহাস আছে। বারোজন বন্ধু মিলে প্রথমবার এই পুজো শুরু করেছিলেন বলে এমন নামকরণ হয়। ১৭৯০ সালে বারোজন মিলে একসঙ্গে একটি পুজো শুরু করেন গুপ্তিপাড়ায়।

তবে কলকাতায় প্রথম বারোয়ারি পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটেছিল ১৯১০ সালে। বাগবাজারে সনাতন ধর্মোৎসাহিনি সভা এই পুজো শুরু করে। কিন্তু সাহায্য করেছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর থেকে গোটা বাংলাজুড়ে দুর্গাপুজোর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

শত্রু বিনাশে দুর্গা যেমন ভয়ঙ্করী তেমনই ভক্ত বা

সন্তানের কাছে তিনি স্নেহময়ী জননী, কল্যাণ প্রদায়িনী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় –

‘ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র আগুণবরণ।’

বৃটিশ বাংলায় এই পুজো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেবী দুর্গা শত্রুবিনাশকারিনী রূপে, স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে আপামর বাঙালির কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠেন।

আর বর্তমানে গোটা বিশ্বের কাছে দুর্গাপুজো এক আন্তর্জাতিক উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির এবং পাশাখেলা

ডাঃ শান্তনু মিত্র

ইদানীংকালে নিশ্চয়ই অনেকে নজর করেছেন যে মহাভারতের কাহিনী সম্বন্ধে অনেক বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা এখানকার সমাজ মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এর সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হ'ল পাশাখেলা নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দোষারোপ করা। বলা হয় পাশাখেলার নেশায় যুধিষ্ঠির অকারণ নিজের এবং পান্ডবদের সকলের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে ক্ষমা করা যায় না।

আবার অনেকে ভিন্ন মতও প্রকাশ করেন। তাহলে আসল সত্যটা কী?

মহাভারত বুঝতে গেলে অনেক পড়াশোনার প্রয়োজন। আমার নিজের অত পড়াশোনা কখনই নেই। আমার ভরসা বহু বছর আগে প্রকাশিত একটি কাশীদাসী মহাভারত, যেটি আমার শৈশব থেকে আমাদের বাড়িতে আছে। এই বইটিতে অনুসন্ধান করে অনেকের মতো আমিও নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে এই ধরনের দোষারোপ অত্যন্ত ভুল। তিনি কখনই রাজি ছিলেন না খেলতে, ওঁকে খেলতে বাধ্য করা হয়েছিল।

কেন একথা বলছি? আসুন কী লেখা আছে মহাভারতে দেখা যাক।

ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাসাদ দেখতে গিয়ে দুর্যোধনকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। প্রাসাদের অপরূপ সৌন্দর্য এবং পান্ডবদের অসীম ধনসম্পদ দেখে দুর্যোধন হিংসায় জ্বলেপুড়ে গেছেন। স্ফটিকের দেওয়ালে মাথা ঠুকেছেন এবং ফোয়ারাকে স্ফটিক মনে করে পোশাকসুদ্ধ সশব্দে জলে পড়ে সকলের হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে। দ্রৌপদী হেসেছেন। শকুনি মামা সঙ্গে ছিলেন। তিনিও সব দেখেছেন।

হস্তিনাপুরে ফেরার পথে রাগে দুঃখে অপমানে শকুনিকে দুর্যোধন বললেন, "পান্ডবদের সবকিছুই আমাকে কেড়ে নিতে হবে। নাহলে শান্তি পাব না।"

শকুনি প্রথমে সুবুদ্ধি দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "পান্ডবদের হিংসা কোরো না। ওরা নিজেদের যোগ্যতায় সবকিছু অর্জন করেছে। তোমার যোগ্যতার অভাব কোথায়? তুমিও নিজের চেষ্টায় সবকিছু লাভ করো।"

দুর্যোধন রাজি হলেন না।

অতএব শকুনি বললেন, "লড়াই করে পাণ্ডবদের জিতে নেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। স্বয়ং নারায়ণ ওদের সঙ্গে আছেন; যুদ্ধ ছাড়া অন্য রাস্তা দেখতে হবে। পাশাতে এ সংসারে আমাকে কেউ হারাতে পারে না। খেলতে ডাকলে ক্ষত্রনীতি অনুসারে যুধিষ্ঠিরকে রাজি হতেই হবে। বাবাকে গিয়ে সব কথা বলো।"

বাবার কাছে গিয়ে দুর্যোধন পরিষ্কার বললেন, "পাণ্ডবদের ধন দৌলত দেখে হিংসায় অপমানে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে; আপনি যদি চান আমি বাঁচি তাহলে ওদের পাশা খেলতে ডাকুন। সবকিছু জিতে নেব, তবে আমার শান্তি হবে।"

শকুনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে গুরুজনের আদেশ যুধিষ্ঠির কখনই অমান্য করতে পারবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলেন। বললেন, "এ কাজ অন্যায় হবে। ভাইদের হিংসা কোরো না। তার ফল ভাল হবে না।"

কোনও লাভ হ'ল না। অগত্যা পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন পাণ্ডবদের ডেকে আনতে। বিদুর কাতর হয়ে রাজাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, "আপনি এ কাজ করবেন না। আপনার কুলনাশ হয়ে যাবে।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "এ দৈবের লিখন। আমাকে তুমি আর কোনো কথা বলো না।"

নিরুপায় হয়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রর আমন্ত্রণ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। বার্তাটি ছিল এই রকম – "তোমাদের (ইন্দ্রপ্রস্থের) মতো সুন্দর সভা আমরা করেছি। ভাইদের নিয়ে এসে দেখো। সভায় বসে পাশা-টাশা (দ্যূত-আদি) খেলো। তোমরা সভায় এলে আমার মন তৃপ্ত হয়।"

"তব সভা তুল্য সভা
করিয়াছে তথি।
ভ্রাতৃগণসহ মম
সভা দেখ আসি।
দ্যূত-আদি ক্রীড়া কর
সভা মধ্যে বসি।
সভায় বসিলে মম
তৃপ্ত হয় মন।"

অর্থাৎ জ্যাঠামশাই যেন আদর করে ভাইপোকে ডাকছেন।

যুধিষ্ঠিরের কিন্তু আসল ব্যাপারটি বুঝতে দেরি হ'ল না। বললেন, "পাশাখেলা অতি অনর্থের মূল। জ্ঞানভ্রষ্ট লোকেরাই খেলে। আমি এখন কী করব কাকা, তুমি বলে দাও।"

বিদুর বললেন, "অন্ধ রাজাকে আমি অনেক বারণ করেছিলাম কিন্তু উনি শুনলেন না। আমাকে পাঠালেন। এখন যাবে, কি যাবে না, যা মনে হয় করো।"

তখনকার যুগে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অথবা পাশাখেলার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা ক্ষত্রিয়দের কাছে কাপুরুষতা বলে গণ্য ছিল। তাই বিবেক থেকে অপছন্দ হলেও যুধিষ্ঠির নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে এই খেলার আহ্বান তিনি কখনও প্রত্যাখ্যান করবেন না। তাছাড়া গুরুজনের আহ্বান উপেক্ষা করাও তাঁর কাছে ছিল অধর্ম। সুতরাং যুধিষ্ঠির বললেন, "কুরুপতি গুরুজন। তাঁর আজ্ঞা ভঙ্গ করলে আমায় নরকে যেতে হবে। তাছাড়া..."

"ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তাত,
জানহ যেমন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি
করে আবাহন।
বিশেষে আমার সত্য
প্রতিজ্ঞা বচন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে আমি
না করি হেলন।"

অর্থাৎ তাঁকে যেতেই হবে।

পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে এলেন। সে রাত্রিটা বিশ্রাম করলেন। পরেরদিন সকালে পাঁচভাই কৌরব পরিবেষ্টিত সভাতে এসে বসলেন। ধৃতরাষ্ট্র ছাড়াও সেখানে রয়েছেন দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম এবং বিদুর। চারিদিকে ঘিরে রয়েছে দুর্যোধনসহ কৌরব ভাইরা এবং সভাসদরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আহ্বান করলেন শকুনি। যুধিষ্ঠির ভালভাবেই জানতেন যে খেলাটি অধর্ম ও কপটতার মাধ্যমে হবে এবং তাঁর সবকিছু হারানোর সময় উপস্থিত হয়েছে। তিনি অনুনয় করে শকুনিকে বললেন, "পাশা মানুষের অনর্থের মূল। এই খেলায় ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব প্রমাণ হয় না। নীতিবিরুদ্ধ এই কপট খেলায় আমার মন চাইছে না। মামা, আমি দ্বিজসেবা ছাড়া অন্যদিকে মন দিই না। তুমি অধর্ম করে আমাকে জিতে নিও না, আমি এটা কামনা করি না।"

"যুধিষ্ঠির বলে পাশা
অনর্থের ঘর।
ক্ষত্র-পরাক্রম ইথে
না হয় গোচর।
কপট এ-কর্ম্ম, ইথে
কপট বাখান।
অনীতি কর্ম্মেতে মম
নাহি লয় মন।
যুধিষ্ঠির বলে, পাশা
অনর্থের মূল।
অধর্ম্ম করিয়া মোরে
না জিন মাতুল।
অন্য নাহি মনে মম
দ্বিজ সেবা বিনা।
এ কর্ম্ম মাতুল আমি
না করি কামনা।"

বলা বাহুল্য শকুনি রাজি তো হলেনই না, বরং যে ভাষায় যুধিষ্ঠিরের এই অনুনয় প্রত্যাখ্যান করলেন সেটা যথেষ্ট অপমানজনক। ধৃতরাষ্ট্র চুপ করে থাকলেন। যুধিষ্ঠির খেলতে বাধ্য হলেন।

এরপর যা ঘটেছিল সেটা সকলেরই জানা। তাহলে কী কী প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি বলা যায়? দেখা যাক –

প্রশ্ন – যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে গেলেন কেন?

উত্তর –

১) ধৃতরাষ্ট্র আহ্বান করেছিলেন বলে যুধিষ্ঠিরের কাছে সেটা ছিল আদেশ। অমান্য করা অধর্ম।

২) ক্ষত্রিয় নীতি ও নিজের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী পাশাখেলার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার উপায় ছিল না তাঁর।

প্রশ্ন – শকুনি কৌরব পরিবারের কেউ না হয়েও যখন খেললেন তখন যুধিষ্ঠির নিজে না খেলে শ্রীকৃষ্ণকে খেলতে বললেন না কেন?

উত্তর – খেলাটা দুই পরিবারের মধ্যে হয়নি। চতুর শকুনি ব্যক্তিগতভাবে যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করেছিলেন। সেখানে অন্য কারোর খেলার প্রশ্ন আসে না।

প্রশ্ন – যুধিষ্ঠির খেলতে কতটা আগ্রহী ছিলেন।
উত্তর – অন্তর থেকে অনাগ্রহী ছিলেন। ভীম রেগে গিয়ে যখন যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করছেন, তখন অর্জুন বলছেন –

"রাজারে বলিলে হেন
কি দোষ দেখিয়া!
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু
কপটে ডাকিয়া।
আপন ইচ্ছায় রাজা
না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে
হবেন ধর্ম্মচ্যুত।"

প্রশ্ন – শকুনি চাতুরী অবলম্বন করেছিলেন কিনা।
উত্তর – অনেকে বলেন শকুনি পাশাতে খুবই দক্ষ ছিলেন। কপটতা করেননি। কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। শকুনি ছকের মধ্যে নিজের বাবার হাড় ঢুকিয়েছিলেন এমন গল্প প্রচলিত হলেও এরকম উল্লেখ মহাভারতে নেই।
কিন্তু ছলচাতুরী যে তিনি করছিলেন সেটা অনেকের কথায় সন্দেহাতীতভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। এতবার খেলা হ'ল অথচ যুধিষ্ঠির একবারও জিতলেন না – সন্দেহ হবার পক্ষে এটাই তো যথেষ্ট। প্রত্যক্ষদর্শী বিদুর কী বলছেন? আকুল হয়ে ধৃতরাষ্টকে বলছেন, "তুমি অন্ধ, দেখতে পাচ্ছ না কী অন্যায় হচ্ছে? পান্ডবদের যা আছে তুমি একবার চাইলে ওরা এমনিই তোমায় সবকিছু দিয়ে দিত। তা না করে তুমি ছলনার আশ্রয় কেন নিচ্ছ? শকুনিকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে অত্যন্ত অধার্মিক। নিজের দেশ ছেড়ে এখানে কী সর্বনাশ করতে এসেছে? ওকে এখুনি নিজের দেশে চলে যেতে বলো।"

"হে অন্ধ, পাশাতে যত
লইবে বেশাত।
বুঝিবা কি তাহাতে
তোমার নাহি হাত।
কপট করিয়া তাহে
কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্র দিত সব
ধর্ম্মের নন্দন।
এই শকুনিরে আমি
ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ
চূড়ামণি।
কোথায় পর্ব্বতপুর
ইহার নিবাস।
কে আনিল হেথায় করিতে
সর্ব্বনাশ।
বিদায় করহ, ঘরে
যাক আপনার।
উঠ গো শকুনি পাশা
করি পরিহার।

অর্জুন বলেছেন –

"ধর্ম্মেরে রাখিতে ধর্ম্ম
খেলে ধর্ম্ম-সারি।
শকুনি কপটে জিনে
অধর্ম্ম আচরি।"

কাশীদাস লিখছেন –

"হারিলেন ধর্ম্মপুত্র
কপট পাশায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস
কাশীদাস গায়।"

সুতরাং চাতুরী ভালরকমই হয়েছিল কিন্তু কীভাবে হচ্ছিল সেটা কোথাও বলা নেই। যুধিষ্ঠির নিজেও ধরতে পারেননি। পারলে হয়তো আপত্তি করতেন। ইতিহাস অন্যরকম হতো।
প্রশ্ন – সমানে হেরে গিয়েও যুধিষ্ঠির খেলা চালিয়ে গেলেন কেন?
উত্তর – যুধিষ্ঠিরের অন্য কোনও পথ ছিল না। হেরে যাচ্ছেন বলে কোন ক্ষত্রিয় দ্বন্দ্বযুদ্ধ ত্যাগ করতেন না। যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। একমাত্র সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রই এই কপট খেলা বন্ধ করতে পারতেন। চোখের সামনে অন্যায় হচ্ছে দেখেও ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপ চুপ করে বসেছিলেন।
একমাত্র প্রতিবাদ করলেন বিদুর। তিনি আবারও বললেন –

"হে ভীষ্ম, হে দ্রোণ, কৃপ
নাহি শুন কেনে।
সবে মিলি রঙ্গ দেখ

বুঝিলাম মনে।
অগাধ সমুদ্রে নৌকা
না ডুবাহ হেলে।
সবে মিলি যম-গৃহ
যাইতে বসিলে।"

বিদুর এত স্পষ্টভাবে ছলনার কথা বলা সত্ত্বেও দুর্যোধনের মুখ চেয়ে ধৃতরাষ্ট্র খেলা বন্ধ করলেন না। যুধিষ্ঠিরকে কপট খেলায় সর্বস্বান্ত করা হ'ল। কিন্তু হেনস্থার তখনও অনেক বাকি ছিল। ধৃতরাষ্ট্রর মনের দৃঢ়তার অভাব ছিল খুবই। দ্রৌপদীর কান্নায় বিচলিত হয়ে তিনি পান্ডবদের সবকিছুই ফিরিয়ে দিলেন। রাগে পাগল হয়ে গেলেন দুর্যোধন।

যুধিষ্ঠির সবাইকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের সীমাহীন লোভ এবং অন্যায় আবদারের কাছে নতিস্বীকার করে ধৃতরাষ্ট্র আবার পাশাখেলার হুকুম পাঠিয়ে মাঝপথ থেকে অসহায় যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনলেন এবং দ্বিতীয়বার খেলতে বাধ্য করলেন। গান্ধারী, দ্রোণাচার্য, বিদুর, সকলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র বিরত হলেন না। গান্ধারী ক্ষোভে, দুঃখে দুর্যোধনকে ত্যাগ করার কথাও বললেন। লাভ হ'ল না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন,

"ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন
সুবল-নন্দিনী
আমারে বুঝাও কিবা
সব আমি জানি।
কুরু-অন্তকাল জানি
হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূত
নিবৃত্ত না হয়।
যাহা আছে তাহা হ'ক
দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ
পান্ডুর নন্দন।"

একই পন্থায় আবার খেলা হ'ল। পাণ্ডবরা রাজত্ব হারিয়ে বনবাসে যেতে বাধ্য হলেন। তাহলে? যুধিষ্ঠিরকে কতটা দোষ দেওয়া যায়? দোষ তো সম্পূর্ণভাবে পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রর। তিনি ভাইপোর আনুগত্যের পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছেন। শুধুমাত্র ধৃতরাষ্ট্রর দুঃখজনক আচরণের জন্য প্রবল চক্রান্তের শিকার হয়ে সর্বহারা মরিয়া একটি মানুষ রাজত্ব বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে, নিজের ভাইদের এবং প্রবল আপত্তি প্রকাশ করেও শকুনির প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে পর্যন্ত পণ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদি অন্তত একবার জিতে সবকিছু ফিরে পাওয়া যায়, এই আশায়।

কাশীদাস লিখলেন –

"যত সাধুগণ সবে
করয়ে রোদন।
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র, নিন্দা
করে সর্ব্বজন।"

ছ'হাজার বছর পর আজ আধুনিক মানসিকতায় আমরা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্রূপ করতে পারি। নিজের ভাইদের এবং স্ত্রীকে বাজি রেখে তিনি ঠিক করেছিলেন কিনা সেটা নিয়েও আধুনিক চিন্তায় তর্ক করতে পারি। কিন্তু একথা কখনই ঠিক নয় যে তিনি সদিচ্ছায় খেলার নেশায় সেদিন পাশা খেলেছিলেন। চক্রান্ত করে কৌরব পরিবেষ্টিত রাজসভার ফাঁদে তাঁকে কোণঠাসা করে খেলতে বাধ্য করা হয়েছিল। কী পরিমাণ উভয় সংকট এবং মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে এই মহাধার্মিক মানুষটিকে সেদিন যেতে হয়েছিল সেটা মহাভারত পড়লে নিঃসন্দেহে অনুভব করা যায়।

তিন তপস্বী

মূল গল্প: (The Three Hermits) লিও টলস্টয়
তর্জমা: সুমিতা বসু

একজন বিশপ Archangel থেকে জাহাজে করে Solovétsky Monastery-র দিকে যাচ্ছিলেন। সেই জাহাজে

Solovetsky Monastery, Russia

যাত্রীদের মধ্যে কিছু তীর্থযাত্রীও ছিল। তারাও ওই গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি কোনো মন্দিরে যাচ্ছে। আবহাওয়া চমৎকার, জাহাজ নির্বিঘ্নে চলছে, যাত্রাপথ সুগম, বাতাস পূর্ণ সহযোগিতা করছে। এক কথায়, অনুকূল পরিবেশ। যাত্রীরা ডেকে বসে, শুয়ে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিছক গল্পে মত্ত। জাহাজ চলেছে নিজের তালে, নিজের ছন্দে।

বিশপ ডেকে এসে দাঁড়ালেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, কিছু যাত্রী জাহাজের একপাশে জটলা করে মন দিয়ে এক জেলে-মাঝির কথা শুনছে। মাঝিটি দূরে আঙুল তুলে সমুদ্রের মধ্যে কিছু যেন দেখাচ্ছে আর কথা বলে চলেছে; সকলে আগ্রহভরে মন দিয়ে শুনছে। বিশপ একটু কাছে এসে ওদের কথোপকথন শোনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। মাঝির আঙুলের দিকনির্ণয়কে লক্ষ্য করে কিছু দেখতেও পেলেন না। সূর্যের ভেসে যাওয়া আলোয় সমুদ্রের জল চকচক করছে। বিশপ আরো একটু কাছে এগিয়ে এলেন, যদি কিছু শোনা যায়। নাহ! মাঝি হঠাৎ বিশপকে দেখতে পেয়ে নিজের মাথা থেকে টুপিটা খুলে মাথা নুইয়ে চুপ করে গেল। বাকিরাও সচকিত হয়ে নিজেদের টুপি খুলে মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানাল। কাছেই রাখা একটা কালো বাক্সের ওপর বসলেন বিশপ। তারপর স্মিত হেসে বললেন, "আরে আরে, তোমরা সকলে চুপ করে গেলে কেন? আমি কিন্তু তোমাদের একেবারেই বিরক্ত করতে চাইনি। আমি শুধু মাঝিভাই কী গল্প বলছে তোমাদের, শুনতে চাইছিলাম।"

- "উনি আমাদের তিনজন নির্জনবাসী তপস্বীর কথা বলছেন।" ওদের মধ্যেই একজন সপ্রতিভ উত্তর দিল।

- "তপস্বী? কোন তপস্বী? আমাকেও ওঁদের সম্বন্ধে বলো, আমিও শুনতে চাই। আচ্ছা তোমরা ওদিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন একটা আলোচনা করছিলে না?"

এবারে মাঝি আস্তে করে উত্তর দিল, "ওই দূরে যে ছোট্ট দ্বীপটি আছে, ওখানেই নির্জনে তিনজন তপস্বী বাস করেন। ওঁরা ওখানে নিজেদের মুক্তির জন্য দিনরাত সাধনা করছেন। নির্বাণ লাভ করাই ওঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

- "কিন্তু দ্বীপটি কোথায়? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।" বিশপ আবার কৌতূহলে এদিক ওদিক তাকালেন।

- "ওই যে ওদিকে।" মাঝি আবার আঙুল তুলে দেখাল। "আপনি আমার আঙুল বরাবর চোখ রাখলে দেখতে পাবেন। আচ্ছা, বলছি... একটা ছোট সাদা মেঘ ভাসছে দেখতে পাচ্ছেন? ঠিক তার নীচে; দেখুন দেখুন, বাঁদিক চেপে হালকা স্থলরেখা দেখা যাচ্ছে, ওটাই ওঁদের দ্বীপ।"

বিশপ আবার চোখ তুলে এদিক ওদিক খোঁজার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর অনভ্যস্থ চোখ সোনারোদে মাখা চকচকে জল ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

- "নাহ, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু কারা ওই তিনজন নির্জনবাসী তপস্বী?"

- "ওঁরা পুণ্যাত্মা," মাঝি শান্তভাবে উত্তর দিল; "আমি বহুবার বহুজনের থেকে ওঁদের সম্বন্ধে শুনেছিলাম, কিন্তু নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়নি। সেটা হ'ল গত বছরের আগের বছরে। তারপর..." মাঝিটি বলতে লাগল – একবার সে মাছ ধরতে গিয়ে মাঝ সমুদ্রে পথ হারিয়ে গভীর রাতে কোনোমতে এক দ্বীপে এসে হাজির হয়। সেটা যে একটা দ্বীপ, সে রাতে এছাড়া আর কিছুই তার বোধগম্য ছিল না। নৌকাটিও গেল উল্টে। কোনোভাবে পাড়ে ভিড়িয়ে, ঘন অন্ধকারে ডাঙায় উঠে হাতড়ে হাতড়ে সে এক মাটির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। একজন বৃদ্ধ সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর আরো দুজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। তাঁরা যত্ন করে তাকে খাওয়ান, তারপর জামাকাপড় শুকিয়ে তাকে নৌকার কাছে পৌঁছে দেন।

- "তাঁদের দেখতে কেমন?" বিশপ আগ্রহভরে প্রশ্ন করলেন।
- "একজনের বেশ ছোটখাটো চেহারা। বয়সের ভারে পিছনটাও একটু ব্যাঁকা। তাঁর গায়ে পাদ্রী বা পুরোহিতের মতো পোশাক। মনে হয়, বয়স হয়েছে অনেক, একশো কিংবা তার বেশি হতে পারে। এতটাই বয়স যে তাঁর সাদা দাড়িতে সবজে সবজে ছাপ কিন্তু মুখটি তাঁর সদা হাস্যময়। আহা, দেখলে মনে হয় স্বর্গের দেবদূত যেন! দ্বিতীয়জন একটু লম্বা, হুঁ, তিনিও বেশ বয়স্ক। তাঁর গায়ে চাষাভুষোর মতো পোশাক। তাঁর দাড়িটাও বেশ চওড়া, হলদে হলদে ছাপ ছাইরঙা দাড়ি। তবে তাঁকে বেশ শক্ত পোক্ত মানুষ বলে মনে হয়। আমি সেদিন কোনো সাহায্য চাওয়ার আগেই আমার উল্টে যাওয়া নৌকাটাকে তিনি একাই সোজা করে দিলেন। আর এতটাই সহজে করলেন, মনে হ'ল যেন সামান্য একটা বালতি ওল্টালেন। ওঁকেও বেশ হাসিখুশি আর দয়ালু মনে হ'ল। আর তৃতীয়জন বেশ লম্বা। তাঁর দাড়ি ধবধবে সাদা বরফের মতো। সেই লম্বা দাড়ি একেবারে হাঁটু পর্যন্ত লুটোচ্ছে। তাঁর হাবভাব কিন্তু গম্ভীর, ভুরুদুটো ঝুঁকে পড়েছে, পরণে শুধু একটা কৌপীন, কোনোরকমে কোমরে বাঁধা।"
- "ওঁরা কি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?" বিশপের গলায় আগ্রহ।
- "যতদূর মনে পড়ে, ওঁরা সকলেই মৌনী ছিলেন, কথোপকথন নেই বললেই চলে। তবে মাঝেমাঝে একে যেই অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলেন, অন্যজন কেমন যেন সেটা বুঝেও যাচ্ছিলেন।" কথা বলতে বলতে মাঝিটি নিজেই তার স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সে বলতে লাগল – "আমি লম্বা মতন মানুষটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওঁরা কতদিন ওখানে আছেন। শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন; মনে হ'ল বেশ রেগেও গেছেন। কিন্তু বয়স্ক ছোটখাটো মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত ধরে ফেললেন আর হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকাতেই, বড়সড় মানুষটি একটু যেন সংকুচিত হয়ে চুপ করে গেলেন। তখন বয়স্ক মানুষটি শুধু বললেন, আমাদের ওপর দয়া করো। এই বলে, আবার তিনি একগাল হাসলেন, সেই অপাপবিদ্ধ সরল হাসি।"

এইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছিল, জাহাজটি ততক্ষণে দ্বীপটির বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে।

- "দেখুন দেখুন এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দ্বীপটি।" এই বলে মাঝি আবার আঙুল তুলে দেখাল।

বিশপ ভাল করে দেখলেন। এখান থেকে সত্যি কালো রেখার মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট দ্বীপ। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বিশপ এবার জাহাজ-কর্মীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, ওই দ্বীপটির কী নাম?"

- "এর কোনো নাম নেই, এইরকম অনামী দ্বীপ এখানে অনেকগুলো আছে।"
- "এটা কি সত্যি, যা শোনা যায়, কিছু তপস্বী নির্জনে ওখানে সাধনা করেন নির্বাণলাভের জন্য?"
- "সেইরকমই তো শোনা যায় মহাশয়।" জাহাজের কর্মী উত্তর দিল, "তবে আমি ঠিক জানি না। কিছু জেলে-মাঝি অবশ্য সেই কথাই বলে। হতে পারে এসব কিছুই নয়, শুধু কথার কথা।"
- "আমি সেই তপস্বীদের দেখতে চাই। জাহাজটিকে দ্বীপের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কীভাবে তোমরা সেটা করবে?" বিশপ আগ্রহ নিয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন।
- "এত বড় জাহাজ তো কোনোমতেই ওই ছোট্ট দ্বীপের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে না মহাশয়। জাহাজকে দূরে নোঙ্গর করে, ডিঙি নিয়ে ওই দ্বীপে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করতে হবে।"

ওরা ক্যাপ্টেনকে ডাকল।

- "আমি ওই নির্জনবাসী তপস্বীদের কাছে যেতে চাই, তোমরা আমাকে নিশ্চিত করে বলো তো, ওখানে যেতে পারবে কিনা।" বিশপকে বিরত করতে ক্যাপ্টেন অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, "মাননীয় বিশপ মহাশয়, হ্যাঁ, চাইলে কোনো একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে, কিন্তু ওখানে যাওয়া মানে একান্তই সময় নষ্ট। আপনার দেখার যোগ্য কোনো জিনিসও নেই। আমি অনেকের কাছেই শুনেছি ওখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা কিছুই বোঝেন না, এমনকী ভাল করে কথাও বলতে পারেন না। এই সমুদ্রের জলের অজস্র নাম-না-জানা মাছের মতো।"
- "আমি যেতে চাই।" বিশপ এবার জোর দিয়ে বললেন, "তাতে তোমাদের যা অতিরিক্ত খরচ, সময় বা ঝামেলা হবে, তার ক্ষতিপূরণ বাবদ সব আমি দিয়ে দেব। ওখানে নিয়ে চলো।"

এরপর আর কিছুই করার নেই। ক্যাপ্টেন জাহাজ ঘোরানোর নির্দেশ দিল। পাল ঘোরানো হ'ল সেইমতো, জাহাজ দ্বীপ

অভিমুখে চলল | একটা চেয়ার এনে ডেকে রাখা হ'ল, বিশপ তাতে বসে মনোযোগসহ সব গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন | আশপাশে অনেক লোক জড়ো হয়ে খুব উৎসাহ নিয়ে দেখতে লাগল | জাহাজ একটু একটু করে এগোচ্ছে, সকলে দ্বীপের ছোট টিলার মতো পাথর আর মাটির বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখাতে লাগল | ক্যাপ্টেন একটা দূরবীন এনে নিজে দেখে নিয়ে, বিশপের হাতে দিল |

হ্যাঁ ঠিকই তো, ওই ডানদিকে বড় পাথরের ঠিক পাশে তিনজন

মানুষ দাঁড়িয়ে | একজন বেশ লম্বা, আরেকজন তার থেকে কম আর শেষ জন ছোটখাটো চেহারার | ওঁরা অবাক বিস্ময়ে এদিকে তাকিয়ে সার দিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন; তিনজন একে অপরের হাত ধরা |

ক্যাপ্টেন এবার বিশপের সামনে এসে বলল, "জাহাজ আর যেতে পারবে না, এখানেই রাখতে হবে | আপনি চাইলে ডিঙি করে যেতে পারেন, আমরা জাহাজকে নোঙ্গর করে এখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করব |"

এসব কথার মধ্যেই জাহাজ নোঙ্গর করার জন্য মোটা দড়ি বার করা হ'ল | হঠাৎ থামায় প্রচন্ড একটা ধাক্কা লাগল – সমস্ত জাহাজটা কেঁপে উঠল | জাহাজ থেকে ডিঙি নামানো হ'ল জলে | মাঝির দল লাফিয়ে নেমে পড়ল, ওরা দড়ির সিঁড়ি নামাতেই বিশপ সাবধানে নেমে, বসে পড়লেন ডিঙিতে | এবার জাহাজ থেকে ডিঙিকে আলাদা করে নিতে ডিঙি তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চলল দ্বীপের দিকে |

দ্বীপের কাছাকাছি এলে, ওঁরা দেখতে পেলেন, তিনজন বৃদ্ধ মানুষ তখনো দাঁড়িয়ে আছেন | সবচেয়ে লম্বা লোকটির কোমরে কোনোরকমে একটা কৌপীন বাঁধা, তার থেকে ছোট মানুষটির পরণে শতছিন্ন এক চাষাভুষোর পোশাক আর সবথেকে ছোটখাটো মানুষটির পরণে এক বহু পুরনো পাদ্রীদের মতো পোশাক – হাত ধরাধরি করে ওঁরা বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে |

মাঝিরা পাড়ে এসে ডিঙির দড়ি টেনে ধরতে, বিশপ ডাঙায় নামলেন | ওঁরা তিনজন এবার বিশপকে দেখে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন | বিশপ ওঁদের আশীর্বাদ করলেন... ওঁরা মাথা আরো নুইয়ে ঝুঁকে রইলেন | বিশপ তখন কথা বলতে শুরু করলেন |

- "আমি শুনেছি, আপনারা ধার্মিক পুরুষ, এখানে আপনাদের আত্মার নির্বাণলাভের জন্য এবং সমাজের সকলের কল্যাণের জন্য তপস্যা করছেন | আমি পরম প্রভু যীশুর অযোগ্য দাসমাত্র; আমাকে ঈশ্বরের সেবা ও প্রার্থনা প্রচারের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে | আমি আপনাদের দর্শন পেতে এসেছি, আর জানতে এসেছি আপনাদের কোনো কাজে লাগতে পারি কিনা, ঈশ্বরের উপাসনার সঠিক কিছু পদ্ধতিও আপনাদের শেখাতে পারি |"

ওঁরা তিনজন সেই শুনে একটু হাসলেন, একবার একে অপরের দিকে তাকালেনও কিন্তু তিনজনেই নীরব রইলেন |

- "বলুন আপনারা," বিশপ বললেন, "আপনারা নিজেদের মুক্তির জন্য কীভাবে সাধনা করছেন আর এই ছোট্ট দ্বীপে বাকি দ্বীপবাসীর জন্যই বা কী কী করছেন?"

দ্বিতীয় তপস্বী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রথম বয়স্ক ছোটখাটো তপস্বীর দিকে তাকালেন | প্রথমজন একটু হেসে বললেন, "আমরা কিছুই জানি না, আমরা শুধু নিজেদের মুক্তির জন্য সাধনা করি দিনরাত | আমরা ঈশ্বরের দাসমাত্র |"

- "কিন্তু আপনারা কীভাবে প্রার্থনা করেন? পদ্ধতিটাই বা কী?" বিশপ আবার প্রশ্ন করলেন |

- "আমরা ঠিক এইভাবে তাঁকে বলি, আমরা তিনজনা, তিনজনা আমরা, তোমার করুণা আসুক আমাদের ওপর, হে ঈশ্বর |"

বৃদ্ধ যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, বাকি দুজন আকাশে স্বর্গের দিকে মুখ তুলে এই প্রার্থনাই করলেন বারবার |

বিশপ স্মিত হাসলেন |

- "আপনারা সত্যি সাধক আর নিশ্চিতভাবে পবিত্র ত্রিত্ব সম্বন্ধে শুনেছেন, কিন্তু আপনাদের প্রার্থনার ধরনটা ঠিক নয় | আপনারা আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছেন | আপনারা ঈশ্বরকে পেতে চাইছেন, কিন্তু পদ্ধতিটা জানেন না | এভাবে প্রার্থনা করে তাঁকে পাওয়া যায় না | আমি আপনাদের শেখাব কীভাবে প্রার্থনা করতে

হয়। না না, আমার নিজের মতো নয়, যেভাবে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, ঠিক সেইভাবে।"

বিশপ এবারে বিশদভাবে বোঝাতে লাগলেন, ঈশ্বর কীভাবে আপনাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছিলেন, তাদের বলেছিলেন, ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বরই পবিত্র আত্মা। মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরেরই পুত্র তারপর এই পৃথিবীতে আসেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন প্রার্থনার পদ্ধতি, যা সব ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে। বিশপ বলতে থাকলেন, "এখন আপনারা আমার সঙ্গে বলুন, হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা..." প্রথমজন সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকলেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা," দ্বিতীয়জন বললেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা," এবার তৃতীয়জন বললেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা..."

বিশপ বললেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।" প্রথমজন বললেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।" দ্বিতীয়জন শব্দগুলিতে গন্ডগোল করে ফেললেন, এরপর লম্বা মতন তপস্বীটি তো ভাল করে কিছু বলতেই পারলেন না। তাঁর দাড়ি-গোঁফ-চুলে সারা মুখ ঢাকা, ভাল করে কোনো কথাই শোনা বা বোঝা যায় না। বয়স্কজনের কোনো দাঁত নেই, তাই সব কথাই অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন। অনেক শব্দই দন্তহীন মুখ থেকে হাওয়ায় ভেসে হারিয়ে গেল।

বিশপ আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শব্দ অতি যত্নে বলতে থাকলেন, এঁরাও সেগুলি সাধ্যমতো পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ এই পর্ব চলতে থাকল। বিশপ একটি পাথরের ওপর বসলেন, তিন বৃদ্ধ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রতিটি শব্দ বলতে থাকলেন। সারাদিন ধরে বিশপ অক্লান্তভাবে কুড়ি, চল্লিশ, একশোবার ধর্মগ্রন্থের এই পবিত্র প্রার্থনা বলতেই থাকলেন। বৃদ্ধরাও পুনরাবৃত্তি করলেন, ভুল করলেন, শুধরে নিলেন, আবার শুরু করলেন এইভাবেই চলতে থাকল। যতক্ষণ না ওঁরা নিজেরা পুরোপুরি বলতে পারেন বিশপ ততক্ষণ পর্যন্ত ওঁদের কাছে রইলেন আর বারবার ঈশ্বরের প্রার্থনা শেখালেন। মধ্যেরজন প্রথম সম্পূর্ণভাবে এটি বলতে পারলেন। বিশপ তাঁকে দিয়ে বলালেন... শেষপর্যন্ত বাকি দুজনও সম্পূর্ণ প্রার্থনাটি নিজে থেকে বলতে পারলেন।

বিদায় নেওয়ার আগেই চারদিকে অন্ধকার নামছে একটু একটু করে, দিগন্তে চাঁদ দেখা দিল জলের উপরে, তার রূপোলি আলোয় এক মায়াময় সন্ধ্যে। বিশপ উঠে দাঁড়ালেন, বিদায় চাইলেন সরল, ধার্মিক বৃদ্ধ মানুষগুলির থেকে। তাঁরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সাষ্টাঙ্গে বিশপকে প্রণাম জানালেন। যত্ন করে তাঁদের তুলে, প্রত্যেককে আদর করে তাঁর শেখানো প্রার্থনা কীভাবে করতে হবে বিশপ আবার বলে দিলেন তাঁদের। তাঁরা মাথা নাড়লেন। বিদায় পর্বের পর তিনি ডিঙি চড়ে জাহাজের দিকে যাত্রা করলেন।

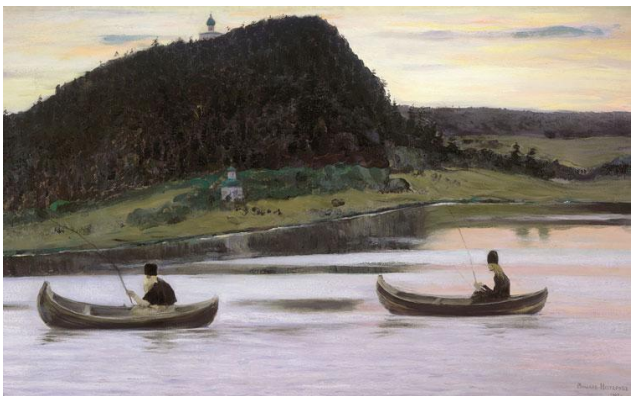

যখন নৌকাতে বসেছেন, নৌকা বাওয়ার তালে তালে তিনি শুনতে পেলেন তিন তপস্বীর গলা, একসঙ্গে তাঁর শেখানো প্রার্থনামন্ত্র নিষ্ঠাভরে পাঠ করে চলেছেন। ডিঙি নৌকা যখন জাহাজের কাছাকাছি চলে এসেছে, তিনি আর তাঁদের গলা শুনতে পেলেন না, কিন্তু জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, ছোটখাটো মানুষটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সবচেয়ে লম্বা মানুষটি ডানদিকে আর মাঝারি চেহারার মানুষটি বাঁদিকে।

ডিঙি জাহাজে পৌঁছানমাত্র বিশপকে তুলে নিয়ে খোলা হাওয়ায় জাহাজ তরতর করে এগিয়ে যেতে লাগল। বিশপ পরিপূর্ণ চিত্তে জাহাজের ডেকে বসে ফেলে আসা দ্বীপটির দিকে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি ছায়ার মতো তিন তপস্বীকে দেখতে পাচ্ছিলেন, তারপর শুধু দ্বীপরেখা, আর তারপর সেটাও কোথায় মিলিয়ে গেল। এখন শুধু আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র আর চিকচিকে চাঁদের আলোয় দুলছে তার তরঙ্গ। তীর্থযাত্রীর দল শুয়ে পড়েছে, ডেকের কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। বিশপের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। অন্ধকারে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে একা বসে তিনি। দ্বীপটির কোনো

চিহ্নমাত্র নেই কোনোদিকে | বিশপ ভাবছিলেন, আজ সারাদিনের কথা আর সেই তিনজন ধার্মিক মানুষগুলির কথা | আহা, ওঁরা তাঁর থেকে প্রার্থনামন্ত্র কী আগ্রহভরে শিখে নিলেন | তাঁকে ওখানে পাঠানোর জন্য, ওই দেবদূতের মতো ধার্মিক মানুষগুলিকে প্রার্থনার সঠিক পদ্ধতি শেখানোর জন্য ঈশ্বরকে বারবার ধন্যবাদ জানালেন বিশপ |

চাঁদের আলো কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে কখনো বা ঢেউয়ের গায়ে গায়ে নেচে বেড়াচ্ছে | এইসব ভাবতে ভাবতে বিশপ হঠাৎ দেখলেন, একটা খুব উজ্জ্বল আলো যেন সমুদ্রে এসে আছড়ে পড়ছে | কী এটা? কোনো সামুদ্রিক পাখি, নাকি সীগাল? কোনো ঝলমলে পালতোলা ছোট নৌকা? চোখ আটকে গেল তাঁর, অবাক বিস্ময়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না | হয়তো ওটা একটা নৌকা আমাদের নাগাল পেতে চাইছে | কিন্তু কী আশ্চর্য, মিনিটখানেক আগেই ওটা তো অনেক পিছনে ছিল, এখন তো দেখছি বেশ কাছাকাছি! তাছাড়া কোনো পালও তো দেখছি না | ওটা যাই হোক, আমাদের পিছু পিছু তাড়া করছে, আমাদের যেন ধরতে চাইছে | কিছুতেই বুঝতে পারলেন না...

না, নৌকা নয়, কোনো পাখি বা মাছও নয়, মানুষ হবে সেটাও সম্ভব নয় | মানুষ কীভাবে সমুদ্রের মাঝখানে থাকবে? বিশপ উঠে দাঁড়িয়ে জাহাজের নাবিকদের কাছে গিয়ে বললেন, "ভাইরা, দেখো তো ওই আলোর রেখা, যেটা ছুটে আসছে আমাদেরই জাহাজের দিকে, সেটা কী হতে পারে?" কথার মাঝে বিশপ নিজেই হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সেই তিন তপস্বী জলের ওপর দিয়ে ছুটে ছুটে এদিকেই আসছেন | ধবধবে সাদা তাঁদের লম্বা দাড়ি, সাদা পোশাক যেন চাঁদের আলোয় আরো উজ্জ্বল, আরো ঝকঝকে | তাঁরা জাহাজের খুব কাছাকাছি এসে গেছেন কিন্তু আপাতভাবে মনে হচ্ছে তাঁরা যেন সম্পূর্ণ স্থির | মাঝি আর নাবিকের দল এই দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁটা হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল |

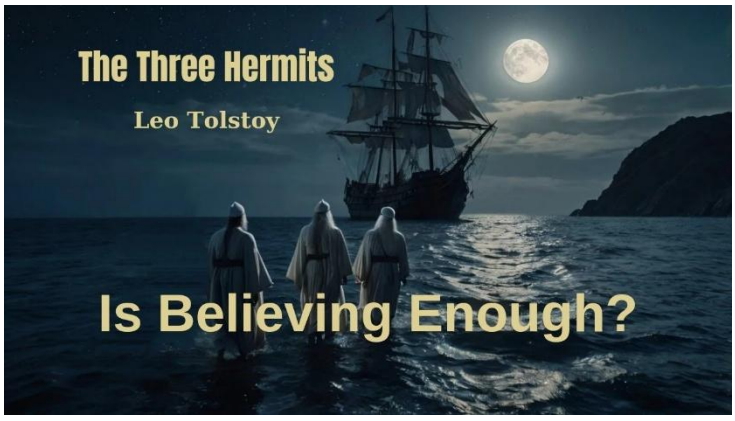

- "হায় ভগবান, তিন তপস্বী আমাদের দিকে যেভাবে জলের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছেন, যেন মনে হয় ওঁরা ডাঙাতেই ছুটছেন!" কেউ কেউ ফিসফাস করতে লাগল |

সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের মতো খবর গেল ছড়িয়ে | জাহাজের বাকি যাত্রীরা হুড়মুড় করে ডেকে পৌঁছে গেল | তারা দেখল তপস্বীরা হাত ধরাধরি করে আসছেন, দুপাশের দুজন তাঁদের খালি হাত নেড়ে নেড়ে জাহাজটি থামাবার চেষ্টা করছেন | তিনজনে জলের ওপরে ভেসে ভেসে আসছেন, তাঁদের পা কিন্তু একটুও নড়ছে না |

জাহাজ থামার আগেই তাঁরা তিনজন পৌঁছে গেলেন | তারপর হাত তুলে একসঙ্গে, একস্বরে বললেন, "হে ঈশ্বরের দাস, আমরা আপনার শেখানো প্রার্থনামন্ত্র ভুলে গেছি | যতক্ষণ আমরা ওই শব্দগুলি উচ্চারণ করছিলাম আমাদের সব মনে ছিল, তারপর যেই বন্ধ করলাম এক একটা শব্দ হারিয়ে যেতে লাগল | এখন সবটাই ভুলে গেছি | আর কিচ্ছু মনে নেই | আমাদের আবার শিখিয়ে দিন |"

বিশপ স্তব্ধবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন | তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মাথা নুইয়ে খ্রিস্টীয় প্রথামতো নিজের বুকে ক্রস এঁকে জাহাজের ধারে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "হে পরম ধার্মিক পুণ্যাত্মা, আপনাদের নিজস্ব প্রার্থনাই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবে আপনাদের | আমার সত্যি কিছু শেখানোর নেই | আপনারা আমাদের মতো সাধারণ পাপীতাপী মানুষের জন্য প্রার্থনা করবেন |"

বিশপ ভক্তিভরে প্রণাম করলেন ওঁদের তিনজনকে – ওঁরা তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ফিরে গেলেন |

ওঁরা যেখান দিয়ে চলে গেলেন, একটি বিশুদ্ধ উজ্জ্বল আলোর রেখা শুধু রয়ে গেল ওঁদের যাত্রাপথের চিহ্ন হিসেবে, রয়ে গেল পরদিন সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত | তারপর শুধু জল আর জল | আদিগন্ত সমুদ্র |

অ্যানা প্যাবলোভনা

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা:

গল্পটি অলীক হলেও মানব চরিত্রের কিছু অমোঘ সত্য লুকিয়ে আছে এর পাতায় পাতায় | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অমানুষিক ও কলুষিত ইতিহাসের মধ্যে ছেঁড়া-ছেঁড়াভাবে ছড়ানো আছে হৃদয়ের স্পন্দন আর নিষ্কাম বলিদান | যাঁরা শত্রুকে ক্ষমা করতে পারেন আর যাঁরা পরিস্থিতির করাল কোপে পরিবর্তনশীল বন্ধুকে কাছে টানতে পারেন তাঁদের জন্য উৎসর্গ করি এই কাহিনী |

****

বার্লিন, ১৯৪১

টিয়ারগার্টেন স্ট্রেসের অভিজাত পাড়ার এক দোতলা বাড়ি থেকে ভেসে আসছে চাইকফস্কির দ্বিতীয় সিম্ফোনি | কে যেন পটুহাতে পিয়ানো বাজাচ্ছে | ব্র্যান্ডেনবার্গ গেটের পেছনে একফালি চাঁদ উঁকি দিচ্ছে | তার পিঙ্গল আলোয় গেটের মাথায় স্বস্তিকাটা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে | বৌয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনদিনের ছুটিতে গুস্তাভ মাইসনার, ৮২তম প্যাঞ্জার ট্যাঙ্ক ডিভিশনের কম্যান্ডার বাড়ি এসেছে | বিটোভেন, মোৎজার্ট, বাখের থেকেও রাশিয়ার চাইকফস্কি তার বেশি প্রিয় | গুস্তাভ তিন বছর বয়স থেকে পিয়ানো বাজাতে শিখেছে | ঘোরতর যুদ্ধের মধ্যেও চাইকফস্কির অপেরা গুনগুন করে সে | এ নিয়ে অন্যান্য ট্যাঙ্ক-চালকরা হাসে বটে, তবে শ্রদ্ধা করে ট্যাঙ্ক পরিচালনায় তার পারদর্শিতার জন্য | সে তিনবার 'আয়রন ক্রস' মেডেল পেয়েছে | হিটলার নিজের হাতে 'সোলজার অফ থার্ড রাইক' মেডেল তার গলায় পরিয়ে দিয়েছে |

গুস্তাভর বৌ, হেলেনা প্রসাধন সেরে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরেছে পিছন থেকে | হেলেনার শরীরের মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরপুর | গুস্তাভর গলায় চুমু খেতে খেতে হেলেনা অভিমান করে বলেছে, "বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, তাড়াতাড়ি চলো, খেতে যাই |" চোখ বুজে বিভোর হয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে গুস্তাভ; হেলেনার কথায় খেয়াল হ'ল জন্মদিনে তাকে ডিনারে নিয়ে যাবে বলেছিল | বাজনা থামিয়ে চটপট তৈরী হয়ে নিল সে | হঠাৎ বাড়ির মিলিটারি ফোনটা বেজে উঠল | একটু অসন্তুষ্ট হয়েই ফোনটা তুলল গুস্তাভ | ছুটির সময় মিলিটারি ফোন বন্ধ থাকার কথা | ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এল জার্মান আর্মির সমস্ত প্যাঞ্জার ট্যাঙ্ক ডিভিশনের হর্তাকর্তা ফিল্ড মার্শাল হাইঞ্জ গুডেরিয়ানের গলা | বার্তালাপের পর "হেইল হিটলার" বলে ফোন রাখল গুস্তাভ | দোরগোড়ায় হেলেনা অপেক্ষারত | গুস্তাভ হেলেনার কোমর জড়িয়ে গাড়ির দিকে এগোল | সারা সন্ধ্যেটায় কেমন যেন একটা থমথমে ভাব | গুস্তাভ খুবই অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে | আর্মি অফিসারের বৌদের মিলিটারি ফোনের কথোপকথন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষেধ | তবু হেলেনা আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবছ এত? - "গুডেরিয়ান কল করেছিল, কাল সকালে হাজিরা দিতে হবে 'অপারেশন বারবারোসা' হেড কোয়ার্টার্সে | হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবে জুন মাসের বাইশ তারিখে, আজ থেকে তিনদিন পর | পাগল কুত্তা কোথাকার!" রাগে বিতৃষ্ণায় গুস্তাভর মুখ রক্তিম | তবে সে একজন প্যাঞ্জার অফিসার, হুকুম পালন করা তার কর্তব্য; কর্তব্যপরায়ণতা তার ধর্ম |

আর্দ্রচোখে হাত নেড়ে গুস্তাভকে বিদায় জানিয়েছে হেলেনা | সে নিঃসন্তান, সে নিঃস্ব | তার স্বামী অনির্দিষ্ট ভয়াবহ ভবিষ্যতে ঝাঁপ দিতে চলেছে | একটি সন্তানও হয়নি তার ঔরসে, যাকে স্বামীর প্রতিবিম্ব ভেবে দিন কাটাবে | গুস্তাভ 'আয়রন ক্রস' নিতে ভুলে গেছে; আর ভুলে গেছে হেলেনার দেওয়া সেই রক্ষাকবচ, 'ক্রাইস্ট অন দ্য ক্রস' গলার চেনটা |

****

অপারেশন বারবারোসা, ১৯৪১

আক্রমণ শুরু হয়েছে | হিটলারের তিনটি শহরের উপর আক্রোশ – মস্কো, কিএভ আর স্ট্যালিনগ্র্যাড | তিন সপ্তাহের মধ্যে জার্মানদের অভাবনীয় সফলতা | ফিল্ড মার্শাল গুডেরিয়ানের সৈন্যবাহিনী মস্কো থেকে মাত্র দু'শ মাইল দূরে | কিএভ শহরে জার্মান সৈন্যদল ঢুকে পড়েছে | জেনারেল পৌলসের পরিচালনায় ট্যাঙ্কবাহিনী স্ট্যালিনগ্র্যাড শহরের ভেতর গোলাবর্ষণ করছে | তবে পশ্চাৎপদ রাশিয়ান সৈন্যদল ও শহর-গ্রামবাসীরা সবকিছু ধ্বংস করেছে | শহর-গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, শস্যভাণ্ডারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, নদীর উপর সবকটা সেতু বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে, কারখানা ধ্বংস করেছে; এমনকী মাঠের ফসলে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে | জার্মান সৈন্যদের থাকবার বাড়ি নেই, খাবারের শস্য নেই,

তেষ্টার জল নেই, পেট্রল নেই | রাস্তাঘাটও তাদের নতুন করে তৈরী করতে হবে | দু'শ বছর আগে যখন ফরাসী আক্রমণকারী নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করেছিল তখনও ঠিক এই পদ্ধতিই নিয়েছিল রাশিয়ার জার নিকোলাস | নেপোলিয়ান মস্কো পর্যন্ত এসেছিল বটে কিন্তু সৈন্যসহ ফিরে যেতে পারেনি; রাশিয়ার ওই ঠান্ডায় বিশলাখ সৈন্যের মধ্যে দশহাজার ফরাসী সৈন্য বেঁচে ফিরেছিল | এখন গ্রীষ্মকাল, জার্মানদের সুসময়, তবে ইতিহাসের বড্ড দোষ, সর্বদা অতীতের পুনরাবর্তন করে |

য়ুরোস্লাভ গ্রাম, অগাস্ট, ১৯৪১

ভোল্গা নদীতটে য়ুরোস্লাভ নামে একটি ছোট গ্রাম; তিন'শ ঘরের বসতি | মাছ ধরার সামান্য বাণিজ্য, আর আছে ফেল্টজুতো বানাবার এক অস্বাস্থ্যকর কারখানা | অ্যানা প্যাবলোভনার স্বামী নিকোলাই বিশবছর কাজ করেছে এই কারখানায় | অ্যাসবেস্টাস আর উলের রোঁয়া তার ফুসসুসে ঢুকে তাকে যক্ষ্মারুগীতে পরিণত করেছে | নিকোলাইয়ের মেয়াদ আর বছরখানেক | গ্রামের মোড়ল জারকফের হুকুমে নিকোলাইকে যৌথ পরিবারের বাইরে গুদামঘরে পাচার করা হয়েছে | বলাবাহুল্য যে নিকোলাইয়ের বুকের অসুখ যক্ষ্মা কিনা তা নির্নয় করা হয়নি | অ্যানা আর নিকোলাইয়ের একমাত্র কন্যা লুডমিলার বয়স সাত বছর | তাদের বাড়িতে একটা বহু পুরনো পিয়ানো আছে, যেটা এককালে অ্যানা বাজাত; এখন সে মাঝে মাঝে বাজিয়ে লুডমিলার সঙ্গে বেহালায় সঙ্গত করে | লুডমিলার বাজনা খুব মধুর; স্কুলে অনেক পুরস্কারও পেয়েছে | রোজ সে বেহালা বাজিয়ে গুদামঘরে বাবাকে ঘুম পাড়ায় আর কাঠের চুল্লির আগুন উস্কে দিয়ে বাড়িতে ঢোকে | নিকোলাইয়ের মুখ থেকে রক্ত পড়ার পর তাকে কারখানার চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়া হয় | অনেক কাকুতি-মিনতি করে অ্যানা একটা ছোটখাটো চাকরি পেয়েছে ফেল্টজুতোর কারখানায় | তাতে বাড়ির খরচ কষ্ট করে চলে গেলেও স্বামীর চিকিৎসা বা তার পুষ্টিকর পথ্যের জন্য কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকে না |

গুস্তাভর ৮২তম প্যাঞ্জার ডিভিশন য়ুরোস্লাভ গ্রামে অপেক্ষারত, কারণ পেট্রল শেষ | রাশিয়ার সব পেট্রল-খনিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে রাশিয়ানরা নিজে | একমাত্র পথ, ফিনল্যান্ড হয়ে পেট্রল আসছে, অন্তত তিন থেকে চারমাস লাগবে | জার্মান গ্যারিসন য়ুরোস্লাভে আসায় ছোটখাটো চাকরির বাজার বেশ ভাল | যদিও সেসব চাকর-বাকরের কাজ, কিন্তু মজুরি মন্দ নয় | তবে কিনা চাকরি পেতে গেলে জারকফের অনুমতি চাই | পুরুষ চাকুরেরা তাকে টাকা ঘুষ দিয়েই খালাস | কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে | নিস্তির হিসেবে জারকফ টাকা ঘুষ আর দেহ ঘুষ ভাগাভাগি করে নেয় | সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী হলে টাকার ঘুষ পুরোপুরি মাফ | অ্যানাকে জারকফ আগেও ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছে; স্বামী যক্ষ্মারুগী আর যক্ষ্মা খুব ছোঁয়াচে রোগ, সেই ভয় দেখিয়ে অ্যানা তাকে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে | তবে কতদিন সে তার সতীত্ব বজায় রাখতে পারবে সন্দেহ | জারকফের দয়ায় অ্যানা জার্মান সৈন্যদের ক্যাফেটেরিয়ায় বাসন ধোওয়ার একটা কাজ পেয়েছে | সেখান থেকে উচ্ছিষ্ট, আধখাওয়া মাংসের টুকরোগুলো সে বাড়িতে এনে ফুটন্ত জলে ধুয়ে রান্না করে স্বামী ও মেয়েকে খাওয়ায় | বাবা-মেয়ে ঘুণাক্ষরেও জানে না এই সুস্বাদু খাবারের উৎস কোথায় | কিচেনের দশাসই জার্মান পাচকের অ্যানার প্রতি লোভ | অ্যানা যথাসম্ভব সাধারণ বেশভূষা করে, প্রসাধন নেয় না, পুরনো-ছেঁড়া তার জামাকাপড়, তবে তার যৌবন কোথায় লুকোবে! আজ সন্ধ্যেবেলা নিরিবিলিতে দুরাচার পাচক অ্যানাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে গুদামঘরে ধর্ষণের জন্য | অ্যানা তার চোখে আঙুল ফুটিয়ে ছুটে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ায় | তবে রান্নাঘর থেকে উচ্ছিষ্ট খাবারের ঝোলাটা নিতে ভোলেনি | তার স্বামী ও মেয়ের রাতের খাবার | রাগে, ঘৃণায় অ্যানা দুর্বল বোধ করছে | ভাবছে মেয়েকে তার ছেঁড়াজামার ব্যাপারে কী বলবে | উত্তেজনায় তার পা কাঁপছে | অনেকটা পথ যেতে হবে | হঠাৎ একটা জার্মান জীপ্ অ্যানার সামনে জোরে ব্রেক কষে দাঁড়াল | তিনজন কুখ্যাত S S পুলিশ আর তাদের সাথে আছে ওই পিশাচ পাচক | একজন পুলিশ অ্যানার হাত থেকে ঝোলাটা ছিনিয়ে নিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে জীপের আলোর সামনে | মাংসের টুকরোগুলো ধুলোতে পড়ে রয়েছে | তারা নিজেদের মধ্যে কীসব কথাবার্তা বলছে | জার্মানরা আসার পর য়ুরোস্লাভ গ্রামে মার্শাল নিয়ম ধার্য হয়েছে | চুরির দন্ড ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু | অ্যানা উবু হয়ে বসে ধুলোমাখা মাংসের টুকরোগুলো আবার ঝোলায় ভরতে চেষ্টা করছে | হঠাৎ অ্যানার বুকে বুটের এক লাথি – ছিটকে পড়েছে সে | চারজন জার্মান একসঙ্গে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠেছে | দুর্বল শরীর আর বুটের আঘাতে অ্যানা

অজ্ঞান হয়ে গেছে। একজন অফিসার তার দুহাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে দেওয়ালের দিকে আর বাকি দুজন কোমর থেকে পিস্তল বার করেছে। অ্যানার শিথিল শরীরটা কোনমতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চারজনেই স্যালুট করে দাঁড়িয়েছে – কম্যান্ডার গুস্তাভ গাড়ি থেকে নেমে গম্ভীর গলায় দন্ডায়মান তিনজন অফিসারকে প্রশ্ন করছে। ইতিমধ্যে অ্যানার জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে বিড়বিড় করে রাশিয়ান ভাষায় রুগ্ন স্বামী আর মেয়ের অভুক্ত অবস্থার কথা বলছে। গুস্তাভ ভালমতো রাশিয়ান ভাষা জানে; সে অ্যানাকে প্রশ্ন করেছে কিচেন থেকে মাংস চুরির ব্যাপারে। ফেলে দেওয়া মাংসের টুকরোগুলো দেখিয়ে অ্যানা বলছে তার যক্ষ্মারুগী স্বামী আর মেয়ের শীর্ণতার কথা। কোনমতে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুহাত দিয়ে বুকের উপর নারীলজ্জা ঢাকছে। অ্যানার শরীরে পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন বুঝতে বিচক্ষণ গুস্তাভর অসুবিধে হয়নি। তিনজন অফিসার আর সেই পাচককে কোর্ট মার্শালের আদেশ দিয়ে গুস্তাভ ড্রাইভারকে বলেছে অ্যানাকে গাড়িতে তুলতে, নয়তো এই ঠান্ডায় দুর্বল অ্যানা রাস্তাতেই মারা যাবে। অ্যানার বাড়ি অনেক দূরে। গাড়ি এসে থেমেছে অ্যানার বাড়ির সামনে। বেহালায় চাইকফস্কির দ্বিতীয় সিম্ফোনির মিষ্টি সুর ভেসে আসছে গুদামঘর থেকে। গুস্তাভ একমনে শুনছে সেই সুর। সে জানতে চাইল বেহালা বাদকের নাম। অ্যানা জানিয়েছে, "আমার সাত বছরের মেয়ে, লুডমিলা। আমার স্বামী যক্ষ্মারুগী তাই গ্রামের মোড়ল তাকে বাড়ি থেকে বার করে গুদামঘরে রেখেছে। লুডমিলা রোজ রুগ্ন বাবাকে বেহালা বাজিয়ে ঘুম পাড়ায়। আজ তাদের খাওয়া হয়নি। এই মাংসগুলো দিয়ে স্যুপ বানিয়ে দেব তাদের জন্য।" এমন করুণ কাহিনী শুনে গুস্তাভর চোখ আর্দ্র। নিজের দুর্বলতা ঢেকে সে অ্যানাকে বলেছে, "চলো তোমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাই; তোমার মেয়ের সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। আমি আবার আসব তার হাতের মিষ্টি বাজনা শুনতে।"

সঙ্গীতপ্রেমী গুস্তাভ প্রায়ই আসে লুডমিলার বেহালা শুনতে। তাদের সেই পুরনো পিয়ানো বাজিয়ে সে লুডমিলার সঙ্গে সঙ্গত করে। অ্যানাকে এঁটো খাবার আনতে বারণ করেছে গুস্তাভ। প্রতি সপ্তাহে ড্রাইভার মারফৎ মাংস ও অন্যান্য সাংসারিক জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেয় সে অ্যানার বাড়িতে। য়ুরোস্লাভের গ্রামবাসীদের দুরাবস্থা দেখে গুস্তাভ সব পরিবারের রেশন বাড়িয়ে দিয়েছে। জারকফকে হুকুম করেছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অসুস্থ গ্রামবাসীদের একটি তালিকা তৈরী করতে। জার্মান মিলিটারি হাসপাতালে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জারকফের কাজ বেড়েছে, আর তার উপরি কমেছে। অরাজকতা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেনামি কমপ্লেন বক্স বসানো হয়েছে। জারকফ দুবার ওয়ার্নিং পেয়েছে, তৃতীয়বারে তাকে জেল খাটতে হবে আর চাকরি যাবে। সেজন্য সে এখন খুব সাবধানী; দিন গুনছে কবে জার্মান গ্যারিসন য়ুরোস্লাভ থেকে বিদায় হবে। অনেকের সাথে তার হিসাব-নিকাশ করার আছে, সবথেকে আগে অ্যানার সঙ্গে।

দিনের আলোর মেয়াদ কমছে, তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়। গাছের পাতায় রঙ ধরেছে, বাতাসে ছেঁড়া ছেঁড়া বরফের পাপড়ি ভেসে বেড়াচ্ছে। য়ুরোস্লাভে শীত আসে তাড়াতাড়ি আর যায় দেরি করে। ভোল্গানদী জমে গেছে, হেঁটেই এপার ওপার করা যায়; এমনকি গাড়ি-ঘোড়াও নদীর উপর দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। কখনো কখনো গুস্তাভ যুদ্ধের টুকিটাকি খবর জানায় অ্যানাকে। জেনারেল পৌলস উত্তর স্ট্যালিনগ্র্যাডের শহরতলি কব্জা করলেও অলিগলির বাড়িতে এখনও হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। জার্মানরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি রাশিয়ান সৈন্যদের মতো সেখানের নাগরিকরাও যে এত দৃঢ় সংকল্প এবং মাতৃভূমির প্রতি তাদের এমন টান। রাশিয়ানরা তিনটি চক্রব্যূহ দিয়ে স্ট্যালিনগ্র্যাড ঘিরে রেখেছে। জার্মান সৈন্যদের খাবার, ট্রাকের জন্য পেট্রল, কামানের গোলাবারুদ কিছুই শহরের ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই। বিমান মারফৎ কিছু সামগ্রী আসছে, তবে তার সিকিভাগ জার্মানরা পাচ্ছে। দক্ষিণে ফিল্ড মার্শাল গুডেরিয়ানের সৈন্যবাহিনী মস্কো থেকে তিরিশ মাইল দূরে আটকে রয়েছে। হাজার হাজার রাশিয়ান সৈন্য যুদ্ধে মারা গেছে; তবু কোথা থেকে পঙ্গপালের মতো রাশিয়ানরা কাতারে কাতারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যুদ্ধক্ষেত্রে। মাতৃভূমির জন্য প্রাণ বলিদান দেওয়া তাদের কাছে তুচ্ছ আহুতি! সৈন্য আর নাগরিকদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, সকলেই দেশোদ্ধারের মন্ত্রে দীক্ষিত। হিটলারের কাছ থেকে জরুরি তলব এসেছে যে গুস্তাভকে দক্ষিণে যেতে হবে গুডেরিয়ানকে মস্কোর যুদ্ধে সাহায্য করতে।

ফিনল্যান্ড থেকে ট্রাকের পর ট্রাকভর্তি পেট্রল

আসছে, চারদিকে সাজ সাজ রব| তিনদিন পর গুস্তাভর প্যাঞ্জার গ্যারিসন মস্কো অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে| গুস্তাভ সন্ধ্যেবেলা অ্যানার কাছে এসেছে| লুডমিলা বন্ধুর জন্মদিন উৎসবে গেছে| অ্যানা বেহালা বাজাচ্ছে, গুস্তাভ বিভোর হয়ে তার পটু হাতের সুমধুর বাজনা শুনছে | বাজনা শেষ হলে গুস্তাভ অ্যানাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে| অ্যানা গুস্তাভর দুহাত ধরে অপলকে চেয়ে আছে তার দিকে, ঠোঁটটা কাঁপছে, কী যেন সে বলতে চায় গুস্তাভকে | গুস্তাভ অ্যানাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছে, "শত্রুকে কি ভালবাসতে হয়?" অ্যানা নিবিড়ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলেছে, "আমি অন্তঃসত্ত্বা, শত্রুর সন্তানের মা হতে চলেছি |" আনন্দে আত্মহারা হয়ে গুস্তাভ বলেছে, "আমি যে কোনদিন বাবা হতে পারব সে আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম| ক্যান্সারের কারণে হেলেনার বাচ্চা হবার আর কোনো উপায় নেই| অ্যানা, আমি তোমার কাছে ঋণী; আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য কেউ থাকবে তাহলে!"

ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে গুস্তাভর ট্যাঙ্ক মস্কোর দিকে পাড়ি দিচ্ছে | হিমেল বাতাস, ঝুপঝুপ করে বরফ পড়ছে | তাপমাত্রা শূন্যের থেকে কুড়ি ডিগ্রি নিচে | রাশিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করা যায় কিন্তু রাশিয়ার শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা মাত্র | কম্যান্ড ট্যাঙ্কের গহ্বরে দাঁড়িয়ে গুস্তাভর লিও টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' গল্পের কথা মনে পড়ছে | রাশিয়ার দুঃসহ শীতের কাছে নেপোলিয়ানের পরাজয়| ইতিহাস আবার করাল রূপ ধারণ করে বর্তমানে না এসে দাঁড়ায়! য়ুরোস্লাভ গ্রামের শেষপ্রান্তে গুস্তাভর ট্যাঙ্ক এসে পৌঁছেছে | আধো-ভোরের অস্তমিত কালপুরুষ তাকিয়ে আছে তার দিকে!

****

সাইবেরিয়ার জেলখানা, গুলাগ

জার্মানরা যাবার পরদিন থেকেই জারকফের অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়েছে য়ুরোস্লাভের বাসিন্দাদের ওপর | তার সাথে যোগ দিয়েছে কিছু মাতাল বেপরোয়া গুন্ডার দল| অ্যানার বাড়িতে জারকফ তিনরাত্রি হানা দিয়েছে | গুস্তাভর জার্মান শেপার্ড কুকুর, টাইগ্রেস থাকায় সে দোরগোড়া পেরোতে পারেনি | তাই চণ্ডাল রাগের বশে গুদামঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে | প্রতিবেশীদের চেষ্টায় যখন আগুন নিভেছে তখন অ্যানার স্বামী নিকোলাই একটা পোড়া কালো মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে | মা ও মেয়ে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারিয়েছে | প্রতিবেশীরা জারকফের প্রতি ঘৃণায় আর রাগে প্রতিজ্ঞা করেছে এই অপরাধের চরম শাস্তি দেবার | এরপর জারকফ আর অ্যানার বাড়িতে গিয়ে অত্যাচার করে না, কিন্তু ভেবে রেখেছে অ্যানাকে বড় কিছু সাজা দেবার কথা|

বছর ঘুরে গেছে| লুডমিলার এক ছোট্ট ভাই হয়েছে| নাম তার ডিমিট্রি| খিদের তাড়নায় আর ফেল্টজুতোর কারখানায় রোজ বারোঘন্টা খেটে অ্যানার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে| ছেলেকে খাওয়াবার জন্য নিজের দুধ হয় না, তাই যুদ্ধের বাজারে অপুষ্টিকর গুঁড়োদুধ কিনতে হয়| কখনো প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ঘোড়ার দুধ নিয়ে আসে | ছাগল, গরু, বাছুর সব পাঠানো হয়েছে সৈন্যদের পুষ্টির জন্য | খিদেয় আর শীতে দুই ভাইবোন রাতে কান্নাকাটি করে | কাজ থেকে ফেরার সময় অ্যানা রেললাইনের পাশ দিয়ে আসে যদি কিছু কয়লার টুকরো পায় আশা করে | গুদামঘর পুড়ে যাবার পর কিছু কাঠকয়লা পড়ে আছে কিন্তু স্বামীর সমাধিস্থান ভেবে অ্যানা তাতে হাত দেয় না | গুস্তাভর প্রিয় কুকুরটা খাদ্যাভাবে দিন দিন শীর্ণকায় হয়ে যাচ্ছে | অ্যানা একদিন তাকে দূরে নদীর ধারে ছেড়ে এসেছিল, যাতে সে নিজে শিকার করে প্রাণধারণ করতে পারে| লুডমিলা খুব কেঁদেছিল টাইগ্রেসকে হারিয়ে | তিনদিন পরে ভোররাতে বাড়ির দাওয়ায় বসে টাইগ্রেস জানিয়েছে তার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ | লুডমিলা আর ডিমিট্রি খুব খুশি | অ্যানাও গুস্তাভর সাথীকে ফিরে পেয়ে মনে-প্রাণে খুশি | অনেক আদর করেছে তারা টাইগ্রেসকে | লেজ নেড়ে, মুখ চেটে টাইগ্রেসও জানিয়েছে তার কৃতজ্ঞতা|

এবছর শীত একটু বেশিই প্রখর | দুটো বড় বড় বরফ-ঝড় হয়ে গেছে | যুদ্ধের ছেঁড়া ছেঁড়া খবর পাওয়া যায়; তবে রেডিওতে স্ট্যালিনের প্রপাগান্ডা কেউই বিশ্বাস করে না | যুবসংঘ লুকিয়ে বি বি সির খবর শোনে আর কখনও খবরের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য দেওয়ালে আটকে দেয় | এই গর্হিত অপরাধের জন্য জারকফ তিনজন যুবককে সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে | জার্মানরা যে হারছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই| স্ট্যালিনগ্র্যাডে ছ'শ হাজার সৈন্যসহ জেনারেল পৌলস পরাজয়পত্রে সাইন করেছে | মস্কোর যুদ্ধ থেকে পেছপা হবার অপরাধে হিটলার গুডেরিয়ানকে জার্মানিতে ফিরিয়ে এনে বাড়িবন্দী করেছে |

হাজার হাজার বন্দী জার্মান সৈন্যদের হাঁটিয়ে পাঠানো হচ্ছে সাইবেরিয়ার কুখ্যাত জেলখানায় | বন্দীদের গুলি করে গুলি খরচ করতে চায় না স্ট্যালিন | রাশিয়ায় শীত আর খাদ্যাভাবে বহু জার্মান সৈন্য মরে পড়ে আছে পথের ধারে |

শীতের ভোরে আধো অন্ধকারে অ্যানা টাইগ্রেসকে নিয়ে কাজে যাচ্ছে | জারকফের ভয়ে আজকাল অ্যানা সবসময়ই টাইগ্রেসকে সঙ্গে রাখে | একদল বিধ্বস্ত জার্মান বন্দীদল য়ুরোস্লাভে প্রবেশ করছে | দক্ষিণ থেকে উত্তরে হাঁটছে তারা; অনেকেরই পায়ে জুতো নেই | যন্ত্রচালিতের মতো একপা একপা করে এগোচ্ছে | অনেকে কাশছে | অ্যানার সামনেই কয়েকজন বন্দী লুটিয়ে পড়েছে বরফে | হঠাৎ টাইগ্রেস চঞ্চল হয়ে উঠল, কুঁই কুঁই শব্দ করে অ্যানার হাতেধরা চেনে টান দিয়ে এক মৃতপ্রায় বন্দীর দিকে প্রাণপণে যেতে চাইছে | কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে 'অ্যানা, টাইগ্রেস' বলে ডাকছে | অ্যানা ভাবছে এ বুঝি তার দুর্বল মনের ভুল | অ্যানা গুস্তাভকে দেখেছে কিন্তু চিনতে পারেনি | শতচ্ছিন্ন চটের আলোয়ানে ঢাকা অস্থিচর্মসার গুস্তাভ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে | একমুখ খোঁচা দাড়ি, এক পায়ে একটা ছেঁড়া মোজা, অন্যপা কাপড়ে জড়ানো | 'গুস্তাভ' বলে ছুটে গেছে অ্যানা | রাশিয়ার মিলিটারি পুলিশের এক ধাক্কা খেয়ে অ্যানা বরফে লুটিয়ে পড়েছে, তখনও দূর থেকে গুস্তাভর ক্ষীণস্বরে 'অ্যানা' ডাক শুনতে পাচ্ছে | শেষরাতের নক্ষত্র-মন্ডলী জ্বলজ্বল করছে, এই পুনর্মিলন কি তবে শেষ বিচ্ছেদে পরিণত হবে! সেদিন অ্যানা আর কাজে যেতে পারল না | বাড়ি ফিরে ডিমিট্রিকে বুকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ অঝোরে কাঁদল | ডিমিট্রি ঘুমিয়ে পড়েছে; অ্যানা তার মুখের দিকে চেয়ে ভাবছে ট্যাংক কম্যান্ডার গুস্তাভ আর বন্দী গুস্তাভর মধ্যে কী ভীষণ পার্থক্য! গুস্তাভকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাকে সুস্থ করে তুলতে হবে – এই তার এখন একমাত্র ব্রত |

নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আজ অ্যানা প্রসাধন করেছে | অশ্লীল বেশভূষা করে সে ছুটে গেছে জারকফের কাছে | দরজায় কড়া নাড়তে জারকফই দরজা খুলেছে | সে অবিবাহিত, ভ্রষ্টাচারী; বাড়িতে একলা থাকে | অ্যানাকে দেখে সে হতভম্ব! সে প্রথম প্রশ্ন করেছে, "টাইগ্রেস কোথায়?" অ্যানা তাকে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গেছে | ঘৃণায় গা রিরি করলেও জারকফকে জড়িয়ে চুমু খেয়েছে | তার হাত থেকে ধেনো ভদকার বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে অ্যানা ঢকঢক করে অনেকটা পান করেছে; জ্ঞানত অবস্থায় তার পক্ষে এই জঘন্য অভিনয় করা সম্ভব নয় | নিজেকে জারকফের হাতে ছেড়ে দিয়েছে অ্যানা | এই অবাস্তব পরিস্থিতিতে জারকফ এক্কেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! ভাবছে অ্যানা বুঝি তাকে খুন করতে এমন অভিনয় করছে | সে অ্যানার শরীরের আনাচে কানাচে পিস্তল বা ছুরির সন্ধান করতে চাইছে; কিছু না পেয়ে সে অ্যানাকে জিজ্ঞেস করেছে তার কী চাই – টাকাকড়ি, খাবার-দাবার, জ্বালানির কাঠ না অন্য কোনো ভাল রোজগারের চাকরি | অ্যানা এসব কিছুই চায় না, শুধু জানতে চায় জার্মান বন্দীদের কথা – তারা কোথায় থাকে, কতদিন য়ুরোস্লাভে থাকবে, তাদের ভবিষ্যৎ কী ইত্যাদি | মদের নেশায় আর অ্যানার ব্যবহারে সম্মোহিত হয়ে জারকফ তার মনের আগল খুলে দিয়েছে | অ্যানাকে জানিয়েছে সে নিজে বন্দীদের জীবন-মৃত্যুর মালিক | বন্দীরা খোলা মাঠে কাঠের বেড়ার মধ্যে থাকবে | পলাতকদের শাস্তি প্রাণদন্ড | বন্দীদের কাজ বাড়িঘর মেরামত করা, রঙ করা, রাস্তাঘাটের বরফ পরিষ্কার করা আর গাছ কেটে গ্রামবাসীদের ইন্ধন জোগানো | সন্ধ্যে ছ'টার পর বন্দীশালায় ফিরলে ঘন্টাপিছু তিরিশটা বেত্রাঘাত | রাশিয়ান মেয়েদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ধরা পড়লে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু আর অপরাধী মহিলার সাইবেরিয়ায় নির্বাসন | বন্দীরা এখানে তিনমাস থাকবে তারপর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বাড়িঘর মেরামত করতে করতে পৌঁছাবে সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা জেলখানায় | জেল বলতে উপরে খোলা আকাশ, কাঠের বেড়া আর রাশিয়ার শীত | ঠান্ডায় শতকরা নিরানব্বই ভাগ মারা যাবে; যে ক'জন বাঁচবে তাদের মৃত্যু নাকি আরো ভয়াবহ! এসব শুনে আর গুস্তাভর কথা ভেবে অ্যানার শরীর শিউরে ওঠে আর অবিরাম অশ্রুধারা বয়ে চলে | নিজের শরীর সে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল, আজ গুস্তাভর প্রাণভিক্ষার জন্য সেই শরীর কলুষিত করেছে | জারকফ অ্যানাকে কথা দিয়েছে যদি এই মধুর সম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে সে গুস্তাভর প্রতি কোনো অত্যাচার হতে দেবে না | সে জানে অ্যানা আর গুস্তাভর সম্পর্কের কথা, তারা যেন ধরা না পড়ে |

গুস্তাভ সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যেবেলা দু'ঘন্টা অ্যানার সঙ্গে কাটাতে পারে জারকফের কৃপায় | ছেলের সঙ্গে খেলা করে, পুরনো দিনের মতো লুডমিলার বেহালার সঙ্গে

পিয়ানো বাজায়। তিনসপ্তাহ কেটে যায় সুখে। এক বরফ ঝড়ের রাতে সে অ্যানার কাছে তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে এসেছে নিজে হাতে কাঠের তৈরি ফুলের গুচ্ছ বানিয়ে। এই দুর্যোগের রাতে এতদূর হেঁটে আসার জন্য অ্যানা তাকে বকাবকি করছে বটে কিন্তু মনে মনে খুবই খুশি। ঘোড়ার মাংসের স্টু, গমের রুটি আর জারকফের কাছ থেকে আনা এক বোতল ভদকা দিয়ে তারা চারজন অ্যানার জন্মদিন কাটাল। লুডমিলা আর গুস্তাভ বেহালা আর পিয়ানোতে 'হ্যাপি বার্থডে' বাজাল।

ছেলে-মেয়ে শুতে চলে গেছে। অ্যানা গুস্তাভকে তাড়া দিচ্ছে বন্দীশালায় ফিরে যাবার জন্য, কিন্তু বরফের ঝড় দেখে গুস্তাভকে বাড়ি থেকে বেরোতে দিতে মন চাইছে না। গুস্তাভও চাইছে রাতটা অ্যানার সঙ্গেই কাটাতে। বসে কথাবার্তার পর কখন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অ্যানার ঘুম ভেঙেছে টাইগ্রেসের আওয়াজে; ঘুমন্ত গুস্তাভকে ঠেলে তোলার চেষ্টা করছে অ্যানা। ভদকার প্রভাবে আর নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে সে কালঘুমে ডুবে রয়েছে। বাইরে ভারী বুটের শব্দ। দরজায় তারা লাথি মারছে; টাইগ্রেস আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে। দরজা ভেঙে চারজন মিলিটারি পুলিশ আর জারকফ ঘরে ঢুকে পড়েছে। টাইগ্রেস ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন পুলিশের হাত কামড়ে ধরেছে। জারকফের টাইগ্রেসের প্রতি বহুদিনের সঞ্চিত বিতৃষ্ণা। পিস্তলের গুলিতে সে টাইগ্রেসকে ধরাশায়ী করেছে। হট্টগোলের মাঝে কখন লুডমিলা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তা কেউ লক্ষ্য করেনি। সে টাইগ্রেসের রক্তাক্ত মৃতদেহের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। ততক্ষণে গুস্তাভর ঘুম ভেঙেছে, সে উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে গেলে একজন পুলিশ রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে গুস্তাভর মাথায় আঘাত করেছে। তার মাথা বেয়ে রক্ত ঝরছে আর অজ্ঞান হয়ে গেছে। দুজন পুলিশ তাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গিয়ে বরফের উপর শুইয়ে দিয়েছে। অ্যানা জারকফের দুহাত ধরে গুস্তাভর প্রাণভিক্ষা করছে। জারকফ চারজন পুলিশের সাথে কথাবার্তা বলে অ্যানাকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জানিয়েছে যে মিলিটারি পুলিশরা গুস্তাভকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এটা সোভিয়েট নিয়ম, জারকফের আধিপত্যের বাইরে। বাইরের দেওয়ালে গুস্তাভকে আধশোয়া করে বসানো হয়েছে। অ্যানা ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে একটা কম্বল এনে তার গায়ে ঢাকা দিয়েছে। গুস্তাভ ক্ষীণকণ্ঠে অ্যানাকে বলেছে, "অ্যানা, তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য আমি দায়ী। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। ভীষণ ভালবাসি তোমাকে। বিতরজেহেন!" একজন পুলিশ অ্যানাকে টেনে সরিয়ে দিয়েছে। গুস্তাভর গা থেকে কম্বলটা রাইফেলের বেয়োনেট দিয়ে সরিয়ে দুজন পুলিশ একসঙ্গে তার মাথায় আর বুকে গুলি করেছে। গুস্তাভর দেহটা দুবার কেঁপে একদিকে হেলে পড়েছে। অ্যানা চিৎকার করে, অজ্ঞান হয়ে বরফের উপর লুটিয়ে পড়েছে। তিনদিন পর লুডমিলা আর ডিমিট্রিকে অ্যানার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে অ্যানাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে সুদূর সাইবেরিয়ায়।

জারকফ স্টেশনে এসেছিল। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলো তার মতো পাষাণ হৃদয়েও দাগ কেটেছে অ্যানার উপর অবিচার আর অত্যাচারের কথা ভেবে সে খুবই অনুতপ্ত। নারীদেহের লালসায় সে এতদিন অন্ধকারের ঠুলি পরে ছিল। অ্যানার অপার ভালবাসা তার মনের কলুষতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। অ্যানাকে জারকফ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সে লুডমিলা আর ডিমিট্রির দেখাশোনা করবে। কোনো এক ভাল অনাথ আশ্রমে নিজে গিয়ে তাদের ভর্তি করে আসবে। আর্দ্রচোখে অ্যানা জারকফকে ধন্যবাদ জানিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। জারকফেরও চোখে জল। ট্রেন চলেছে উড়াল পর্বতমালার অপরপ্রান্তে সাইবেরিয়ার কুখ্যাত জেলখানা 'গুলাগ'-এর অভিমুখে।

মস্কো

গুলাগে অ্যানার দীর্ঘ পনেরো বছর কেটে গেছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে রাশিয়ার। বিস্মৃত কয়েদীদের জন্য জেলখানার দুয়ার খোলা। বেশিরভাগ কয়েদীর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, চলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। বহু কয়েদী নিজেদের চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে এই সুখবরটুকুও উপলব্ধি করবার মতো মানসিক অবস্থা নেই। মাথা নিচু করে তারা জেলের খোলা দরজা অন্ধকূপে বসেই আছে। তবে অ্যানা তাদের মধ্যে পড়ে না। তাকে য়ুরোস্লাভে যেতে হবে ছেলে-মেয়ের খোঁজে। ট্রেনে পাঁচদিনের পথ। জেলখানা থেকে বিদায়ের সময় কর্তৃপক্ষ পাঁচ রুবল হাতে দিয়েছে। ট্রেনে মেথরাণীর কাজ নিয়ে চলেছে সে য়ুরোস্লাভের দিকে। শীর্ণ দেহ জটপাকানো চুল, শতচ্ছিন্ন পোশাক আর একফালি চট তার গায়ের চাদর। ধূসর আকাশের দিকে চেয়ে অ্যানা তার অভিশপ্ত

জীবনের কথা ভাবছে | ভাবছে তার আর পুরুষ-কামের ভয় নেই; এখন সে তাদের ঘৃণার বস্তু | এককালে নিজের দেহ বিক্রি করে সে গুস্তাভকে বাঁচাতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি | সবই বিধাতার লিখন!

বসন্তের এক ঝকঝকে বিকেলে য়ুরোস্লাভে ট্রেন থেমেছে | একমাত্র সম্বল পুঁটলিটা নিয়ে অ্যানা ছুটেছে পার্টি অফিসের দিকে লুডমিলা আর ডিমিট্রির খোঁজে | দুর্বল অ্যানা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে অফিসের দোরগোড়ায় | হঠাৎ দুম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে | পার্টি অফিসার বাড়িমুখো; অ্যানা মিনতি জানিয়েছে সন্তানদের হদিসের জন্য | পরের দিন আসতে বলে নির্মম অফিসার গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেছে | অ্যানা তার পুরনো এলাকায় গেছে, সে বাড়ি ভেঙে সেখানে নতুন উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে | প্রতিবেশীরাও সবাই নতুন | রাত্তিরটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে পার্টি অফিসে আবার গেছে সে | দুপুরে তার ডাক পড়েছে; খারাপ খবর, অনেক খোঁজার পরেও অনাথদের তালিকায় লুডমিলা আর ডিমিট্রি নামের কোনও হদিস পাওয়া গেল না | অ্যানার খেয়াল হ'ল একমাত্র জারকফ জানে তার সন্তানদের খবর | জারকফের কথা জিজ্ঞেস করতে পার্টি অফিসার হেসে উঠেছে; তাচ্ছিল্য করে বলেছে, "জারকফ সিংহাসনে বসে আছেন পুরনো চার্চের বাইরে |" অ্যানা হেঁয়ালি বোঝেনি | পুরনো চার্চের বাইরে দেখে একজন হাত-পা-কাটা শীর্ণ বৃদ্ধ বসে আছে চাকা লাগানো একটা কাঠের পাটাতনের উপর | অ্যানা প্রথমে চিনতে পারেনি জারকফকে | বন্দী সৈন্যদের জীবন-মৃত্যুর মালিক জারকফের এ কী দুরাবস্থা! অ্যানার চোখ জলে ভরে উঠল | জানতে পারল যে যুবকদল প্রতিশোধ নেবার জন্য তার হাত-পা বেঁধে রেল-লাইনে রেখে এসেছিল | ভোরের ট্রেনে তার হাত-পা কাটা যায় রক্তক্ষরণে মরেই যেত, যদি না এক কয়লাকুড়ানি তাকে ঠেলাগাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যেত | জারকফ কাঁদতে কাঁদতে বলেছে যে তার এই অবস্থায় বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল ছিল | ভিক্ষে করে জীবন যাপন করে | ভিক্ষে না পেলে কুকুর বেড়ালের মতো আঁস্তাকুড়ের পচা, আধপচা খাবার খেয়ে দিন কাটায় | অ্যানার পুঁটলিতে যা সামান্য খাবার ছিল সেগুলো সে জারকফকে দিয়েছে | ক্ষুধার্ত জারকফ সেসব পাগলের মতো গলাধঃকরণ করেছে | চার্চের কল থেকে জল এনে দিয়েছে অ্যানা | জারকফের চোখের কোনে জল চিকচিক করছে | কাটা দুটো হাত বাড়িয়ে সে অ্যানার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছে | জারকফ জানিয়েছে যে সে নিজে লুডমিলা আর ডিমিট্রিকে মস্কোর সেরা অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে এসেছিল, যাতে তার প্রায়শ্চিত্ত হয় | অনাথ আশ্রমের নাম-ঠিকানা সে অ্যানাকে দিয়েছে ও জানিয়েছে যে অনাথ আশ্রমের সুরক্ষার জন্য তাদের নতুন নামকরণ হয়; সেসব নাম জারকফের জানা নেই |

পরদিনই অ্যানা মস্কো অভিমুখে যাত্রা করেছে | সেখানে হাজির হবার পর বহু চেষ্টা করেও কর্তৃপক্ষ লুডমিলা আর ডিমিট্রির কোনো সন্ধান দিতে পারেনি | সতেরো বছর বয়সের পর অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েরা চাকরি নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে | নিরুপায় অ্যানা ভগ্নহৃদয়ে মস্কোর ফুটপাথে বসে আছে | রাস্তার উল্টোদিকে রাশিয়ার বিখ্যাত 'ক্যাথরিন কনসার্ট হল' | এখানে সারা বিশ্বের নামকরা সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন | অ্যানা ছোটবেলায় তার সঙ্গীতপ্রেমী দাদুর কাছে এই সঙ্গীত মহাতীর্থের গল্প শুনেছে | রাস্তা পেরিয়ে কারুকার্য খচিত পেতলের গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যানা | চাপকানপরা বুড়ো দারোয়ান অ্যানার কুশল জানতে চাওয়ায় অ্যানা তার জীবন বৃত্তান্ত জানিয়েছে তাকে | অনুরোধ করেছে যদি তাকে কোনো একটা চাকরি দিতে পারে | দারোয়ান অ্যানাকে গেটের ভেতরের বেঞ্চে বসতে বলে ভেতর থেকে চা-জলখাবার এনে দিয়েছে | পিতৃত্বের মহানুভবতায় অ্যানা তার হাত ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছে | সে অ্যানার মাথায় হাত রেখে বলেছে, "আমার তোমার মতোই এক মেয়ে ছিল; যুদ্ধের সময় সে না খেতে পেয়ে মারা যায় | সেজন্য আমি তার বয়সী কোন মেয়েকে অভুক্ত দেখতে পারি না | খেয়ে নিয়ে চলো সঙ্গীত পরিষদের দপ্তরে; কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে |"

অ্যানা কনসার্ট হল পরিষ্কার করার একটা চাকরি পেয়েছে | গুদামঘরের একপাশে থাকার একটু জায়গা এবং সঙ্গে ৩০ রুবল মাইনেও দিয়েছে | অ্যানার সবথেকে ভাল পারিতোষিক হ'ল গুদামঘর থেকে কনসার্ট দেখা আর বিভোর হয়ে সঙ্গীত উপভোগ করা | সেদিন সন্ধ্যায় তিল ধারণের জায়গা নেই হলে | পার্টির বড় বড় নেতারা এসেছেন ইভানোভনা আর

তুশিন – দুই বোন-ভাইয়ের কনসার্ট শুনতে | বোন বেহালায় আর ভাই পিয়ানোতে| মাত্র আঠারো বছর বয়সে তুশিন রাশিয়ার বিখ্যাত পিয়ানো-বাদক | অত্যন্ত কম বয়সে সে 'অর্ডার অফ লেনিন' মেডেল পেয়েছে | সোভিয়েট সঙ্গীত পরিষদের সে একজন সম্মানিত সদস্য | অ্যানা গুদামঘর থেকে তাকিয়ে দেখছে সেই দুই বাদকের দিকে | আজ তার কানে কোনো সঙ্গীতই ঢুকছে না| যদিও বয়স আর নানান অত্যাচারে তার দৃষ্টি ক্ষীণ তবু এই দুই মুখ সে কেমন করে ভুলবে! শেষ অধ্যায়ে চাইকফস্কির সিক্সথ সিম্ফোনি বাজাচ্ছে দুই ভাই-বোন| তুশিনের বাজনায় অ্যানা যেন গুস্তাভর সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে| পায়ে পায়ে যন্ত্রচালিতের মতো স্টেজের দিকে এগিয়ে গেছে অ্যানা | দর্শকরা বিরক্ত হয়ে দেখছে এই অনাহুত কৃশকায় মহিলাকে | পিস্তল উঁচিয়ে নেতাদের রক্ষকদল এসে ঘিরে ফেলেছে তাকে| ছুটে এসেছে সেই বুড়ো দারোয়ান| সকলকে সরিয়ে সে অ্যানাকে জিজ্ঞেস করেছে তার এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের কী কারণ | অ্যানা বলেছে ইভানোভনা আর তুশিন এদের আসল নাম নয়, এরা আমার সন্তান লুডমিলা আর ডিমিট্রি| অনুষ্ঠান শেষে দর্শকরা বিদায় নিয়েছে| বুড়ো দারোয়ান অ্যানাকে স্টেজের পিছনের দরজা দিয়ে তার ছেলে-মেয়ের কাছে নিয়ে গেছে| অ্যানা 'লুডমিলা, ডিমিট্রি' বলে চিৎকার করে ইভানোভনাকে জড়িয়ে ধরতে গেছে | তুশিন এক ঝটকায় ইভানোভনাকে সরিয়ে অ্যানাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে| অ্যানা ছিটকে পড়েছে স্টেজের তলায়; চেয়ারে লেগে মাথা কেটে রক্ত পড়ছে| দারোয়ান তাকে গুদামঘরে ফিরিয়ে এনে মাথায় পটি বেঁধে দিয়েছে| উত্তেজনায় অ্যানা কাঁপছে| ভাই-বোনের মধ্যে কথা হচ্ছে| ইভানোভনা ভাইকে তিরস্কার করছে বৃদ্ধ মহিলার সঙ্গে এমন ব্যবহার করার জন্য | কনসার্টের শেষ অধ্যায় ভেস্তে দেবার জন্য তুশিন অ্যানাকে অনেক কটুবাক্য বলেছে | তুশিন ইভানোভনাকে বোঝাচ্ছে যে তারা অনাথ আশ্রমে পালিত হয়ে বিখ্যাত হওয়ার পর বহু কূটচরিত্র বুড়িরা তাদের মা বলে জাহির করতে চায়| ইভানোভনা বিশ্বাস করতে পারেনি ভাইয়ের যুক্তি| তার মনে দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে!

এক পূর্ণিমা রাতে চাঁদ ও মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছে | হেমন্তের বাতাসে গাছের পাতার মর্মরধ্বনি, কিছু শুকনো রঙিন পাতা ভেসে বেড়াচ্ছে| তুশিনের ঘোড়ার শখ; সোনার কাজকরা আবলুস কাঠের ছাদখোলা ফিটন গাড়িতে দুটো কালো কুচকুচে অ্যারেবিয়ান ঘোড়া জোড়া | তুশিন নিজেই তার ফিটনগাড়ি চালায়| তার বাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে দেখে সেই বুড়ি তাদের নাম ধরে ডাকছে আর গাড়ির সাথে ছুটছে| সে এবার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বুড়িকে বেত্রাঘাত করতে আরম্ভ করেছে| ইভানোভনা ভাইকে থামাবার আগেই অ্যানা ছিটকে পড়েছে রাস্তায় | ব্রেক কষা সত্ত্বেও তুশিনের গাড়ির চাকা অ্যানার বুকের একপাশ দিয়ে চলে গেছে | বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে রাস্তায়; এই দুই ভাই-বোনকে সকলেই চেনে | অ্যানার শ্বাস উঠেছে | একজন তুশিনকে উপদেশ দিয়েছে পুলিশ পৌঁছাবার আগে সেখান থেকে সরে পড়তে| তুশিন ফিটনের দিকে এগোতেই ইভানোভনা ভাইয়ের হাত চেপে ধরে বলেছে, "অর্ডার অফ লেনিন মেডেল গলায় ঝুলিয়ে হয়তো এই চরম অপরাধের শাস্তি সোভিয়েট আদালতে পাবে না, তবে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে গাড়ি চাপা দিয়ে কুকুর, বেড়ালের মতো রাস্তায় মরতে দিলে ভগবানের আদালতে কখনই রেহাই পাবে না| সারাজীবন এই পাপের গুরুভার বইতে হবে | এই মুহূর্তে বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো|"

দিদির এই অচেনা ব্যবহারে তুশিন চমকপ্রদ | দিদির ভর্ৎসনায় তুশিন মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছে| ভাইবোন সাবধানে ধরাধরি করে মৃতপ্রায় অ্যানাকে ফিটনে তুলেছে| হাসপাতালের বড় ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন যে পাঁজর ভেঙেছে আর একটুকরো ভাঙা হাড় হার্টে ঢুকে গেছে; মেয়াদ খুবই অল্প | কেন জানি তুশিন আর ইভানোভনার চোখে জল | অ্যানা চোখ মেলে দেখছে লুডমিলা আর ডিমিট্রি তার দিকে চেয়ে আছে| অ্যানার ওষ্ঠে স্বর্গীয় হাসি | তারপর সব শেষ! অ্যানার হাতের মুঠো থেকে কিছু কাগজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে| একটা ছবি এসে পড়েছে তুশিনের পায়ের কাছে | ছবিতে রয়েছে দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে আর একটা কুকুর | দুই ভাইবোন ছবি দেখে একসঙ্গে বলে উঠেছে 'টাইগ্রেস'! দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে| অ্যানার মৃতদেহের উপর দুই ছেলেমেয়ে মাথা রেখে 'মা, মা' বলে অঝোরে কাঁদছে|

ধাতু ও মানব সভ্যতা

উদয় চট্টোপাধ্যায়

প্রায় তিন হাজার বছর আগের ঘটনা | রাজা সলোমন জেরুসালেমে এক অপূর্ব মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন, আর এর দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে আয়োজন করেছিলেন এক ভোজ-সভার | মন্দির তৈরির কাজে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন সেইসব শ্রমিক আর শিল্পীরা আমন্ত্রিত ছিলেন সেই ভোজসভায় | রাজা সলোমন সেখানে ঘোষণা করলেন, এই মন্দির তৈরীর কাজে যে শ্রমিক বা শিল্পীর অবদান সবচেয়ে বেশি তাকে তিনি একদিনের জন্যে তাঁর সিংহাসন ছেড়ে দেবেন | সবাইকে বিস্মিত করে জনতার মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি এসে সিংহাসনে বসে পড়ল | রাজা সলোমন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী অধিকারে তুমি সিংহাসনে বসলে?" এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না দিয়ে সে সমবেত রাজমিস্ত্রীদের প্রশ্ন করল, "তোমাদের কাজের যন্ত্রপাতি কার তৈরি?" তারা বলল, "কামারের |" তারপর ছুতোরদের সে প্রশ্ন করল, "আর তোমাদের যন্ত্রপাতি?" তারাও জানাল যে সেগুলো কামারের তৈরি | অন্যান্য শিল্পী-শ্রমিকদেরও প্রশ্ন করে এই একই উত্তর পাওয়া গেল | তখন সেই ব্যক্তি রাজা সলোমনের দিকে ফিরে বলল, "আমি একজন কামার | বলুন আমি সিংহাসনে বসে ভুল করেছি কি?" রাজা সলোমন তখন তাঁর রাজমুকুট খুলে নিয়ে সেই ব্যক্তির মাথায় পরিয়ে দিলেন | এই একটি গল্প থেকেই বোঝা যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধাতুর ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ |

মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাসের পর্যায় বিভাগ করা হয়েছে সেইসব বস্তুর নামে, যা সেই যুগের যন্ত্রপাতি ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরির কাজে বহুল ব্যবহৃত | এভাবেই নামকরণ হয়েছে প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নব্য প্রস্তরযুগ, ব্রোঞ্জযুগ, লৌহযুগের | দেখা যাচ্ছে, পাথরের পরেই এসেছে ধাতুর ব্যবহার | ব্রোঞ্জযুগ শুরু হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে | ব্রোঞ্জ হ'ল তামা আর টিনের সংমিশ্রণে তৈরি ধাতুসংকর | টিন থাকে সাধারণত ১ থেকে ১০ শতাংশ | টিনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে ধাতু সংকরের কাঠিন্যও বৃদ্ধি পায় – এই তথ্য সেই আদিযুগের ধাতুশিল্পীরাও জানতেন | আর সেইমতো বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে বিভিন্ন সংযুক্তির ব্রোঞ্জও যে তৈরি করা হতো তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে | ব্রোঞ্জযুগের পর এসেছে লৌহযুগ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে যতদূর জানা যায় তার থেকে মনে হয় আনুমানিক ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরে হিট্টাইট (Hittite) জাতির লোকেরা সর্বপ্রথম লোহা নিষ্কাশন করতে সমর্থ হয়েছিল | তারপর এক হাজার বছরের মধ্যে আর্মেনিয়া, চীন, ভারত আর দক্ষিণ ইউরোপের কোনো কোনো অঞ্চলে লৌহযুগের সূত্রপাত হয় | মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের এই পর্যায়গুলোর মধ্যেকার সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয় | ব্রোঞ্জযুগের মধ্যেই শুরু হয়েছে লোহা নিষ্কাশন আর তার ব্যবহার এবং ক্রমে ক্রমে তা ব্রোঞ্জকে স্থানচ্যুত করেছে অধিকাংশ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে |

মানুষ লোহা নিষ্কাশন করতে শেখার আগে তার কাছে প্রথম লোহা পৌঁছে দিয়েছিল মহাকাশের উল্কা | উল্কার লোহায় থাকে ৭ থেকে ১০ শতাংশ নিকেল | এই ধরনের লোহা তৈরির হার মিশরে ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক সমাধি থেকে উদ্ধার করা গেছে | ইরাকের 'ওর' অঞ্চলে পাওয়া গেছে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি ছোরা | ১৮৯৪ সালে উত্তরমেরু বিজয়ী উইলিয়াম রবার্ট পেরী যখন গ্রীনল্যান্ডে যান তখন এস্কিমোরা তাঁকে এক বিরাট উল্কাপিণ্ডের কাছে নিয়ে যায় | কয়েকশো বছর ধরে এটা তাদের অস্ত্রশস্ত্র তৈরির উপাদান জোগানোর পরেও তার ওজন ছিল প্রায় ৩৭ টন | এ ধরনের লোহা ছাড়াও প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সোনা, আর কখনো কখনো রূপো আর তামা | তাই বলা যেতে পারে এইসব ধাতুর ব্যবহারও শুরু হয়েছে মানবসভ্যতার গোড়ার দিকে | তবে প্রকৃতির এরকম প্রত্যক্ষ দানের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হতো না | সৌভাগ্যক্রমে মানুষ চিনতে শিখেছে বিভিন্ন ধাতুর আকরিক, আর আবিষ্কার করেছে সেগুলোর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের নানান পদ্ধতি |

মানব সভ্যতার ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের এক বিশেষ স্থান আছে | এই সাম্রাজ্য সর্বাধিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল খ্রিস্ট জন্মের আগের ও পরের দু'তিন শতাব্দী জুড়ে | তাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রোমানরা ৮টি ধাতুর ব্যবহার জানত; সেগুলি হ'ল সোনা, রূপো, তামা, টিন, লোহা, পারদ, সীসা ও অ্যান্টিমনি | তারপর মধ্যযুগে যোগ হয় আরো তিনটি ধাতু – দস্তা, বিসমাথ আর আর্সেনিক | অ্যান্টিমনি, বিসমাথ ও

আর্সেনিককে অবশ্য এখন আমরা আর ধাতু বলি না, বলা হয় মেটালয়েড বা সেমিমেটাল, অর্থাৎ অর্ধধাতু; কেননা ধাতুর অনেকগুলো গুণই এগুলোতে নেই।

সুতরাং প্রশ্ন উঠছে কাকে আমরা ধাতু বলব। রাশিয়ান দার্শনিক ও বিজ্ঞানী, লোমানসভ (যাঁর নামে নামকরণ হয়েছে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের) ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ধাতুবিদ্যা বিষয়ে লেখা বইতে ধাতুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, "ধাতু হচ্ছে এক উজ্জ্বল, কঠিন পদার্থ, যাকে পিটিয়ে আকৃতি দেওয়া যায়। তাই সেই যুগে তাঁর দেওয়া সংজ্ঞা মিলিয়ে চিহ্নিত হয়েছিল মাত্র ছ'টি ধাতু – সোনা রূপো, তামা, টিন, লোহা আর সীসা। ভঙ্গুর হওয়ায় অ্যান্টিমনি এবং তরল অবস্থায় থাকার দরুন পারদ ধাতুর তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের জানা ছিল কমবেশি ২০টি ধাতু। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ান বিজ্ঞানী, মেন্ডেলিয়েভ মৌলসমূহের 'পিরিয়ডিক টেবল' (periodic table) বা পর্যায়-সরণি আবিষ্কার করলেন; তাতে ধাতুর সংখ্যা ছিল ৫০টি। এখন সেই সরণিভুক্ত ১০৩টি মৌলের মধ্যে ৮০টি ধাতু বলে গণ্য হয়। ধাতুর সংজ্ঞা এখন ঠিক করা হয়েছে তার অভ্যন্তরীণ গঠনের ভিত্তিতে। সব পদার্থের মতো ধাতুও তৈরি পরমাণুর সমষ্টিতে, আর ধাতুর ক্ষত্রে পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ রয়েছে প্রত্যেক পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসা ইলেক্ট্রনে তৈরি এক ইলেক্ট্রন মেঘের মাধ্যমে। তারই ফলে ধাতুরা অনিবার্যভাবে বিদ্যুৎ পরিবাহী।

প্রাচীন ভারতে ধাতুর ব্যবহার কেমন ছিল তা জানতে আমাদের আগ্রহ হতেই পারে। মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার সভ্যতায় (৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) লোহার নিদর্শন না মিললেও ব্রোঞ্জের মূর্তি আর ব্যবহারিক সামগ্রী পাওয়া গেছে বেশ কিছু। এছাড়া সোনা, রূপো, তামা, টিন আর সীসার নিদর্শনও আছে। প্রাচীন রচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে বৈদিক যুগ (১১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আর তার পরবর্তী যুগে আটটি ধাতুর ব্যবহার অবশ্যই জানা ছিল – সোনা, রূপো, তামা, লোহা (যার আর এক নাম অয়স্), পারদ, দস্তা (সংস্কৃতে যশদ), সীসা আর টিন (সংস্কৃতে কান্তি)। মনে রাখতে হবে এটা রোমান সভ্যতার অনেকটা পূর্ববর্তী সময়ের কথা।

ধাতু আবিষ্কারের প্রায় সাথে সাথেই বিভিন্ন ধাতু মিশিয়ে ধাতুসংকর তৈরির সূত্রপাত হয়। অবিমিশ্র ধাতুর তুলনায় ধাতুসংকর বেশি কঠিন ও শক্তিশালী বলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ ত্বরান্বিত হয়। ব্রোঞ্জই সম্ভবত মানুষের তৈরি প্রথম ধাতুসংকর। আদিম ধাতুকর্মীরা বুঝেছিলেন তামায় বেশি পরিমাণে টিন মেশালে তার শক্তিবৃদ্ধি হয়; আর টিন কম পরিমাণে থাকলে ব্রোঞ্জ বেশি নমনীয় হয় – তাই প্রয়োগনির্ভর বিভিন্ন ব্রোঞ্জের উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছিল। রোমানরা যখন ব্রিটেন দখল করে, তখন তারা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি আর চাষবাসের কাজে ব্যবহার করত লোহা আর ব্রোঞ্জ; পাত্র নির্মাণের জন্য তামা, আর স্নানঘরে সীসা, অলঙ্কার তৈরির কাজে সোনা, রূপা, তামা আর টিন। মুদ্রা তৈরির জন্য রূপা, পিতল আর ব্রোঞ্জ।

সোনা আর রূপোয় মরচে ধরে না এবং দীর্ঘ সময় সংরক্ষণে ও ব্যবহারে এদের ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকে। তাছাড়া এদের বারে বারে গলানো আর রূপ দেওয়া সাহজসাধ্য। এইসব কারণে কালক্রমে এই দুই ধাতুর অর্থনৈতিক মূল্য ব্যবহারিক মূল্যকে ছাড়িয়ে গেল; আর এরা ধাতুসমাজে 'সম্ভ্রান্ত' হয়ে উঠল। লোহা, তামা, টিন, সীসার মতো কমদামী ধাতুকে মূল্যবান সোনায় রূপান্তরিত করার জন্য পরশ পাথরের সন্ধান আর রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশগুলোয় আর ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ণ উদ্যমে বলবৎ ছিল, যদিও তা কখনই সফল হয়ে উঠতে পারেনি।

আধুনিক সভ্যতায় ধাতুর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জিনিসপত্র থেকে শুরু করে মহাকাশযান পরমাণুশক্তি উৎপাদন সর্বত্রই তা উপযোগী। বার্তা বিনিময়, তথ্য প্রযুক্তি এবং যুগের সভ্যতার অগ্রগতির দুটি স্তর; এদের মূলে রয়েছে এক অর্ধধাতু, 'সিলিকন'। এই অর্ধেককে সরিয়ে নিলে সভ্যতা কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে!

Well-preserved 3,000-year-old sword found in Germany

ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে

মৃণাল চৌধুরী

ম্যাক্স ম্যুলার একবার বলেছিলেন, "যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন আকাশের নিচে মানব মন তার সেরা প্রতিভাকে সবচেয়ে বেশি বিকশিত করেছে, জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলি সম্পর্কে সবচেয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছে এবং সমাধান খুঁজে পেয়েছে, তাহলে আমার ভারতের দিকে ইঙ্গিত করা উচিত।"

ভারতের সংস্কৃতি বলতে উপস্থিত সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য এবং অন্য সংস্কৃতিকে বোঝায়। ভারতের ভাষা, ধর্ম, নৃত্য-গীত, স্থাপত্য, খাদ্য এবং রীতিনীতি দেশের মধ্যে স্থানভেদে ভিন্ন। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রায়শই বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হিসেবে চিহ্নিত, যা ভারতীয় দর্শন ও রন্ধন প্রণালীর মতো বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির অনেক উপাদান বিশ্বজুড়ে গভীর প্রভাব ফেলে থাকে।

ভারতীয় বংশদ্ভূত ধর্মগুলি শতাব্দীব্যাপী নির্যাতন করে আসছে। মুসলিম শাসকরা মন্দির ও মঠ আক্রমণ করার সময় হিন্দু ও বৌদ্ধদের হত্যা করেছিলে, একই সাথে যুদ্ধক্ষেত্রেও তাদের ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করেছিল। মুসলিম শাসনকালে উত্তর ভারতের বিশিষ্ট মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের জনসংখ্যা ২০ কোটি থেকে কমে ১২ কোটি ৫০ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলামের মতো আব্রাহামিক ধর্মসহ বিদেশী ধর্মও ভারতে বিদ্যমান। পাশাপাশি ইসলামের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়া বাহাই ধর্মও শতাব্দী ধরে আশ্রয় পেয়েছে। এইসব বহু যুগ আগের ইতিহাস; অতি অবশ্যই হিন্দু-মুসলমান এবং আর সব নানা ধর্মের মানুষ মিলেমিশে ভারতের মানচিত্র গৌরবান্বিত করছে।

ভারতে ২৯টি রাজ্য, যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিরাজ করে এবং বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলির মধ্যে ভারত প্রথম। ভারতীয় উপমহাদেশ কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস বহন করে চলেছে। এই ইতিহাস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত।

বৃহত্তর ভারত ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিস্তৃতি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমদিকে ভ্রমণকারী এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা সিল্ক রোডের মাধ্যমে এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে নানাভাবে যোগসাধন হয়। পশ্চিমে বৃহত্তর ভারত 'হিন্দুকুশ' এবং 'পামির' পর্বতমালায় বৃহত্তর পারস্যের সাথে মিলিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম, জৈন, শিখ এবং বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য সংমিশ্রণ ঘটেছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং আরও কিছু ধর্মের জন্মস্থান ভারত। ভারতীয় ধর্মগুলি আব্রাহামিক ধর্মের পাশাপাশি বিশ্ব ধর্মের একটি প্রধান রূপ। আজ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম যথাক্রমে বিশ্বের তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতে ২ বিলিয়নের বেশি মানুষ এই দুটি ধর্মাবলম্বী। এখানে ৮০-৮২ শতাংশ মানুষ হিন্দু, শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে।

বিশ্বে ভারত জাতিগতভাবে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ, যেখানে কিছু নিষ্ঠাবান ধর্মীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বিরাজ করে। যদিও ভারত ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তবু এখানে মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ আছে। প্রসঙ্গত জম্মু, কাশ্মীর, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও লাক্ষাদ্বীপ বাদে বাকি ২৯টি রাজ্য এবং ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হিন্দু-প্রধান জনসংখ্যা। ভারতের সর্বত্রই মুসলিম জনসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। শিখ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা সে তুলনায় সংখ্যালঘু।

ভারতে এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের রূপ বিশ্বের কাছে এক মহান নিদর্শন। ধর্ম ছাড়াও ভারতে আরো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, যা এই দেশকে আধুনিক যুগের ভাবধারার সাথে পা মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। ভারতে বহু বছরের পুরনো সংস্কৃতি এবং বর্তমান টেকনোলজি এই দেশকে গৌরবান্বিত করছে। আর ভারতীয় মশলাদার খাবার কে না পছন্দ করে!

এইখানে আমার মনে আসছে –

"ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।"

অতুল প্রাসাদ সেন

ভারতের নারীবাদী আন্দোলন

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

"রমণী জীবন নয় এত তুচ্ছ বোন
যত তুচ্ছ কর অনুমান।
আমাদেরও আছে কাজ কর্তব্য সাধন
আমাদেরও দেহে আছে প্রাণ।"

গিরিবালা সেনগুপ্ত (রচনা, ১৯০৪)

'সব লাল হো জায়গা' কথাটি সিন্ধুনদীর জলধারার শব্দকে অতিক্রম করে ভারতের মূল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। কথাটি বিস্তারে যতটা সময় লেগেছে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে কথাটির বাস্তবায়ন ঘটেছে। সারা ভারতবর্ষ দেখল সবকিছু লাল হয়ে গেছে। রঞ্জিত সিং যেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার ন্যায় উক্তিটি করেছিলেন। এই লাল রঙের মধ্যে নিহিত ছিল ব্রিটিশ শাসনের সর্বগ্রাসী শাসন পদ্ধতি, ভারতীয়দের রক্ত এবং ভারতীয় নারীদের ওপর অত্যাচার। ব্রিটিশ শাসন সভ্যদের শাসন বলে প্রচার চালালেও ব্রিটিশ সরকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতীয় নারীদের তৎকালীন ভারতীয় সমাজের নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি; বরং ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত হয়ে প্রশাসনের কর্তাগণ অর্থাৎ ব্রিটিশ ও ভারতীয় বহু আধিকারিক নারীদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে ও ভোগ্য পণ্যরূপে গণ্য করেছে। এই সবকিছু থেকে নারীদের মুক্তির জন্য ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। যদিও এই আন্দোলনের সাথে পশ্চিমে সংঘটিত নারীবাদী আন্দোলনের পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ ভারতবর্ষের বিশাল ভূখন্ডে বৈচিত্র্য বর্তমান। ফলত, নারীবাদী আন্দোলনেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়; যদিও ঊনবিংশ শতকে সংঘটিত আন্দোলন নারীবাদী আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল না। এটি মূলত সংস্কার আন্দোলন রূপেই গণ্য হয়। পরবর্তীকালে গবেষকগণ এই সংস্কার আন্দোলনে আধুনিক নারীবাদের চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন। বস্তুত, গবেষকগণ সংস্কার আন্দোলনকে ভারতীয় নারীবাদী আন্দোলনের একটি অংশ রূপে বিবেচিত করেন।

পাঠকগণ, মনে কি প্রশ্ন জাগছে যে, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু 'নারীবাদ' কাকে বলে তা বুঝতে পারলাম না। এই তো, আমার মনেও একই প্রশ্ন জাগছে। আসুন, আমরা এবার নারীবাদ কী, তা বোঝার চেষ্টা করি। নারীবাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হ'ল, 'Feminism'। Feminism শব্দটির ব্যুৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Femina' থেকে। যার অর্থ, 'Woman'। Feminism সম্পর্কে The Oxford English Dictionary বলছে, Feminism as a state of being feminine or womanly. আবার নারীবাদ বা Feminism নিয়ে Webster Dictionary বলছে, Feminism as the principle that women should have political rights equal to those of men. গবেষক Chaman Nahel তাঁর 'Feminism in English Fiction' প্রবন্ধে নারীবাদ নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, "a mode of existence in which the woman is free of the dependence syndrome. There is a dependence syndrome: whether it is the husband or the father or the community or whether it is a religious group, ethnic group. When women free themselves of the dependence syndrome and lead a normal life, my idea of feminism materializes." সুতরাং নারীবাদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে গবেষক মহলে নানা মতভেদ আছে। এক কথায় নারীবাদ হ'ল নারীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি তথা স্বাধীনতা যে চর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয় তাকেই নারীবাদ বলে। আর এই স্বাধীনতা সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে যে আন্দোলন বা পরিবর্তনের জন্য যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়, তাকে বলে নারীবাদী আন্দোলন।

নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই হ'ল নারীদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা। আটপৌরে হোক কিংবা উত্তরাধুনিকা নারী সকলের স্ব স্ব পরিচয় নির্মাণ এই আন্দোলনের মূল সোপান। ভারতের নারীবাদী আন্দোলন প্রথমার্ধ থেকেই পরিচালিত হয়েছিল পুরুষদের হেয় করে নয়, নারীদের প্রতি পুরুষদের ব্যবহার এবং চিন্তাশীলতার পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য। ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদেরও সুবিধা হয়েছে। পুরুষরা অনেক বহির্জগতের কাজে নারীদের পাশে পাওয়ায় সেসব কাজ সুচারু হয়েছে; যেমন, চাকরির ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভৃতি। নারীদের বহির্জগতে পদার্পণ অতি সহজে ঘটেনি। সমাজের বিরুদ্ধে থাকলেও নারীরা নিজ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে তা

অর্জন করেছে | এর পশ্চাতে বেশ কয়েকজন পুরুষের অবদানও রয়েছে | কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নারীদের স্বাধীনতার পরিপন্থী একদল নারীরাও | শুনে অবাক লাগছে? তবু এটাই বাস্তব | ঊনবিংশ শতকে বহু পরিবারের পুরুষদের কর্তৃত্বের পরেই বাড়ির জ্যেষ্ঠ নারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল | ফলে বাড়ির কমবয়সী মেয়ে, বিবাহিত রমনীদের পায়ে পরাধীনতার বেড়ি পরিয়ে রাখতেন বাড়ির কর্ত্রীগণ | এ প্রসঙ্গে অনেকে বলতেই পারেন, পুরুষের অঙ্গুলি হেলনে একাজ করতে বাধ্য হতেন | কিন্তু তা অনেকাংশে সত্যি হলেও আবার অনেক ক্ষেত্রেই কর্ত্রীগণের মধ্যেও এক পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ছিল | এর পশ্চাতে পারিবারিক ক্ষমতা নিজহাতে রাখার বিষয়টি অন্তর্নিহিত ছিল | এর ব্যতিক্রম চিত্র রানী রাসমণিসহ বিভিন্ন মহিয়ষীদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই | তাঁরা চরম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও নারী স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন |

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভারতীয় নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে স্বতন্ত্রতা বিরাজমান | বস্তুত এই আন্দোলনকে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন, রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা, স্বাধীনোত্তর ভারতে নারী আন্দোলন, অঞ্চলভিত্তিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির স্বপক্ষে আন্দোলন প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায় |

ঊনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন নারী আন্দোলন রূপে পরিগণিত হয় | এক্ষেত্রে পুরুষরাই এগিয়ে এসেছিলেন প্রথমে এই সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে | নারীদের অধিকারের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের সংগ্রাম এক বিশেষ নিদর্শন | তৎকালীন সমাজে এক নৃশংস প্রথার অনুসরণ করা হতো, যা 'সতীদাহ' নামে কুখ্যাত | এই প্রথায় স্বামী মারা গেলে বলপূর্বক তার স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় স্বামীর চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো | যা পৈশাচিক এবং সভ্য সমাজে অনুসৃত হওয়া কাঙ্ক্ষিত নয় | নারীদের এইভাবে পুড়িয়ে মারার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র নারীর দেহ শত কষ্ট সহ্য করে পঞ্চভূতে বিলীন হতো তাই নয়, এর দ্বারা অল্পবয়সী নারীদের স্বপ্ন, আশা, জীবনী শক্তিকে ধ্বংস করা হতো | তাছাড়া এভাবে সমাজের অন্য নারীদেরও বার্তা পাঠানো হতো যে স্বামীর সত্ত্বাদ্বারা স্ত্রীর পরিচয়; তাই স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর বাঁচার অধিকার নেই | আর নিজেকে বাঁচাতে গেলে ভাল করে পতিসেবা করা বাঞ্ছনীয় যাতে স্বামীর মৃত্যু দ্রুত না হয় | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইসময় বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের মধ্যে আকাশ ও পাতাল পার্থক্য থাকত |

সতীদাহের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন রাজা রামমোহন রায় | তিনি এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন | রামমোহন রায় ভারতীয় শিক্ষার সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষায় পন্ডিত ছিলেন | কিন্তু তাঁর শিকড় ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য দ্বারা আধারিত | রামমোহন তাই চেয়েছিলেন ভারতীয় নারী সমাজকে এই নৃশংসতা থেকে রক্ষা করতে, যাতে সমাজের পরিবর্তন সাধিত হবে | কিন্তু এই পথ সুগম ছিল না | রক্ষণশীল সমাজ রামমোহনের এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল | রামমোহন ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন | যাতে সতীদাহের তীব্র বিরোধিতা করেন | এর ঠিক এক বছর পর ১৮১৯ সালে নভেম্বর মাসে উক্ত প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন | এটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল | এর ঠিক দশ বছর পর ১৮২৯ সালে তিনি 'সহমরণ বিষয়' নামক গ্রন্থ লেখেন | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজা রামমোহন জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির জন্য বেছে নিয়েছিলেন কলম | তিনি নিরলসভাবে বছরের পর বছর লিখে যান, যা ছিল সতীদাহ রদের ভিত্তিভূমি | তিনি এক্ষেত্রে নারীর বৈধব্য জীবনকে মহিমান্বিত করে দেখান যাতে জনসাধারণের বিষয়টি বোধগম্য হয় | তাঁর এই পন্থা সঠিক ছিল কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক অনর্থক; কারণ ১৮২০-৩০ দশকে বাংলায় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা বাঞ্ছনীয় |

গবেষক ও অধ্যাপিকা সারদা ঘোষ তাঁর নারী চেতনা ও সংগঠন: ঔপনিবেশিক বাংলা, ১৮২৯-১৯২৫ নামক গ্রন্থে সতীদাহ ঘটনার কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন | এক্ষেত্রে তা উল্লেখের দাবি রাখে | তিনি লিখছেন, "সরকারি হিসাব অনুযায়ী কলিকাতাতেও সতীদাহর ঘটনা নিয়মিত ঘটত | জানা যায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫৩ জন, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৮৯ জন, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ৪৪২ জন, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ৫৪৪ জন বিধবা সহমরণে গিয়েছিলেন |" এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছরে শুধুমাত্র কলকাতায় সহমরণে হত্যা করা হয় মোট ১৫২৮ জনকে | ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড

উইলিয়াম বেন্টিং-এর সহযোগিতায় এই নৃশংস সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়। এই আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র ছিল কলম। না, কোনো মিছিল হয়নি, কোনো প্রতিবাদ-সভা হয়নি। এই আন্দোলনই ভারতীয় নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাত বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর নারীদের বৈধব্য জীবনের উন্নতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বাল্য বিধবাদের কষ্টে ব্যথিত হন। সংস্কৃত পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্যাসাগর ভারতীয় শাস্ত্র 'পরাশর সংহিতা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, ভারতীয় শাস্ত্র বিধবা বিবাহ সমর্থন করে। তিনি ভারতীয় শাস্ত্রই বেছে নিলেন, কারণ ব্রিটিশ আইন বা পাশ্চাত্যের কিছু থেকে উদ্ধৃতি দিলে জনগণ অতি সহজে গ্রহণ করত না। তাই নিজ সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই প্রমাণ করলেন। তিনি তাঁর প্রথম প্রচার পুস্তিকা – কলিযুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে ঘোষণা করেন। এর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধি রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কলিযুগ' পুস্তিকার দশ হাজার কপি বিক্রি হয়। এরপর বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে আইনত করতে ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর ৯৮৭টি স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র সরকারের কাছে জমা দেন এবং ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই সরকার বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করে। এরপর বিদ্যাসাগর নিজ-খরচে বহু বিধবার বিবাহ দেন। এই কাজ নিজ-পুত্রের সাথে বিধবা রমণীর বিবাহ দিয়ে শুরু করলেন। ফলে বাল্যবিধবা রমণীদের দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি ঘটল এবং তাঁরাও উপলব্ধি করতে পারলেন জীবন বড়, তাকে কোনো একটি ঘটনার দ্বারা সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। সারদা ঘোষ বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত একটি পরিসংখ্যানেরও উল্লেখ করছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে, ১৮৫৬- ১৮৬৫ সালের মধ্যে ১৩ জন ব্রাহ্মণ, ১১ জন কায়স্থ, এক জন বৈদ্য ও ১৫ জন অন্য জাতের বিধবা বিবাহ।

বাংলার বাইরে পণ্ডিত রমাবাঈ পুনাতে 'আর্য মহিলা সমাজ' গঠন করে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটান। তাছাড়া পুনাতে হান্টার কমিশনের সামনে নারী শিক্ষিকা ও নারী চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরলেন। এরপর তিনি 'The High Cast Hindu Women' নামক গ্রন্থ লিখে দেশ-বিদেশে সাড়া ফেলে দিলেন। ধীরে ধীরে অন্য নারীরাও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসলেন।

বাংলায় কামিনী শীলসহ বহু মহিলারা পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত হলেন, যা ছিল বিপ্লব। কারণ তৎকালীন পরিবারের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে বহির্জগতে পত্রিকা সম্পাদনা করা ছিল দুঃসাহসিক কাজ। এই সম্পাদনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নারীদের জীবনের বহু কষ্টসাধ্য কাহিনী প্রকাশিত হতো, ঠিক তেমনি অন্যদিকে নারীদের অপার শক্তির কথা ঘোষণা করতেন। তাছাড়া মুসলিম সমাজে ফয়েজুন্নেসা চৌধুরী, বেগম রোকেয়াসহ বহু মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেন। একদিকে বিধবা বিবাহ, অন্যদিকে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার উভয়ই সমান তালে চলতে থাকে। এই দুটি বিষয় নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়কে পুষ্ট করে।

নারী আন্দোলনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল, রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেন সরলা দেবী চৌধুরানী। তাঁর সহযোগী হন রমাবাঈ। তাঁরা ১৯১০-১৯১১ সালে 'স্ত্রী মহামন্ডল' তৈরি করেন এবং প্রকাশ্য বিতর্কে নারীদের অংশ নিতে আহ্বান জানান। ইতিপূর্বে নারীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিপ্লববাদে পুরুষ বিপ্লবীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। তাছাড়া স্বদেশী আন্দোলনে রাস্তায় নেমে পিকেটিং, বয়কটে অংশ নিয়েছেন। ব্যাপক অর্থে নেতৃত্ব দানে নারীরা তখন না থাকলেও অঞ্চল ভিত্তিক ছোট ছোট পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিকথায় জানা যায়, তাঁর মা স্বদেশী আদর্শে এতটাই প্রভাবিত হন যে বাড়ির সমস্ত বিলাতি রন্ধনপাত্র নষ্ট করে দেন। এছাড়া প্রায় ৫০০ জন মহিলা ফেডারেশন হলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের গতি-ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হিন্দু আদর্শগুলি জনপ্রিয় হতে থাকে। বরিশালে মনোরমা বসু নামক জনৈকা গৃহবধূ হিন্দু নারীর ঐতিহ্য ও আচরণবিধির স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে এক মিছিলে নেতৃত্ব দেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালের প্রায় ২০০ জন মহিলা আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ফলে বোঝা যাচ্ছে, নারীরা ধীরে ধীরে দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু এর পশ্চাতে নিজেদের স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লববাদে নারীরাও এগিয়ে আসতে শুরু করেন | তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল, লাবণ্যপ্রভা দেবী তাঁর বিপ্লবী ভ্রাতার জন্য নিয়মিত পিস্তল ও বিপ্লবের পুস্তক সংগ্রহ ও বহন করার কাজ করতেন | দুকড়িবালা দেবী বিপ্লবী নিবারণ ঘটককে সাহায্য করার জন্য সাতটি মসার পিস্তল নিজের কাছে লুকিয়ে রাখেন | ফলে ১৯১৭ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় | ননীবালা দেবী বিপ্লবী ভ্রাতুষ্পুত্র অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আরো কয়েক-জনকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন | এজন্য তাঁর দু'বছর কারাদণ্ড হয় এবং অকথ্য পুলিসি অত্যাচার সহ্য করতে হয় | ঢাকা জেলার আশালতা সেন মাত্র ১১ বছর বয়সে বাড়ি বাড়ি বিপ্লবের ভাবধারা প্রচারের জন্য পুস্তক বিলি করতেন | ময়মনসিংহ জেলার ক্ষীরোদা সুন্দরী দেবী তাঁর দেবর পুত্র বিপ্লবী ক্ষিতীশ চৌধুরীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে যুগান্তরের সদস্য হন | এইভাবে বিপ্লববাদের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা নেন | বিপ্লববাদের পাশাপাশি ১৯১৭ সালে অ্যানি বেসান্ত, ডরোথি গ্রাহাম জিনরাজদাসা, মার্গারেট কাজিনস-এর উদ্যোগে তৈরি হয় 'উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', ১৯২৫ সালে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান উইমেন' এবং ১৯২৭ সালে 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স' গঠিত হয় | এই সংগঠনগুলির উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় নারীদের প্রতিনিধিত্বের দাবি, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, সম্পত্তির অধিকার | অন্যতম নেত্রী স্বরূপা কুমুদিনী বসু 'Indian Messenger'-এ বলেছিলেন, "Men and women must work together, the point of view of each being considered for the good and welfare of all."

১৯২১ সালে নেলি সেনগুপ্ত গান্ধীবাদী অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে চট্টগ্রামে খদ্দর বিক্রি করেন এবং গ্রেপ্তার হন | ১৯২২ সালে 'মহিলা কর্মী সংসদ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয় | ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন বহু মহিলারা | এই আন্দোলনে অংশ নিয়ে শান্তি প্রভাধর ও অরুণা কর কারাবরণ করেন | মোহিনী দেবী ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ সালে আইন অমান্যের সময় সরকার বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এবং তাঁর ছ'মাস কারাদণ্ড হয় | পরবর্তীকালে তাঁকে নিজ গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয় | এছাড়া বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, সরোজিনী নাইডু, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ মহিলারাও নেতৃত্বদান করেন | কমলা দাশগুপ্ত তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী' গ্রন্থে ৮৪ জন বাঙালি নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকার উল্লেখ করেছেন | এছাড়া ঐ গ্রন্থেই 'যাঁদের কথা অল্পই জানা গেছে' নামক অধ্যায়ে আরো কয়েকজন নারীর উল্লেখ করেছেন | এই বিশাল সংখ্যক নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে ব্রিটিশ সরকার ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে | তার প্রমাণ মেলে লন্ডনে প্রকাশিত Daily Telegraph সংবাদপত্রে – সেখানে উল্লেখিত হয়, "the most obstinate and most dangerous antagonists of the English."

নারী স্বাধীনতা ও নেতৃত্বদানের বিষয়ে গান্ধীজীর মতের স্ববিরোধীতা লক্ষ্য করা যায় | গান্ধীজী চাইতেন নারীরা গৃহে থেকে পুরুষদের আন্দোলনে সহযোগিতা করবেন | তিনি কখনই চাননি নারীরা বাইরে বেরিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিক | তিনি নারীকে যৌনতাহীন ব্যক্তিত্ব রূপে চিহ্নিত করেছেন | আবার তিনি এও উপলব্ধি করেন, নারীদের যে দুর্বলতা তা কেবল শারীরিক নয়, মনস্তাত্ত্বিকও বটে | গান্ধীজী চেয়েছিলেন এই দুর্বলতা কাটিয়ে নারীরা বেরিয়ে আসুক | তিনি সীতার উদাহরণ দিতেন | গান্ধীজীর কাছে সীতা ছিলেন স্বদেশী, আত্মনির্ভরতা ও পবিত্রতার প্রতীক, কোনো অসহায় নারী নয় | তিনি নারীদের সাহসিকতার ভিত্তিরূপে সহনশীলতা, আত্মত্যাগ ও পবিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন | কিন্তু তিনিই আবার লবণ সত্যাগ্রহে মহিলাদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন | পরবর্তী সময়ে কমলাদেবী তাঁকে বুঝিয়ে মহিলাদের অংশগ্রহণের সম্মতি আদায় করেন |

১৯২৯-৩১ সালের 'সারদা আইন'-এর বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে প্রথম পর্যায়ের ভারতীয় নারীবাদী আন্দোলন চরম রূপ নেয় | এই আইন ছিল বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন | এই আইনে প্রথমে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৪ বছর এবং ছেলেদের ১৮ বছর করা হয়; কিন্তু নারী সংগঠনগুলির সক্রিয় প্রতিবাদে মেয়েদের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের বয়স ২১ বছর করা হয় | হরবিলাস সারদার নামানুসারে এই আইনের নামকরণ হয় |

১৯৪০-৪১ সালের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, রাউ কমিটির সাথে নারী নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক | ব্রিটিশ সরকার রাউ কমিটি গঠন করেছিল বিবাহ ও পারিবারিক আইনগুলির পূর্ণাঙ্গ

সংস্কারের জন্য | কিন্তু ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়| এর দরুন নারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় | মুথুলক্ষ্মী রেড্ডিসহ বেশ কয়েক-জন এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি | কিন্তু মৃণালিনী সারাভাই, সুচেতা কৃপালনী গান্ধীজীর কর্মসূচি থেকে সরে আসতে চাননি | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গান্ধীজীর আন্দোলনের পাশাপাশি ১৯২০ ও ১৯৩০ সালে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘটে বঙ্গনারী শ্রমিকরা অংশ নেন | ১৯৪০ সালে নারীরা সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনেও যোগ দিতে শুরু করেন | এর দ্বারা বোঝা যায়, নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার পাশাপাশি আদর্শবাদের দ্বন্দ্বের বিষয়টিও খুব সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়| এছাড়া ১৯৪৪ সাল থেকে শুরু হওয়া তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনে নারীদের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো | তেভাগার নারী কৃষক আত্মরক্ষা বাহিনীর নেত্রী ছিলেন রানী মুখার্জী | এছাড়া রাজশাহীর ইলা মিত্র উল্লেখযোগ্য | ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার কালপর্বে দেশ ভাগের করুণ পরিণতিতে পূর্ববঙ্গের নারীদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, হত্যা চলতে থাকে | ফলত, নারীবাদী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে | পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে নারীদের উন্নয়নের দাবি-দাওয়ার জন্য ১৯৫৪ সালে গড়ে তোলা হয় 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন'| তেলেঙ্গানা আন্দোলনের অংশ নেওয়া নারীরা গার্হস্থ্য হিংসার বিষয়টি উত্থাপন করতে চাইলে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অবহেলা করায় বামপন্থী নেতৃবৃন্দকে নারীরা চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেন | কিন্তু তা ছিল দুর্বল | কারণ ক্ষমতাবান, সবল বামপন্থী নেতৃবৃন্দের কাছে এরা অসহায় হয়ে পড়েন | ফলে, এই সকল আন্দোলন নারীদের দ্বারা সফল হলেও নারীদের পূর্ণাঙ্গ সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি | শুধুমাত্র বামপন্থী আদর্শ বিস্তারের লক্ষ্য ফলপ্রসূ হয়েছে |

ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটে ১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকে | আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মতো স্বাধীন ভারতের নারীদের ভোটাধিকারের জন্য কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়নি | ১৯৭০ সালে Ester Boserup-এর 'Women and Development' গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রাচ্য তথা ভারতে নারী অধিকার নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয় | ১৯৭৫ সালকে রাষ্ট্রসংঘ 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' রূপে ঘোষণা করে, ফলে সারা বিশ্বের তাত্ত্বিক মহলে নারী অধিকার নিয়ে আলোচনা শুরু হয় |

উক্ত কালখন্ডে উত্তর ভারতে মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন, পশ্চিম ভারতে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন এবং নারী শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় | এই সকল আন্দোলনগুলিতে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো | ১৯৭৫ সালে অতি বামপন্থী মহিলারা হায়দ্রাবাদে 'Progressive Organization of Women' নামক সংগঠন গড়ে তুলে নারী সমাজের উপর নিপীড়নকে বিশ্লেষণ করেন | মহারাষ্ট্রের ঔরাঙ্গাবাদে গড়ে ওঠা 'League of Women Soldiers for Equality' সংগঠন নারীবাদ এবং জাতপাত বিরোধীতাকে একসূত্রে গাঁথে | এছাড়া মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া জেলায় গড়ে ওঠা 'শ্রমিক সংগঠন' এবং এলা ভাটের নেতৃত্বে আমেদাবাদে গড়ে ওঠা 'স্বনির্ভর মহিলা সমিতি' গার্হস্থ্য হিংসা এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা করেন |

১৯৭৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সমস্ত আন্দোলনের অধিকার কেড়ে নেন এবং Press Censorship জারি করেন | ফলত, জরুরী অবস্থার প্রথমদিকে নারী আন্দোলনের বহু নেত্রী আত্মগোপন করতে বাধ্য হন এবং আন্দোলনগুলির প্রকাশ্য কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় | ১৯৭৫ সাল যেহেতু 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' ছিল, সেহেতু ভারত সরকার 'Towards Equality' নামক একটি প্রতিবেদনে বলেন, ১৯১১ সালের পর থেকে ভারতীয় নারীদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি বরং অবনতি হয়েছে | তাই জাতীয় কর্মসূচিতে নারী অধিকারের বিষয়টির গুরুত্ব যথেষ্ট | কিন্তু জরুরী অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধীর সরকারই পরিবার পরিকল্পনার নামে 'বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাত্বকরণ'-এর নীতি নেন, যা নারী অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী ছিল | ফলে বহু নারী ও শিশুর শারীরিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে | জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো | উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে মুম্বাই শহরে জয়ন্তী বেন মেহেতা, অহল্যা রঙ্গনেকর এবং কমল দেশাই ৫০০ জন মহিলার সত্যাগ্রহী দল নিয়ে জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন | জরুরী অবস্থার প্রথম

পর্যায়ে নারীবাদী আন্দোলন স্তিমিত থাকলেও তার থেকে দেশকে মুক্ত করতে দেশব্যাপী আন্দোলনকে নারীবাদীরা নারীবাদী আন্দোলনে বদলে দেন। ভারতীয় নারীবাদীদের মূল লক্ষ্যই ছিল যেসব ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার খর্ব হবে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা।

১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তা দ্বিতীয় পর্যায়ের নারীবাদী আন্দোলন রূপে গণ্য করা হয়। ১৯৮০ দশকে পুলিসি হেফাজতে, রাস্তাঘাটে সর্বত্র নারী ধর্ষণ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তরুণীকে পুড়িয়ে মারা থেকে যৌতুক দিতে না পারায় আত্মহত্যা করার ঘটনাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭২ সালে মথুরা নামে একটি ১৬ বছরের আদিবাসী মেয়েকে মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলার দেশাইগঞ্জ থানার দুই পুলিস গণপত ও তুকারাম ধর্ষণ করে। এরপর ১৯৭৪ সালের ১লা জুন দায়রা আদালতে অভিযুক্তরা নির্দোষ প্রমাণিত হয়। তারপর হাইকোর্ট হয়ে সুপ্রিম কোর্টে কেসটি (Tukaram Vs State of Maharashtra) যায়। ধর্ষণের সময় মেয়েটি কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারায় মেয়েটির দেহে অত্যাচারের কোনো চিহ্ন ছিল না, তাই মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছিলেন, peaceful affair এবং দুইজন অভিযুক্তকেই মুক্তি দেন।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন নারী সংগঠন ধর্ষকদের মুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়। হাতে কলম তুলে নেন বসুধা ধাগমওয়ার, লতিকা সরকার এবং উপেন্দ্র বক্সী। তাঁরা চিঠি দেন ধর্ষণ আইন সংস্কারের দাবিতে। স্মর্তব্য, উক্ত সময় সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খবরগুলিকে ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হতো। হরিয়ানা, পাঞ্জাব আসাম, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের নারী ধর্ষণের ঘটনা ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করেছিল। ভারতবর্ষ দেখল এক কালো অধ্যায়। যার মধ্যে নিহিত ছিল, নারীদের রক্ত আর নরখাদক ধর্ষকদের উল্লাস।

১৯৭৮ সালে অন্ধ্রের রামিজা বাঈকে বেশ কয়েকজন পুলিস ধর্ষণ করে এবং তাঁর স্বামী আহমেদ হুসেন তাঁকে বাঁচাতে গেলে নৃশংসভাবে আহমেদকে হত্যা করা হয়। মথুরা কেসের পর এই নৃশংস ঘটনা দেশকে কালিমালিপ্ত করে। দেশের জনগণ মথুরার পক্ষে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার অঙ্গীভূত হয় রামিজা বাঈ-এর ঘটনাটিও। মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। পুলিসরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য রামিজা বাঈ-এর চরিত্র হনন করে পতিতা বলে উল্লেখ করে এবং তাঁর স্বামীকে পতিতাদের নিয়ে ব্যবসা চালান বলে যুক্তি দেয়। এই ঘটনা রক্ষকদের ভেতর ভক্ষকের কুৎসিত রূপটিকে বহির্জগতে প্রকাশ করে।

উক্ত ঘটনার পর নারীবাদী আন্দোলন থেকে দাবি ওঠে, custodial rape-এর বিষয়টিকে যাতে বিশেষভাবে গণ্য করা হয়। কারণ, পুলিসের হাতে অসীম ক্ষমতা। তাই পুলিস খুব সহজে প্রমাণ ধ্বংস করতে পারে। তাছাড়া Criminal Procedure Code, Section 197 অনুযায়ী, কর্তব্যরত কোনো সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে সরকারের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোনো অন্যায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। তাই জন্য নারীবাদীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দাবি করেন তা হ'ল, যে সকল পুলিস অফিসার নারী ধর্ষণে অভিযুক্ত, তাদের সঠিক তথ্যসহ নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে মুম্বাইতে তৈরি হয় 'ধর্ষণবিরোধী ফোরাম'।

Law Commission ১১৩-তম অধিবেশনে Indian Evidence Act 1872-এর সংশোধনের জন্য সুপারিশ পেশ করেন। এই সুপারিশের Section 114-B15-এ বলা হয়, "in the prosecution of a police officer for an alleged offence of having caused bodily injuries to a person while in police custody if there is evidence that the injury was caused during the period when the person was in the police custody, the court may presume that the injury was caused by the police officer having the custody of that person during that period unless the police officer proves to the contrary. The burden of proof lies on the police officer to prove the contrary." কিন্তু এই সুপারিশ বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তবে এই নৃশংস ঘটনাগুলি লিঙ্গভিত্তিক যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে এক জাগরণের সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীকালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৯৭০-১৯৮০ দশকে নারী আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করে। ফলে এই আন্দোলন বিষয়ের সীমারেখাকে

অতিক্রম করে এবং পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনও এতে অঙ্গীভূত হয়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, চিপকো আন্দোলন। চিপকো শব্দের অর্থ হ'ল, জড়িয়ে ধরা। অর্থাৎ, প্রকৃতি মাতার বৃক্ষরাজিকে রক্ষার জন্য জড়িয়ে ধরে নারীরা তাদের বাঁচানোর চেষ্টা চালান। এই আন্দোলন ১৯৭০ দশকে শুরু হলেও এর ভিত্তিভূমির বীজ প্রথিত হয় ১৭৩০ সালে। তখন রাজস্থানের খেজারিলি গ্রামে তৎকালীন মেওয়ারের রাজা অভয় সিংয়ের আদেশে গাছ কেটে প্রাসাদ নির্মাণের কর্মসূচি নেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তিন সন্তানের জননী অমৃতা দেবী। তাঁর সাথে যুক্ত হন বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাঁরা প্রথম গাছকে জড়িয়ে ধরে চিপকো আন্দোলনের ধারণার সূত্রপাত ঘটান। কিন্তু রাজশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ৩৬৩ জন শহীদ হন।

দুই শতাব্দী পর ১৯৬৩-র ভারত চীন যুদ্ধের অবসানের পরবর্তী সময়ে ভারতের উত্তরাঞ্চলে উন্নয়ন দেখে বিদেশী বেশ কিছু মুনাফালোভী, মানবতা ধ্বংসকারী সংস্থা এই অঞ্চলের বনজ সম্পদ দখলে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং সরকারের অনুমতি পেলে বৃক্ষনিধন যজ্ঞে মেতে ওঠার অপেক্ষায় থাকে। এছাড়া এই অঞ্চলের চোরাচালানকারীরা বৃক্ষচ্ছেদন করে অঞ্চলের ভারসাম্য নষ্ট করতে থাকে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হ'ল, সরকারের অর্থলিপ্সু, দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা কলকারখানা স্থাপনের জন্য উত্তরাখন্ডে ১০০টি গাছ কাটতে উদ্যোগী হন। এছাড়া ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে বিদেশী সাইমন্ড কম্পানিকে উত্তরাখণ্ডের বনদপ্তর ৩০০টি ছাইবৃক্ষ প্রদানের অনুমতি দেয় এবং তারা ৩০০টি বৃক্ষ কাটতে তৎপর হয়। এমতাবস্থায় সুন্দরলাল বহুগুণার স্ত্রী বিমলা দেবী মাড়োরা গ্রামের মেয়েদের নিয়ে গাছ জড়িয়ে ধরে চিপকো আন্দোলন শুরু করেন। এরপর তাঁর স্বামী তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে রেনি, তেহরি, কুমায়ুন ও বৈদ্যগড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই অঞ্চলগুলিতে চন্ডীপ্রসাদ ভাটের পরিকল্পনা অনুযায়ী গৌড়া দেবীর নেতৃত্বে মহিলারা গাছ জড়িয়ে ধরে বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করেন। আন্দোলনের ব্যাপকতার ফলে তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ১৯৮০ সালে পাহাড়ে গাছ কাটায় ১৫ বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

বৃক্ষচ্ছেদন শুধুমাত্র পরিবেশের ভারসাম্য ধ্বংস করবে না, এই বনাঞ্চল থেকে আদিবাসী মহিলারা তাদের ভরণ-পোষণের সামগ্রী পেতেন, সেই অধিকারেও কুঠারাঘাত ছিল। ফলে, বনাঞ্চল ধ্বংস করলে আমেরিকা কেন্দ্রিক অর্থনীতির চাপে পড়ে মহিলারা তখন বাধ্য হবেন দূর-দূরান্তে গিয়ে নিজেদের আশান্বিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে বা কম্পানিগুলির যেসব দ্রব্য এই অঞ্চলে সরবরাহ ঠিক রাখবে তাই সংগ্রহ করতে হবে। চিপকো আন্দোলন শুধুমাত্র পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন নারীদের স্বাধিকার, নিজের সম্মান ও সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৯০ দশকে নারী আন্দোলন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই দশকে নারী আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল সম্প্রদায়গত, ব্যক্তিগত; পারিবারিক আইনের পরিবর্তে অভিন্ন নাগরিক আইনের প্রবর্তন। ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলা সমগ্র ভারতবর্ষে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায়। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় সি জে চন্দ্রচূড় এক মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলা (শাহবানু) আর্থিক সাহায্য চেয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করলে তাঁর পক্ষে রায় দেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাহবানুর খোরপোষের আবেদন আদালত অনুমোদন করে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় তীব্র মুসলিম বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। বিচারপতি তাঁর রায়ে জোর দিয়েছিলেন একটি অভিন্ন নাগরিকবিধি প্রণয়নের ওপর। একদিকে, মৌলবাদী মুসলিমরা তাদের ব্যক্তিগত আইনে আদালতের হস্তক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে এবং অপরদিকে নারীবাদী উদারপন্থীরা এবং হিন্দুরা গোঁড়া মুসলিমদের এই প্রতিক্রিয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার গোঁড়া মুসলিম নেতাদের দাবি অনুসারে ১৯৮৬ সালে মুসলিম নারী আইন (বিবাহ বিচ্ছেদ অধিকারের সুরক্ষা) রূপায়িত করেন। এইভাবে ব্যক্তিগত আইন এবং অভিন্ন নাগরিক আইন বিষয়দুটি পরস্পর বিরোধী ধারার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি এই দশকেই অন্ধ্রপ্রদেশের মহিলারা মদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং নারীশিক্ষা প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

২০০০ সালে কাল খন্ডের পূর্ব থেকেই বিশ্বায়নের সূচনা হয়। এই বিশ্বায়নের ফলে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকে। ফলে নারী আন্দোলনেও এর প্রভাব পড়ে। এই সময় বিভিন্ন নারী সংগঠন তাদের কর্মকান্ড

পরিচালনার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে অর্থ সাহায্য নিতে থাকে। ফলত নারীদের স্বাধিকারের আন্দোলন এদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া এই সময় নারীদের সমস্যার বিভিন্ন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়।

ভারতের নারীবাদী আন্দোলন কোনো একমাত্রিক আন্দোলন নয়, এই আন্দোলনের মধ্যে বৈচিত্র্যের সাথে বহুমাত্রিকতাও লক্ষণীয়। নারী আন্দোলন সফল কি ব্যর্থ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এখনো আসেনি। তবে ভারতের নারী আন্দোলন সর্বক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছে, যা দৃষ্টান্তকারী।

তথ্যসূত্র:-

১) ঘোষ সারদা, জানুয়ারি, ২০২২, নারীচেতনা ও সংগঠন উপনিবেশিক বাংলা ১৮২৯- ১৯২৫, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ: ২৭

২) তদেব, পৃ: ৩০

৩) সেন শমিতা, ভারতের নারী আন্দোলন: প্রেক্ষাপট সমস্যা, পৃ: ৪৩

৪) তদেব, পৃ: ৪৫

৫) তদেব, পৃ: ৪৯

৬) Ranjan, Soumya, 16th August, 2022, Custodial Rapes in India, Jus Corpus Law Journal, Lakhimpur Kheri, p: 957

৭) Ibid, p: 958

৮) Pande, Rekha, December, 2015, Mapping the terrain of activism in the Feminist and the Women's Movement in India, https://www.academia.edu/about, p: 11

৯) Ibid, p:15

১০) সেনগুপ্ত মল্লিকা ডঃ, নারী আন্দোলন, পৃ: ১৮৯

১১) Raina Ahmad, Javeed, March, 2020, Feminism: An Overview, International Journal of Research

বাঁচিয়ে রেখো

আশীষ দত্ত রায়

কেউ কেউ বলে, কতকিছু তো করলে, এবার একটু নিজের কথা ভাবো। নিজের ইচ্ছাপূরণ, ছোট ছোট সাধ-আহ্লাদ। বয়স হয়েছে। যাত্রা প্রায় শেষ করে এনেছি। ভাবি সেভাবে কি আর ভাবতে পারব? তাই আর ভাবি না। খানিকটা বোঝাপড়া, বিনিময়, প্রত্যয় আর ভাললাগা মেলাতে পারলে সবার মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

কিশোর কালের শেষ সময়ের স্মৃতি – তেমন বাহারি চোখে পড়ার মতো তাঁর বেশভূষা নয়। সাধারণ পোশাক, কাঁচাপাকা চুল, চোখে সাধারণ ফ্রেমের কালো চশমা, শীতে খয়েরী বা কালো সোয়েটার – এই হ'ল কাকু, পাড়ার সবার বিকাশদার সাদামাটা বিলাস। অবসরপ্রাপ্ত একা মানুষ। আমাদের চার-পাঁচটা বাড়ির পরে একটা বাড়িতে থাকতেন।

ভোরবেলা উঠে গাছে জল দিয়েই ব্যাগ হাতে বাজারে যেতেন কাকু। সেটা আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই। মাঝে মাঝেই দেখা হতো। আর সাথে সাথেই আকর্ণ হাসি, "হ্যালো মি. ইয়ং ম্যান, কেমন আছ?" আমিও হেসে জবাব দিতাম, "ভাল কাকু; আপনি?" হাসতে হাসতে বলতেন – "পুরোপুরি জলজ্যান্ত।"

আমার দিনে মানুষ আর রাতে আকাশ দেখার নেশা কাকুর জানা ছিল। তাই আমায় তামাশা করে কখনো কখনো গ্যালিলিও বলে ডাকতেন।

সেদিন সকালে কাগজের পাতা জুড়ে নিরাশার খবর। অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় দম্পতির সন্তানসহ আত্মহত্যা। রাজনীতির কারবারীরা কী কী জুয়াচুরি করেছে? বাণিজ্য তথা কারবারীদের কারচুপি, জেল... কাগজ বন্ধ করে চুপ করে বসেছিলাম। কাকুর ডাকে চমক ভাঙল। পাশে এসে কাঁধে হাত রেখে বললেন, "রাতের আকাশে অন্ধকার তো তুমি দেখো না গ্যালিলিও, তুমি তো নক্ষত্র খুঁজে বেড়াও। তাই তো! কিন্তু এটাও তো মানতে হবে, রাতের আকাশে তুমি যতখানি দেখো, তারচেয়ে অনেক বেশী না দেখা জগৎ আছে। সেসব যদি দেখতে পেতে, জানতে পেতে, তবে গিয়ে কিছুটা জানা হয়। তাই না? কিন্তু, উপায় তো নেই; আমাদের সারাজীবনেও সবকিছু দেখা যাবে না। অতএব যেটুকু দেখে ভাল লাগল, ভেবে নিও না দেখা বাকিটুকুতেও

তেমনি ভালটুকুই আছে।"

এতটুকু বলে কাকু থামলেন। তারপর ধীরে ধীরে ভেঙে ভেঙে বললেন, "জানো ইয়ংম্যান, আমি আজকাল ঐ সংবাদপত্র পড়া ছেড়ে দিয়েছি। তবে পুরোপুরি নয়। হাসির বা বিদ্রূপের গল্প, রচনা এসব পড়ি, মাঝে মাঝে কবিতাও... ভালই লাগে মাঝেমধ্যে পড়তে। অন্য কোনো লেখা পড়ি না। ওসব লেখায় শব্দের প্রয়োগ, মনস্তাত্ত্বিক চটক, কিছুক্ষণ বাদেই মাথা গরম হয়ে যায়। ওসবে নেই কি জানো? "পথ"। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তুমি কোনও পথ দেখতে পাবে না। রক্ত গরম করা বিনিদ্র কয়েক রাত্রির জ্বালা-যন্ত্রণা তোমাকে ক্ষণিক উত্তেজিত করতে পারলেও উদ্দীপিত করতে পারবে না। তার চেয়ে বরং মন খারাপ না করে, চলো আমার সাথে আজ বাজারে।"

মাকে বলে রাজি করালাম। মা বলল, "বিকাশদার সাথে যখন যাচ্ছিস, একটু সবজিপত্র কিনেই আনিস।"

দুজনে চলেছি বাজারে। ঢোকার মুখেই বিন্দার চায়ের দোকান। কাঠের বেঞ্চে দেখি, কয়েকজন মিলে উত্তেজিত আলোচনায় মগ্ন। এবারে নির্বাচনে কোন দল আসবে, কাকে ভোট দেওয়া উচিত এইসব। সবাই অনেক জানে। কেউ কারো চেয়ে কম যায় না, সকলেই যথেষ্ট টাটকা খবর রাখে মনে হ'ল। হয়তো শিক্ষিত হলেও হতে পারে। রাজনীতি, সমাজনীতি একদম ঠোঁটস্থ। কাকু গলা চড়িয়ে বিন্দাদাকে বললেন, "বিন্দা, দু'জায়গায় চারটে করে লুচি আর আলুর দম দে তো! দোকানের সামনে বাপ-ছেলে যে হাঁ করে বসে আছে, দেখেছিস একবারও ওদের দিকে? মুখ দেখলেই বোঝা যায় কাল থেকে ওদের পেটে কিছু পড়েনি।"

মুহূর্তে সব আলোচনা বন্ধ। লোকগুলো এর ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। আমার বেশ মজা লাগছিল। কাকুর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকগুলোকে পাত্তাই দিল না। আলুর দম আর লুচির থালা ওদের হাতে দিয়ে বাবাকে বললেন, "নিরঞ্জন, কাল যে বাড়িতে যেতে বলেছিলাম কাজের জন্য, গিয়েছিলে? এখন তো বসে থাকলে চলবে না আর।" মাথা নত হ'ল লোকটির। নিচুস্বরে বললেন, "গিয়েছিলাম বাবা, কালকে যেতে বলেছে।" কাকু আর দাঁড়ালেন না।

এরপর বাজার করা শুরু হ'ল। সাধারণত আমায় সবজি বাজার করতে হয় না। বাবাই সব করেন। আমি উৎসাহভরে বেচাকেনা দেখছিলাম। কোনও কোনও বিক্রেতাকে বেশ দাপুটে এবং প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হ'ল। সব সবজি ভালভাবে সাজিয়ে বসেছেন। এরকম একটা দোকানে দাঁড়ালে সবকিছু কেনা হয়ে যায়। কাকু দেখলাম বাজারে বেশ পপুলার। সকলেই নমস্কার করছে, খোঁজখবর বিনিময় চলছে। চলতে চলতে কাকু দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধার কাছে। কিছু শাক, দুটি লাউ, একটি কুমড়ো খান কতেক ঝিঙ্গা আর দুটো মোচা নিয়ে বসেছেন তিনি। কথা শুনে বুঝলাম, বৃদ্ধার ছেলে বাইরে কোথাও কাজের খোঁজে বছরখানেক আগে ঘর ছেড়েছে। রেখে গেছে বৌ আর দুই বছরের ছেলেকে। তার কোন খোঁজ আপাতত নেই। কাকু একটা লাউ আর একটা মোচা কিনলেন। আমায় বললেন, "কুমড়ো নিবি?"

কাল দেখেছি বাড়িতে ছিল। কাকু বললেন, "খুব মিষ্টি, মাসীর নিজের মাচার কুমড়ো।" কি যেন বুঝে আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম নেব। আরো কিছু বাজার হ'ল। ঘরে ফিরে মাকে বললাম, "কাল থেকে আমি বাজার করব, কাকুর সাথে।" মা দেখলাম আপত্তি করলেন না।

কয়েক মাস পরে এক রবিবার সকালে কাকু আসছে না দেখে ওঁর বাড়িতেই গেলাম। দেখলাম শুয়ে আছেন। গায়ে হালকা জ্বর। আমাকে কাছে ডাকলেন, পাশে বসতে বললেন। কাজের মাসী পাশের ঘরে কিছু করছিল। আমি খাটের পাশে বসলাম। দেখি পাশে পরশুরামের বইটি খোলা। সামান্য কথাবার্তা হ'ল। কাল পরশুর মধ্যে সেরে উঠেই আবার একসঙ্গে বাজার করা যাবে জানাতে ভুললেন না। কিন্তু কেন জানি কাকুর চোখের কোণে একবিন্দু জলও দেখতে পেয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে চলে গেলেন কাকু। সেদিন আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম তাঁর খাটের একপাশে। পাশের বাড়ির বোসকাকা বললেন, "বিকাশের সাবলীল প্রকাশ ওর জীবন যাপনের মধ্যেই ছিল। আর কারো মধ্যে দেখলাম না। তোমরা যদি পারো, ওকে বাঁচিয়ে রেখো।"

ফিরে পাওয়া

অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

নবমীর রাত শেষ আর দশমীর ভোরের আলো – এই দুটোর মাঝের সময়টুকুতে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জড়িয়ে থাকে। এই জড়ানোটা অনেকটা আষ্টেপৃষ্টে লেগে থাকা সম্পর্কগুলোর মতো। জীবনের স্রোত বহুদিকে বয়ে যায়, বছরের পর বছর কেটে যায়, কত নতুন সম্পর্ক হাত ধরতে থাকে, তবুও এরা জড়িয়ে থাকে অহরহ। সময়ের সাথে মানুষগুলোর বাঁধন আলগা হয় না – অদ্ভুতভাবে আরো শক্ত হয়ে বসে।

প্রায় একযুগ পর পুজোতে বাড়ি গিয়েছিলাম।

মেয়ে-বরকে নিয়ে বাস স্ট্যান্ডের মোড় পেরিয়ে আমার শহরে যখন পা রাখলাম, টোটোর অবিরাম হর্ন, অনেকটা পাল্টে যাওয়া চারপাশ, নতুন বাড়িঘর, দোকানপাটের ভিড় দেখে থমকে যাই; সবই কি তবে পাল্টে গেল? এগোতে এগোতে বাড়ির গলিতে পৌঁছে গেলাম। পাঁচিলের গা বেয়ে বেড়ে ওঠা মাধবীলতার পুরনো মিষ্টি গন্ধটা নাকে এসে লাগল, কোলাপ্সিবল গেটের ক্যাঁচ করে আটকে যাওয়ার শব্দটা কানে এসে বাজল, বসার ঘরে সোফার শক্ত গদিটার সেই চেনা স্পর্শ ফিরে পেলাম, পাশের ছোট্ট পুকুরের আয়না-সবুজ ছায়াটার উপর চোখ আটকে গেল। দুপুরে মায়ের হাতের টকডাল আর বকফুলের বড়া খেয়ে আবার যেন সেই পরিতৃপ্তি জিভে লেগে থাকল। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই আমায় বারেবারে বুঝিয়ে দিল, জীবনে কিছু জিনিস কক্ষনো বদলায় না – অবিকল একই রকম থাকে।

সন্ধেবেলা সেজেগুজে যথারীতি কাকার বাড়িমুখো হলাম। দশ বছরের পার্থক্য বলতে – সাথে মেয়েও চলল দাদু-দিদুন-মামা-মাসিদের সঙ্গে হৈচৈ করতে। বহুদিন বাদে জমে উঠল আড্ডা, অট্টহাসি। মেজকাকার হাতের চিলি-চিকেন, ফ্রায়েড-রাইস – কতরকম স্মৃতিচারণ, একসাথে ঠাকুর দেখা, পুজোর উপহার দেওয়া নেওয়া... কানের মধ্যে ফিসফিস করে কে যেন বলে উঠল কিছুই তো বদলায়নি। সেই পুরনো বাড়ির নতুন করে বাঁধানো রোয়াক, তাতে দলবেঁধে বসে আড্ডা, ছোটকাকির হাতের নাড়ু-নিমকি খাবার সাথে এখন অবশ্য যোগ হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়ার জন্য পারফেক্ট সেলফি তোলার হিড়িক। সার্বজনীনতলার থিম সজ্জাটা নতুন, কিন্তু মায়ের ডাকের সাজটা ঠিক আগের মতনই। আশেপাশে অসংখ্য নতুন মুখের ভিড় কিন্তু পিসিমণির হাত ধরে ঠাকুর দেখতে যাওয়া, ছোটকাকার মুখে ছোটবেলার গল্প শোনা আগেরই মতন রয়ে গেছে। মেয়ের হাত ধরে সবকিছু চিনিয়ে দেওয়াটা নতুন, কিন্তু ভাই-বোনেদের সাথে খুনসুটি, ঠাট্টার মুহূর্তগুলো ঠিক একইভাবে অনাবিল আনন্দের উৎসমুখ!

জীবনের রং ঠিক সানলাইটের মতো, হয়তো মোড়কটা বদলায় কিন্তু ভেতরটা রয়ে যায় চিরন্তন, টেকসই। কয়েক বছর আগে বাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আমার এখনকার বাসস্থান এই মরুশহরে বসে লিখেছিলাম –

‘মায়ের হাসি বাবার ডাক হবেই হবে আসছে বছর’

আবার ফিরে আসার আগে নিজের ছোটবেলার পড়াশুনো করার জায়গাটায় বসে লিখে ফেললাম –

‘এলাম ফিরে বছর পরে
তোমার কাছেই আমার শহর
প্রিয়জনের হাতটি ধরে
ভাল থেকো আমার শহর’

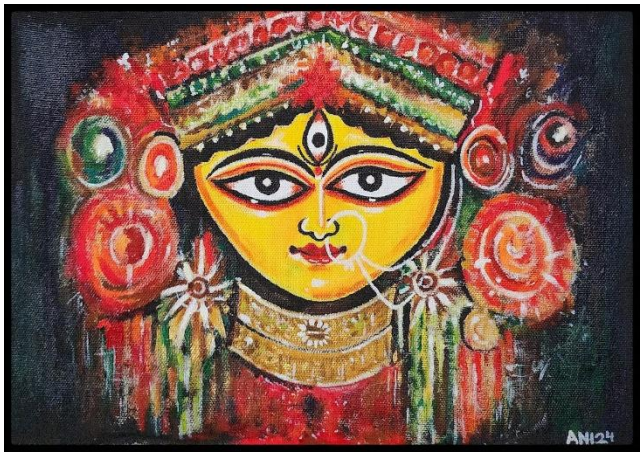

শিল্পী: অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

তোমার পানে তাকিয়ে সকল বিশ্ব মানবজাতি,
ধ্বংসলীলায় মেতেছে যে দেশ,
নিরীহ শিশুর প্রাণ হয় শেষ,
তুমিই পারো মা রুখতে তাদের নেভাতে হিংসাবাতি।

কেন শুরু তার কারণ খুঁজে কি লাভ কিছু হবে আর?
সৃষ্টি তোমার হতেছে লুপ্ত কেবা লবে দায়ভার!
তুমিই আছ মা সবার মাঝারে দুঃস্থজনের সাথী,
পারো মা তুমিই রুখতে তাদের, নেভাতে হিংসাবাতি।

অসহায় যারা খাবারের টানে পড়িছে মৃত্যুমুখে,
প্রশ্রয়ে কার সব হাহাকার মিলায় রুগ্নবুকে!

হও মা এবার দশপ্রহরিণী করুণা করো গো দান,
উৎপীড়িতের হও মা সহায়, রাখো অভাগীর মান!
লও তার প্রাণ আড়ালে থেকে যে হতেছে বিশ্বঘাতী,
পারো মা তুমিই রুখতে তাদের, নেভাতে হিংসাবাতি।

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

মলিন বসনে যে শিশুর মুখে জোটে না দু'বেলা ভাত,
পরনে শুধুই ছিন্নবস্ত্র কিবা দিন কিবা রাত!
সকলের তরে প্রার্থনা মোর তোমার চরণে আজি,
হও অভাগার সহায়, ঘুচাও সবার দুঃখরাজি।

যে মায়ের কোল শূন্য আজিকে, যে নিল মেয়ের প্রাণ,
মিথ্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দিতে হ'ল বলিদান!
তার হয়ে আজ প্রার্থনা মোর তোমার চরণে আজি,
অত্যাচারীর করো গো বিচার, হও হে নিঠুর কাজী!

যে পিতার আশা আজ হ'ল শেষ মগ্ন পুত্রশোকে,
অসৎ নীতির প্রতিবাদী হয়ে আঘাত নিল যে বুকে!
তার হয়ে আজ প্রার্থনা মোর তোমার চরণে আজি,
সত্যের সুধা নিভৃতে ভরুক, সকল মিথ্যা সাজি!

যাত্রাপথের গান

কমলপ্রিয়া রায়

জীবনের পথে যেতে যেতে
যখন সব থেমে যায়
কবিতা, গান, রচনা, অনুভব...
তখন তুমিই এসে
আমার হাতটি ধরো
আবার নিয়ে চলো
আমাকে তোমার পথে –
ফিরে পাই আমার আমিকে
ফিরে পাই তোমাকে
পূর্ণ হয় আমার গান
শান্ত হয় হৃদয় –
বড় গভীর সে অনুভূতি
বড় সুন্দর সে প্রীতি
সেখানেই তোমার সাথে
আমার মিলন
সেখানেই বিশ্বের সাথে
আত্মার বন্ধন
সেই বন্ধন নিয়েই
আজ আমার পথচলা
সেই তো আমার
যাত্রাপথের গান।

একটা জন্ম

সুপর্ণা বসু

একটা জন্ম বাঁধা পড়েছিল
কৃষ্ণচূড়ার গায়ে বৃষ্টি লেপ্টে।
মুগ্ধতা শাখা ছড়িয়েছিল
আকাশচুম্বী।
একটা জন্ম মায়ায় বেঁধেছিল
তন্বী শরীর।
নিটোল অজুহাতে,
মক্ষী স্পর্শ করেছিল পরাগ।
কলিং-বেলের ঘন্টাধ্বনি
শুনেছিল হৃদয় অলিন্দ।
একটা জন্ম এলোমেলো
রক্তস্রোতে ভাসিয়েছিল
অপরিসীম আনন্দ।
তবু কখন যেন,
মন পোড়ার গন্ধ ভেসেছিল
বাতাসে।
মোটা ফ্রেমের চশমায়
মাকড়সা জাল বুনেছিল।
একটা জন্ম লুকাতে চেয়েছিল বিরহের স্লোগান।
অতন্দ্র পাহারায় রয়ে গেছে
কত স্বপ্নের মধুরাত।
স্বপ্নগুলো আজ গিলে-পাঞ্জাবির পকেটের আশ্রয়ে।
একটা জীবন ভালবাসা
খুঁজেছিল রাতভ'র।
ফিরতি পথে চোখ
খুঁজেছিল সেই চোখ আবদারে।
দুমড়ানো শরীর খুঁজেছিল
কৃষ্ণচূড়ার শক্ত ডালখানি,
একটা জীবন নিঃশব্দে
ভাসিয়েছিল প্রেম তরীখানি।

শারদীয়া

পারমিতা বসু

শরতে আগমনীর সুরতোলা এই সন্ধ্যায়
আমি শুধু নেই আমাদের কলকাতায়।
এক বছর অপেক্ষার পর মা আসবে ঘরে
তোমরা সবাই মেতে যাবে আনন্দলহরে।
আমি ভাবি একা বসে এই সুদূর শহরে
থাকলে ওখানে কত প্রোগ্রাম হতো থরে থরে,
সবাই মিলে কাটত যে দিন আনন্দলহরে।

স্মৃতি

পারমিতা বসু

দিনগুলো যায় যে বয়ে নিজের গতিতে,
স্মৃতিরা সব জমে থাকে মনের কুঠিতে।
কুঠি সে হোক যতই গহীন হারায় না যে কিছু,
কিছু স্মৃতি কখনো ছাড়ে না মোদের পিছু।
কখনো তারা মনকে ভরে আনন্দলহরে,
কোনোটা বা দুখের দিনের স্মৃতি বহন করে।
সুখ-দুঃখ দুটোই মোদের জীবন ভরে আছে,
থাকে তারা স্মৃতির ঘরে, ভুলে যদি যাই পাছে।
স্মৃতি শেখায় সুখের পরে আসতে পারে দুখ,
দুখের পরে সুখ এসে ফের ভরিয়ে তোলে বুক।

চলাচল

পারমিতা বসু

জীবনে সবই চলন্ত,
কোনো কিছু নয় অনন্ত।
পৃথিবী ঘুরছে অবিরাম,
নদীর মতোই অবিশ্রাম।
জীবনের স্রোত থামে না,
কিছুই থেমে থাকে না,
থেমে থাকে শুধু স্মৃতিরা
মনের কোণে থাকে ধরা।
মনকে টানে অতীতে
সময় কাটানো নিভৃতে।
আজকের দিন কালই হবে অতীত,
অবিরাম চলে সময়ের সঙ্গীত।

যান্ত্রিকতা

পারমিতা বসু

আজ সকালের মলিন সূর্যোদয়
আমরা করেছি পরিবেশ কালিময়,
আকাশ হারিয়েছে তার নির্মলতা
নিখিল বিশ্ব পেয়েছে যে আবিলতা।
আমাদের এই যান্ত্রিকতার দম্ভ
আজ যেন এক আকাশচুম্বী স্তম্ভ।
জানি না নিয়ে যাবে কোথায় এই বিজ্ঞান,
মানুষ কি চায় হতে আরো সুমহান।

আয়নার আলো

উদ্দালক ভরদ্বাজ

তুমি যে আয়নার মতো
আমাকে চেনাবে বলে মেলেছ স্ফটিক ডানা।
স্বচ্ছ, টানটান তোমার অমলিন হৃদয়ের কাঁচে
দেখে নিই আপনার ছায়া।

সাধ হয়
তোমার প্রতিমার পায়ে পড়ে থাকি,
সঁপে দিই সহজ অর্পণে এ জীবন,
সহস্রধার হয়ে বয়ে যাই,
তোমার শরীর গঙ্গায়...

কিছুই হয় না
শুধু শব্দের শরীরে দিই মেখে
গুঁড়ো গুঁড়ো কামনার রাশি,
ভালবাসা, স্বপ্নরাগে, বৃষ্টির মায়ায়...
ভেসে যায়, সহর্ষ ওরা
তোমার স্বপ্নের ঠিকানায়।
ছুঁয়ে আসে তোমার আনন্দ ওরা...
আমিও প্রত্যক্ষ পাই
সেই মন, ভালবাসা।

তাই লিখি,
গেয়ে রাখি গান-
একটি পাখির পিপাসা,
অলীক বাসার স্বপ্নে বিভোর...
তাই সন্ধ্যা, তাই এই ভোর
তোমার করুণার রঙে
আমায় রাঙিয়ে রাখে –
আলো হয়ে
শব্দের মায়ায়।

আজ এখন

উদ্দালক ভরদ্বাজ

এই তো মুহূর্তগুলো
চলো আঁকড়ে ধরি।
কাল গাছের ছায়ায়, ধুলোর মাটিতে
যদি ঘুমিয়ে পড়ি!

এই তো বসন্ত রাগ
পশ্চিম আকাশেও।
চলো না, দুজনে গাই, নেচে উঠি
মানা নেই হাত ধরাতেও।

কৃত্রিম মানার বাধা
মানা তো হ'ল এতদিন।
এবার যা ইচ্ছা যে ভাবুক, ভেবে নিক...
আমি উদাসীন।

উদাস দেবদারু-ছায়ায়
আজ এসেছে সেই নীল পাখি,
অনেক যন্ত্রণার ওড়াউড়ি শেষ করে
ডাকবে না নাকি?

এ পৃথিবী যন্ত্রণার
জানা তো হ'ল, আর কত?
কিন্তু সে যে শেষ সত্য, আমি মানি না;
যদি হও তুমিও সম্মত,

চলো কিছু সহজিয়া সুখ
রেখে নিই প্রাণের সোপানে।
জীবন তো ঠুনকোই, প্রেমের পেয়ালা
ভরে নিই, অনন্তের গানে!

গানের পাখি

উদ্দালক ভরদ্বাজ

আমার ভ্রান্তবীণা রইল তোমার পায়ে
এই স্তব্ধ গানে।
আমার শব্দ যত, উড়তে যদি চায়
আমি তাদের কানে –

তোমার মন্ত্র দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে যাব
যদি, তাই বলে দাও।
দূরে, তাকিয়ে যে মন উদাস হ'ল আজ
তাকে স্বপ্নে হারাও –

আমি, আমার মনে ফুরিয়ে যাব একা
চোখে জলের ফাঁকি,
তুমি একলা ঘরে হঠাৎ উড়ে এসো
আমার গানের পাখি।

পুনঃ - পাখির রূপকল্প বারবার ফিরে আসে কবিতায়, সকলের, আমারও। সেরকমই তিনটি কবিতা একত্র করে পড়াতে সাধ হ'ল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বয়সে লেখা। শেষের কবিতাটি সবচেয়ে আগে লেখা। সময়ের আকাশে ইতস্তত ওড়াউড়ি, পাখির, শব্দের, হৃদয়ের...

এখনো স্বপ্ন

ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী

সূর্যটা বুকে নিয়ে চলছি
জ্যোৎস্নায় ভিজে তারা জ্বলছে,
আকাশের বুকে আজো শূন্যে
চাঁদ বুড়ি রূপকথা বলছে।

স্যাঁতসেতে ঠান্ডায় ঘুমেরা
উঁকি মেরে আজও তাকে দেখছে
কোন মেয়ে বুকে চেপে কান্না
অভ্যাসে একা গা-টা সেঁকছে।

জানালার গরাদেও একা রাত
মুখবুজে পড়ে থাকে চুপচাপ
মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁদের সুরালাপ
জোনাকিরা দিয়ে চায় উত্তাপ।

মেহগিনি রাতটায় স্বপ্ন
দেখে চাঁদ একা হয় মগ্ন
শিশিরেতে ভেজা ভোর আসছে
হাওয়াতে খবর তার ভাসছে।

হেলেপড়া বেড়াটাকে জড়িয়ে
রোদ্দুর পড়ো তুমি গড়িয়ে
সেই আলো মেখে বসো ভোমরা
ঝিঙেফুলে দুটি পাখা ছড়িয়ে।

শিশুর স্বর্গ

স্বাতী বর্মন

ঘরে একটি ক্যালেন্ডার
ঝোলানো আছে,
সুস্থ সবল হৃষ্টপুষ্ট শিশুর
হামা দেওয়া ছবি;
১২ মাসের ১২টি শিশু |

আরেক হ'ল প্যালেস্টাইনের শিশু

দেহে মাংস নেই
হাড়ের ওপর চামড়া

গাল তোবড়ানো
চোখ কোটরাগত

বুকের খাঁচাখানি দৃশ্যমান
গালেতে শুকানো অশ্রু

দেহ কুব্জ
হাড়গুলি শরীর থেকে
বেরিয়ে এসেছে

খালি বালতি কোলে,
একমুঠো অন্নের জন্য
তারা বসে আছে,
পেটে নিয়ে শতাধিক বছরের ক্ষিদে |

যারা ভাগ্যবান
তারা পেয়েছে তরল জলে
উঁকি মারা কিছু দানাশস্য,
ক্ষুধা নিবারণের আশ্বাসে;

শুরু হয়েছে একবিংশ শতকের
শিশুহত্যার পালা |
মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষে
বিধাতা হেনেছেন মৃত্যুবাণ |

হে ঈশ্বর!
কোথায় তোমার প্রতিশ্রুত স্বর্গ,
যেখানে প্রতিটি শিশু
নিশ্চিন্তে খেলে বেড়ায়?

আজ আমরা দেওয়ালে টাঙাব
সেই শিশুদের ছবি
যারা মুখ হাঁ করে
অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

সেই দৃষ্টির প্রশ্নবাণ যেন
আমাদের বুকে সরাসরি বিঁধতে পারে

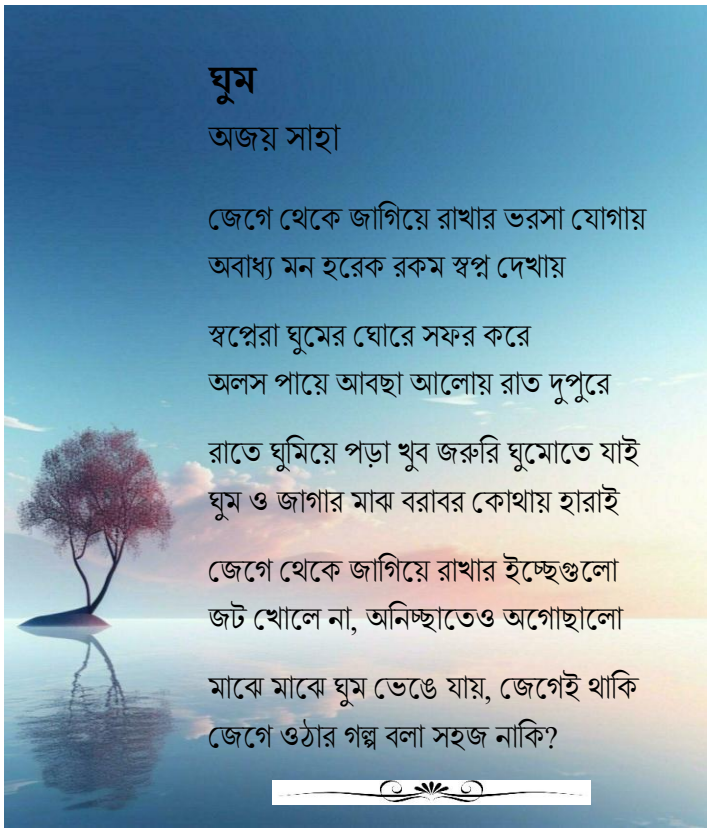

ইচ্ছা ছিল রাজা হব

রঙ্গনাথ

ইচ্ছা ছিল রাজা হব হতে পারলাম না –
বিশ্বে রাজ্য এত কম রাজ্য পেলাম না!
একবার রাজা হলে জীবন কেমন হতো?
প্রশ্নটি আমার মনে শুধু জাগে অবিরত।

নিশ্চয় আমার হতো এক প্রাসাদে বাসস্থান
শত শত প্রজাবর্গ করত কত গুণগান!
প্রহরী থাকত পাশে চব্বিশ ঘন্টা ধরে
কারো সাধ্য হতো না আমার ক্ষতি করে।

থাকত রঙিন মুকুট আর পোশাকি বাহার
বুকে থাকত পদক কটিবন্ধে মস্ত তলোয়ার।
ক্ষমতা থাকত কত! হুকুমে চালাতাম দেশ
যা বলা তাই আইন অমান্যতে গর্দান শেষ!

বন্ধুরা থাকত দূরে মনে হতো বড় একা!
বন্ধুহীন ঘোরাফেরা কপালে থাকত লেখা।
খুশী যে হইনি রাজা! আজ আমি স্বাধীন
সবার মাঝে থেকে কাটছে আমার দিন।

সুনীতি ও দুর্নীতির বাজার

রঙ্গনাথ

সুনীতি এবং দুর্নীতি বেচা-কেনা হয় –
এখন দুর্নীতি এক নিমেষে হয় বিক্রয়
এর চাহিদা অনেক, বাজারে খুব চলে;
জড়িতরা লাভবান হয় হাত বদলে।
সুনীতি কেনা-বেচায় লাভ নেই একদম
চাহিদা নেই, এটার গ্রাহকও খুব কম।
সুনীতি কিনতে জনগণ করে ইতস্তত;
বলে, পরে কেনা যাবে প্রয়োজনমতো।

দিন দিন কমে যাচ্ছে সুনীতির বাজার
কেহ সুনীতি কেনার কারণ পায় না আর।
দুর্নীতির জয়জয়কার আর সুনীতির দুর্দিন;
বাড়ছে অনাচার, দেশ-সমাজ নীতিহীন।
দুর্নীতির কালিমা আর কালো টাকা যেথা
ভোগান্তি আর সমাজের অধোগতি সেথা।
অনেকে বোঝে, সুনীতির আসা প্রয়োজন
তবু তারা কেনা-বেচায় জড়ায় না এখন।

বাংলাদেশে এরা কারা

রঙ্গনাথ

এরা কারা?
পথে-মাঠে ছিল হাজার হাজার ছাত্র-জনতা মশাল, লাঠিসোঁটা হাতে
মাথায় লাল গোল ফোঁটাসহ সবুজ ব্যান্ড বেঁধে হাঁকছিল স্লোগান হুঙ্কার –
তারা ক্রুদ্ধ, উত্তাল – হেথাহোথা আগুন জ্বালিয়েছিল, ভাঙছিল এটাসেটা –
তারা করছিল মারামারি-ভাঙচুর; নিমেষে বহু কিছু করেছিল ছারখার!
এরা কারা?
ক'টা সাধারণ দাবী নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলনে দেশের জনগণ ছিল সঙ্গী
সরকারের অপকর্মে জনগণ অসন্তুষ্ট – তারাও চেয়েছিল দুর্নীতির প্রশমন।
আন্দোলন চলতে থাকে – সংলাপ চেষ্টা ব্যর্থ – শুরু হয় পুলিসের দমননীতি
বহু মৃত-আহত, লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতার ক্ষোভ তুঙ্গে; হয় সরকারের পতন।
এরা কারা?
কচি কচি মুখ শিকারীরা দেখাত প্রচন্ড ক্ষোভ – যেন তারা খুঁজছিল শিকার
বুঝে, না বুঝে ছাত্ররা ঘেরাও করেছিল থানার অফিস – সব করেছে ধ্বংস
পুলিসদের মেরেছে বেধড়ক পিটিয়ে অথবা হত্যা করেছে আগুন জালিয়ে;
পুলিস হত্যার ব্যাখ্যা হ'ল, পুলিসের মরণ 'বিপ্লব ত্বরান্বিত করার অংশ'!
এরা কারা?
যারা জেলখানা ভেঙে করেছিল জঙ্গিদের মুক্ত, করেছিল অস্ত্র লুটপাট;
বিজয়ী হয়ে তখন চিহ্নিত শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার জন্য উত্তম সময়!
এখন শুধু দাবী নয়, তাদের বহু আকাঙ্ক্ষা, তারা করবে নানা সংস্কার –
এখন চালাবে ধরপাকড়; বিপ্লবীরা দেশকে দেবে এক নতুন পরিচয়।
এরা কারা?
দেশের, সমাজের বা অন্যের অর্থ-সম্পদকে যারা দেয়নি কোন মূল্য;
বলেছে, করবে বাতিল ইতিহাস ও অর্জন; ভাবে শুধু তারাই জ্ঞানী গুণী।
তারা যাকে-তাকে শত্রু বা শত্রুর দোসর বলে চালায় হয়রানী-অত্যাচার
ভাঙে হাত-পা, মেরে মেরে করে অজ্ঞান – মরণ ঘটাতে দেয় গণ-পিটুনী।
এরা কারা?
যারা ধ্বংস করেছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়িঘর-দোকান-কারখানা
গাড়ি-বাস, মেট্রোরেল, লাইব্রেরী, যাদুঘর – ভাস্কর্য পায়নি রেহাই।
তারা ভেঙেছে অফিস-আদালত, সুন্দর সুন্দর স্থাপনা, মাজার-মন্দির;
তারা ছিল লুটপাটে ব্যস্ত; দলিল, বইপত্র জ্বালাতেও তারা থামে নাই!

এরা কারা?
যারা বসিয়েছে একদল নেতা! নিজেরা আর নেতারা আজ দেশ চালায়;
তাদের কথায় নেতারা ওঠে বসে; তাদের ইচ্ছাতেই প্রায় সবকিছু হয়!
তারা কোন ডাক পেলে হায়েনার মতো ছুটে আসে, শুরু করে মহাতান্ডব।
ছাত্ররা আজ লেঠো-বাহিনী – স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্জন করা তাদের কাজ নয়!
এরা কারা?
যত্রতত্র ছাত্ররা চায় শিক্ষক, বিচারক, আমলা ও অফিসারের পদত্যাগ –
জবরদস্তি করে নেয় স্বাক্ষর, করে নাজেহাল, ঘেরাও হয়ে করে অপমান –
দেয় চড়-থাপ্পড়, পরায় জুতোর মালা; শিক্ষিকাকে বিবস্ত্র করে মজা পায়!
ছাত্র-সমন্বয়করা মানে না রীতিনীতি, বয়স্ক গুরুজনদের দেয় না সম্মান!
এরা কারা?
অটো পাস, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, এর-ওর পদত্যাগ চাই – দাবীর পর দাবী!
এসব দাবী নিয়ে ঘেরাও করে প্রশাসন থেকে ছাত্ররা তাৎক্ষণিক উত্তর চায়।
নবীন নেতারা অপরিপক্ক আর প্রবীণরা অতশত ভাবে না – ঝঞ্ঝাট চায় না
তরুণদের সকল দাবী মেনে নিয়ে ভাগ্য, প্রতিহিংসা ও ভবিষ্যৎ সামলায়।
এরা কারা?
ছাত্রদের দাবী, পূর্বের সরকার পতন দেশে দিয়েছে এক নতুন স্বাধীনতা –
তাই ভাবে, স্বৈরাচার ও দোসর খোঁজা তাদের যেন ন্যায্য অধিকার;
দিনরাত শত্রু খুঁজে বেড়ায়, নানা অজুহাতে করে চাঁদাবাজি, লুটতরাজ।
এখন তারা পেয়েছে এক আইন, ছাত্র-জনতার অপরাধের হবে না বিচার!
এরা কারা?
কার কী কাজ বোঝা দুষ্কর, তবে দেখা যায় ছাত্ররা সবখানে, সবার মাঝে
তারা রাস্তায় এসে মানুষ থামিয়ে অনুসন্ধান চালায়, মুঠোফোন নিয়ে নেয়
খোঁজে ফেসবুক, ইমেল, ফটো – যদি কোনভাবে শত্রু বানানো যায়;
তারা শত্রু ধরতে বাড়ি বা অফিসে গিয়ে সবকিছু ঘেঁটে তছনছ করে দেয়।
এরা কারা?
যাদের সন্ত্রাসে জনগণ শঙ্কিত! কেহ আক্রান্ত হলে তার আর রক্ষা নেই –
রোগী হোক, বৃদ্ধ হোক, নারী হোক, দোষী বা নির্দোষ, কেহ বাদ যায় না।
যাকে-তাকে যখন তখন তারা পাকড়ায়, নির্বিচারে করে জঘন্য অত্যাচার;
পুলিস-সৈন্য থাকে ছাত্রদের পিছে, তারা কাছে থেকেও দেখতে পায় না।
এরা কারা?
যারা দাবী করে, নতুন বাংলাদেশে থাকবে না আর উৎপীড়ন ও দুর্নীতি;
তারা এনেছে দুঃশাসন – করছে দুর্নীতি, বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, সন্ত্রাস
নির্মমতা, জুলুমবাজি, লুটতরাজ, দেশজুড়ে চাঁদাবাজি আর নানা দুষ্কর্ম।
এখন নেতারা টাকার কুমির; ছাত্র-জনতা আনছে বাংলাদেশের সর্বনাশ!

ফাঁকি

শঙ্কর তালুকদার

অরুণ আলোর পরশ লাগে
গাছের মাথার পরে
পাখিগুলো উড়ে উড়ে
কতই না সুর ধরে!
পাতায় পাতায় কাঁপন জাগে
কীসের কথা বলে
ফুলগুলো সব হেসে হেসে
দোলে দোদুল দোলে।

এখন আমার যাবার বেলা
শিয়রে বসে কীসের খেলা
ডাক এসেছে
শুনি মনের গভীরে।
ভোর হয়েছে
সেও শুনি মধুর গুঞ্জনে
মিছেই বসে আছ
দুয়ার খুলে।

আসন পেতে বসে রই
যদি না পাই সাড়া
প্রভাতের সূয্যিকিরণ
করবে না আর তাড়া।
পাখিরা তাই বলে
গাইবে না আর গান
ফুলেরা সব ঘাড় দুলিয়ে
করবে আনচান।

দুঃখ রাতের ব্যথা যত
দিনে দিনে হচ্ছে গত
নতুন গন্ধ,নতুন স্বাদে
শেষের পরিণাম।
হৃদয়ের যত কথা
থাক না কিছু বাকি
ডাক এসেছে যাব এবার
সেটা নয় গো ফাঁকি।

বিজ্ঞ

শঙ্কর তালুকদার

বিজ্ঞমশাই আছেন কোথায়
থাকেন কোন পারে?
আদর্শের ধ্বজা তুলে
মিথ্যে অভিসারে!
ছাত্রছাত্রী বদমাইশ সব
দেয় না পড়ায় মন
শিক্ষকেরা নেই তো ক্লাসে
শুধুই বিজ্ঞাপন।
গড়তে গিয়ে ভাঙছ কারে
টাকার লোভে বেচছ যারে
সত্য-মিথ্যা হচ্ছে ক্ষত
শুধুই প্রলোভন।
বিজ্ঞমশাই পালান কোথায়
সবই ওদের দোষ
ঠান্ডাঘরে বসে ভাব
কেন এত রোষ।
রাজনীতির কোন সে বালাই
তোমার ঘাড়ে চাপে
শিক্ষাদানের মিথ্যে বড়াই
কুরুক্ষেত্রের স্রোতে।
বিদ্যালয়ে যাঁতার কলে
উঠছে নাভিশ্বাস
শিক্ষা নিয়ে সবার মনে
কেন এত ত্রাস।
মানুষ তো নয়, পিঁপড়ের দল
সারি বেঁধে চলে
বিজ্ঞমশাই আপন পথে
দুলকি চালে চলে।

ভাঙা মুজিবর

শেলী শাহাবুদ্দিন

এত অজস্র প্রাণ পায় সে কোথায়?
এতবার মারো, তবু প্রাণ নাহি যায়।
বেজন্মা বাঙালি তাঁরে কেন ভালবাসে?
দেখে দেখে আত্মা তব কাঁপে সন্ত্রাসে।

আবার আগস্ট মাস, রক্ত তাঁর ধায়,
সিঁড়ি ভেঙে সারা দেশে অজস্র ধারায়।
রক্ত তাঁর বাঙালির বুক ভেঙে বয়,
বাংলার নদী-নালা কোটি জলাশয়।

পঞ্চাশ বছরকাল কেটেছে সময়,
কেন সেই রক্ত আজও সারা বাংলায়?
বাঙালির বুক ভেঙে দিকে দিকে ধায়?
ভাসায় বাঙালি রাষ্ট্র অজস্র ধারায়?

তোমার রক্তে জাগে উন্মত্ত পিশাচ,
তুমি অতীতের শব, ধ্বংসের নাচ।
তোমার ক্রোধের উৎস বাংলার রূপ,
ধর্মের আড়ালে তব নগ্ন স্বরূপ।

বাংলার রূপ যেন যুবতীর দেহ,
সে শুধু ভোজ্য তোমার, আর নয় কেহ।
বেয়াকুব বাঙালি জাতি জানে না তাহারে,
মা ডেকে সে পূজা করে মাটি বাংলারে।

মায়ের আসনে তারা বসায়েছে যারে,
সে তোমার রক্ষিতা, তুমি ভোগ কর তারে।
ধীরে ধীরে শুষে তার প্রাণ আর দেহ,
তুমি তারে ছুঁড়ে ফেল পণ্যের গেহ।

শকুনেরা ছিঁড়ে খাবে মায়েরে তোমার,
জিঘাংসা তৃপ্ত হবে হৃদয়ে তোমার।
ভোল নাই একাত্তর, লজ্জা, পরাজয়,
প্রতিশোধ এইভাবে, এই তব জয়।

ক্ষীণকায়, ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণকায় দাস,
বাঙালি গোলাম আজ সুখে করে বাস।
নাজায়েজ বাঙালি রাষ্ট্র, সহে না এ প্রাণ,
তোমার শপথ তারে বানাবে শ্মশান।

তোমার হাতুড়ি তাই আঘাতে আঘাতে,
বাঙালির পিতৃমুখ ভাঙে প্রতিরাতে।
বেজন্মা বাঙালি তাঁরে তবু ভালবাসে,
বাঙালির বুকে তাঁর ভাঙা মুখ ভাসে।

যতবার ধ্বংস করো, ভাঙো তাঁর মুখ,
বাঙালির মনে কেন বাড়ে তত দুখ?
কেন তাঁর মৃত্যু নেই, কেন সে অমর?
তোমার পিশাচ প্রাণ ভয়ে মরমর।

তোমার হাতুড়ি রাতে ভাঙে তাঁর মাথা,
রাতশেষে শোন তাঁর মৃত্যুহীন গাথা।
এতবার মারো তাঁরে, বলো 'তুই মর',
কিছুতে মরে না তবু ভাঙা মুজিবর।

বত্রিশ নম্বর

শেলী শাহাবুদ্দিন

জনকেরে যেথা হত্যা করেছ, বত্রিশ নম্বর,
তুমিই সেথায় পোড়ায়ে দিয়েছ জনকের জাদুঘর।

পোড়ায়ে দিয়েছ রক্তের দাগ, রাসেলের স্মৃতিমাখা,
শিশুহত্যার কারিগর তুমি, সেইখানে ছিল আঁকা।

হত্যা করেছ গর্ভের ভ্রূণ, বাঙালির পড়ে মনে,
সেই ঘরে তাই আগুন লাগালে বাংলার কুক্ষণে।

কে তুমি দানব, হিংস্র শ্বাপদ, কোথায় তোমার দেশ?
বাঙালি তোমারে চিনে গেছে আজ, দেখেছে ছদ্মবেশ।

জেনে গেছে তারা, পশ্চিমা তুমি, একাত্তরের ভূত,
এদেশের তুমি কভু কেউ নও, তুমি শত্রুর দূত।

যে সিঁড়িতে তুমি করেছিলে গুলি পিতার বিশাল বুকে,
পোড়ায়ে তাহারে ভাব আজ বাঙালিরে দিলে রুখে।

তুমি তো জানো না বাঙালির বুকে গেঁথে গেছে চিরতরে,
অগ্নিদগ্ধ জনকের ঘর, বত্রিশ নম্বরে।

আগস্টের অভিশাপ

শেলী শাহাবুদ্দিন

অচেনা আগস্ট মাসে চেনা ধুরন্ধর,
আমার মায়ের বুকে বসায় খঞ্জর।

অচিন ফেরেশতা যেন ধরেছে এ হাল,
বেহেশতে পৌঁছে সুখে যাবে দিনকাল।

আমি দেখি জন্মকাল, পুরনো শয়তান,
আমার মায়ের রক্ত, শুধু করে পান।

এইতো সুখের শুরু, ভাবে তব মন,
অভিশপ্ত আগস্ট আমি দেখি সারাক্ষণ।

তুমি দেখ ফেরেশতা, আর দেখ শুধু সুখ,
আমি দেখি মেফিস্টোফিলিস, ফাউস্টের মুখ।

তোমার অলীক সুখ ফাউস্টের মতো,.
তোমার আত্মারে আজ বিক্রয়ে রত।

যেন এক অভিশাপ দিয়ে গেছে পিতা,
বাংলায় আগস্ট শুধু লেলিহান চিতা।

বাঙালির পাপের শুরু, যে আঁধার মাসে,
যে পাপের গন্ধ ভাসে আগস্ট বাতাসে।

সেই পাপ ফিরে আসে সেই হিংস্র মাসে,
সেই মাস, সেই পাপ, বাঙালিরে নাশে।

রক্ত দাও

শেলী শাহাবুদ্দিন

বাঙালি রাষ্ট্র মুমূর্ষু মরমর,
বৈরী শাসক মৃত্যুর কারিগর।

প্রস্তুত করো রক্তদানের কাজ,
বাঙালি রাষ্ট্র মৃত্যুর পথে আজ।

অনেক রক্ত দিয়েছ একাত্তরে,
তিরিশ লক্ষ সন্তান গেছে ঝরে।

মায়েরে কেটেছে রাজাকার বিষধর,
উল্লাসে নাচে প্রতারক আর শত্রু গুপ্তচর।

বাঙালি রাষ্ট্র মৃত্যুর শয্যায়,
শুনি হাহাকার, দেশবাসী নিরুপায়।

মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম গেছে মরে,
মৌলবাদী শত্রুরা ঢোকে ঘরে।

মুক্তিযোদ্ধা সন্তান যদি হও,
খোদার কসম, বাংলায় কথা কও।

মায়েরে তোমার বাঁচাতেই যদি চাও,
ডাকে দেশমাতা, এখনি রক্ত দাও।

একটি উদ্দেশ্যের মৃত্যু

নূপুর রায়চৌধুরী

নিজের কাছে যে কাজ অর্থবহ,
তার অভাব বা করার অক্ষমতা
মৃত্যুরই সমান।
তখন দিন যাপন
এক চরম প্রহসন।

দেখনি বুঝি?
আশেপাশে কতই না ভূ আন্দোলন
মজা নদীতে নেই কোনো ঢেউয়ের জাগরণ
সাগরে মেশার পরিকল্পনা তার
শুধুই এক ক্রূর পরিহাস।

তামাম পৃথিবীর সান্ত্বনা
বাইরের কে কি বলে
তাতে কীই বা যায় আসে?
দিনের শেষে ঘরে ফিরে
নিজের আয়নায়
আমার আমিকে যে আর ফিরে পাই না।

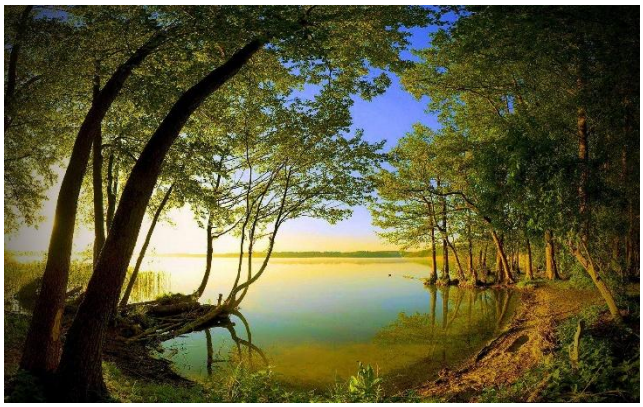

নামহীন নীরবতা

বাপন দেব লাড়ু

ঘরটা নিঃশব্দ, দেয়ালের রঙও যেন ক্লান্ত।
ঘড়ির কাঁটা চলছে, কিন্তু সময় থেমে গেছে মনে।
আমি একা, অথচ চারপাশে মানুষের ভিড়।
শব্দের ভেতরে শব্দ নেই, শুধু মৌনতার ধ্বনি।

চোখ বন্ধ করলে দেখি এক রাস্তাহীন নগরী,
যেখানে আমি নিজেই পথিক, আবার গন্তব্যও।
জানালার ওপারে আকাশ, অথচ আমার আকাশ ফাঁকা।
জীবনের প্রশ্নগুলো যেন উত্তরকে ভয় পায়।

আমার ছায়া আজকাল কথা বলে না,
আমিও আয়নায় মুখ দেখি না আগের মতো।
ভেতরের আমি কোথায় হারিয়ে গেল?
কেন নিজেকেই চিনতে পারি না মাঝে মাঝে?

নীরবতায় নিজেকে প্রশ্ন করি –
তুমি কি সত্যিই বেঁচে আছ, না কেবল একটা অভ্যাস?
চাওয়ার মতো কিছু নেই,
তবুও হৃদয়ে কেবল একটা অপূর্ণতা গুঞ্জন তোলে।

শুধু এক চিলতে আলো খুঁজি নিজের ভেতর,
যেখানে হয়তো এখনো ঘুমিয়ে আছে একজন আমি।
একটা নতুন শ্বাস নিতে চাই,
যেখানে শুরু হবে আত্মার আসল সংলাপ।

অনুরাগের ছোঁয়া

সুজয় দত্ত

মনের অথৈ ঝিলে ফোটে যত ভাবনার
পদ্ম শালুক,
বুকের ঈশান কোণে জমে ওঠা মেঘ যত
বৃষ্টি ঢালুক,
কুয়াশা-কুয়াশা ঘেরা দ্বিধা-সংশয় তবু
চলার পথে
আলোর নিশানাটুকু বারেবার ঢেকে দেয়
দৃষ্টি হতে।
ভুল হয়ে যায় দিশা, হঠাৎ সমুখে পড়ে
কঠিন প্রাকার –
ইচ্ছে জাগে না পথ আবার নতুন করে
খুঁজতে থাকার।
তবুও এগোতে হয় ভুলে গিয়ে অতীতের
বিফলতা সব –
নতুন আসার পাখি হৃদয়-আকাশ ভরে
করে কলরব।
এমনি করেই চলে আলোআঁধারির খেলা
জীবন জুড়ে,
অধরা স্বপ্ন যত কখনো কাছেতে আসে
কখনো দূরে।
নিশিদিন কত ব্যথা, না পাওয়ার যন্ত্রণা,
হারাবার ভয় –
তারই মাঝে কোথা যেন কারো তরে একটুকু
অনুরাগ রয়।

জমাট ভালবাসা

সফিক আহমেদ

রঙিন গ্লাসে লাস্যময়ীর রূপে
অন্ধকার কানা গলিতে
খুঁজেছিলাম ভালবাসাকে।
দেখতে পাইনি সবুজ ঘাসে,
নদীর ধারে, কবিতার দেশে
পড়েছিল জমাটবাঁধা ভালবাসা –
হোঁচট খেলাম জমাট ভালবাসায়
পড়তে দিলে না, সামলে নিলে আমায়
রক্তরাঙা উদভ্রান্ত চোখে চোখ রেখে
জ্বরে পুড়ে যাওয়া কপালে দিলে
শিশিরভেজা প্রেমের জলপট্টি,
ভোরের নরম আলোয়
কুয়াশার আলোয়ান জড়িয়ে
আমার আঙ্গুল ধরে
অন্ধকার গলি থেকে নিয়ে এসে
দাঁড় করিয়ে দিলে
প্রেমের রাজপথে।
শুরু হ'ল পথ চলা
পথ চলতে চলতে
রুক্ষ বাস্তবের উত্তাপে
জানি না কখন উধাও হ'ল
কুয়াশার আলোয়ান;
নিরাশার অন্ধকারে
খুঁজতে থাকলাম
তোমার আঙ্গুলগুলো।
কোথাও না পেয়ে
ফিরে গেলাম অন্ধগলিতে
দেখলাম গলে গেছে
জমাট বাধা ভালবাসা
পড়ে আছে শুধু
শুকিয়ে যাওয়া
চোখের জলের দাগ!

দূরত্ব

অযান্ত্রিক

হঠাৎ করে অনেক কাজের মধ্যে
ঝুপ করে বুকের কোনায় এসে দাঁড়ায়
একরত্তি মন খারাপ, যেন আষাঢ়ের শেষ
আর শ্রাবণের শুরুর দিকের বৃষ্টি। হঠাৎই।
এমনিই হয়, বিশ্বাস করুন কোনো কারণ ছাড়াই!
এমনটা যে রোজই হয় তেমনটা নয়।
তবে হয়, মাঝে মধ্যেই হয়। হয় এমনিই হয়।
কোনো কারণ ছাড়াই। এমনি এমনি।
আর ঠিক তখনই নিঃসঙ্গতা দেখায় তার আশনাই।
স্মৃতির আরশিতে ফুটিয়ে তোলে কোনো এক মুখ,
আলগোছে গুমোট বাতাস কানের কাছে এসে
ফিসফিসিয়ে বলে যায় কোনো নাম।
তবে এমনটা নয় যে সে মুখ বা নাম
কোনো দূর সম্পর্কের প্রেমিকার বা প্রেমিকের।
সে নাম হয়তো কোনো বন্ধুর, বান্ধবীর,
বা নেহাতই প্রাণের কাছের কোনো মানুষের।
মনে হয়, সত্যিই তো কতদিন কথা হয়নি!
বা কতদিন দেখা হয়নি!
একবার আয়েশী ভঙ্গিতে মগজ দৌড়ায় মনে করাতে,
শেষ কবে দেখা হয়েছিল, শেষ কবে কথা হয়েছিল...
কিন্তু সেই একরত্তি মনখারাপের তাতে কী আসে যায়?
তার যা কাজ, সে শুরু করে দেয়।
হয়তো পকেট থেকে মোবাইল বের করে খোঁজায়,
সেই নাম, সেই নম্বর, যার সাথে অনেকদিন...
কিন্তু শেষমেশ কিছুই আর করা হয়ে ওঠে না।
চাওয়া আর পারার মাঝখানে গজিয়ে ওঠে দেওয়াল,
কাচের মতো পরিষ্কার, কিন্তু আস্থার মতো ঠুনকো।
কিন্তু অবিশ্বাসের মতো নিরেট,
যেটাকে পার করা মোটেও সহজ কথা নয়।
গলা ছেড়ে ডাকতে গেলেও স্বর পৌঁছায় না।
পৌঁছাতে দেয় না সেই দেওয়াল।
মনে হয় হঠাৎ করে ফোন করলে কিছু যদি ভাবে!
বা যদি ভাবে আমার কিছু দরকার, কোনো সাহায্য চাই।
আমার একরত্তি মনখারাপের কথা তখন,
তখন তাকে বোঝানো কি সম্ভব? না সে বিশ্বাস করবে?
মগজের আলসেতে একটা দ্বিধার বেড়ালছানা,
আনমনে চেটে যায় নিজের থাবা।
আর কিচ্ছু হয় না।
কিচ্ছু না।
দূরত্ব মানুষকে অবিশ্বাসী করে তোলে।
আর অবিশ্বাসী মানুষরা খুব একলা হয়।
তাই না কালীদা?

শেষ কোথায়

বৈশাখী চক্কোত্তি

এক একটা দিন এরকমই যায়...
মানুষ যখন অতিমানব ভাবতে শুরু করে নিজেকে,
যখন ভুলে যায় যে সেও কিন্তু এক সাধারণ অস্তিত্ব,
অন্যের সুখ, দুঃখ, প্রেম, অভিমান তুচ্ছ ভেবে থাকে।

ঠিক সেরকমই একদিনের কথা –
যেদিন হঠাৎ তোমার চেতনায় আমার সান্নিধ্য হ'ল রিক্ত, ব্যর্থ,
যত রকমই অনুরোধ, উপরোধ করি না কেন,
কিছুতেই কিছু হয় না, প্রত্যাখ্যান হ'ল অনিবার্য, অব্যর্থ।

মেনে নিলাম, নীরব দীর্ঘশ্বাসে, শুধু এই প্রত্যাশায়,
কখনো আবার হবে গো দেখা, হয়তো মুখপুস্তিকায়,
তোমার ভাল থাকাতেই যে আমার আনন্দ,
হোক না জ্বলেপুড়ে খাক্ হৃদপিন্ড, জীবন্মৃত অবস্থায়।

বলেছিলাম কতবার, কথা বলো, কথা বলো, একবার প্রিয়,
তুমি বললে, কথা? সে তো ফুরিয়ে গেছে কবে...
ইচ্ছা নেই, বিরক্ত করো না আমায়, যাও, শান্তি দাও,
বিদায় নিলে, অশ্রুসিক্ত নয়নে শূন্যতায় ফেলে আমাকে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে তারপর, আমি ভাঙা মনের টুকরোগুলো
গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি অনেক কষ্টে, নিজেকে
হঠাৎ দেখি, মুখপুস্তিকায় তোমার দৃষ্টির দুর্নিবার দাপুটে মাদকতা,
সে মাদকতা কি ভালবাসায় একাকার অহর্নিশ ডাকছে আমাকে?

আমি বিহ্বল, জানি না আহ্বানের সঠিক ও নিগূঢ় অর্থ,
ঘর-পোড়া-গরু, আবার কি সিঁদুরে মেঘ দেখা দিল ঝঞ্ঝার আকাশে?
তোমার দৃষ্টির মাদকতায় হৃদয়াঙ্গনে স্বপ্নরাশির তুমুল তোলপাড়,
হারাতে চাই ওই দুর্বার স্বপ্নবাজের আবেগী দৃষ্টিপথে বারবার,
কিন্তু কী আছে পথের শেষে?

অন্তরকথা

বিষ্ণুপ্রিয়া

১

আবার সেই খুন খারাপি! লিন্ডা একমনে খুন করেই চলেছে। লাল আর বাদামি কোটপরা মৃতদেহগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে মাটির বিছানার ওপর। কিছুটা অনিশ্চিত অবস্থায়। ওরা যেন বুঝে উঠতে পারেনি মরে গেছে না মরে যেতে বসেছে; কারণ দেখে মনে হয় এখুনি বিদায় নিতে ঠিক মন সায় দিচ্ছে না। এক একটাকে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলছে লিন্ডা। সেজন্য রীতিমতো জোরে লাফাতে হচ্ছে, যদিও সেটা খুব কষ্টকর ওর শিরদাঁড়ার পিঞ্চড্ নার্ভের যন্ত্রণার জন্য। ডাক্তার বলেছিলেন জ্যাকেট পরে থাকতে বেশি নড়ানড়ি যাতে আটকানো যায়। কিন্তু তাতে ওর ভারি বয়েই গেছে। লিন্ডাকে আটকায় কার সাধ্য। ওর বদ্ধমূল ধারণা চীন যুক্তরাষ্ট্রকে বিনামূল্যে গ্রীষ্মের এই কমলা রঙের লণ্ঠন-মাছি রপ্তানি করেছে। বেশিরভাগ জিনিসই তো ওখান থেকেই আসে, তার মাঝে চুপিচুপি এই লণ্ঠন-মাছি চালান করেছে মার্কিনি জীবনধারাকে বিপন্ন করার জন্য। তাই ওরা এখানে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত এবং ওদের হত্যা করা হচ্ছে পুণ্য কর্তব্য। জব্দ হোক ব্যাটারা।

লিন্ডা বোধহয় ঝাঁপাঝাঁপি করতে গিয়ে কোমরে বেশ জোরেই আঘাত পেয়েছে, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে থামাতে পারেনি। লণ্ঠন-মাছিদের কবর ওর জুতোর নীচেই। অনেক রকমের মগজ ধোলাইয়ের পর সম্প্রতি একটি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে লিন্ডা; এদের দ্বারা কৃষি উৎপাদনের সর্বনাশ হয়। হয় হয়তো। তাই যেনতেন প্রকারে এদের ধ্বংস করতেই হবে। কিন্তু লিন্ডার এহেন মনোভাব পলার একেবারেই বোধগম্য হয় না। ওর মনে হয় এসবের পেছনে আরো কিছু গুরুতর জটিল ব্যাপার লুকিয়ে আছে। কোনো না কোনো গভীর গোপন ষড়যন্ত্রের গন্ধ জড়িয়ে থাকে ওর কথাবার্তায়। পলা অনেক সময়ই সেটার আঁচ পায়।

- "এদের দেখলে কোনভাবেই মাথা ঠিক রাখতে পারি না বুঝলে? কী করে যে তুমি অমন উদাসীন থাকতে পারো পলা, যখন হাঁটতে বেরোও, আমি বুঝি না। যেন ওদের কোনো অস্তিত্বই নেই তোমার জগতে। মনে রেখো ওরা কিন্তু ভাইরাসের মতো সর্বত্র আছে। জানই তো, সেটাও ওই চীনেদেরই উপহার। সাবধানে চলাফেরা কোরো কিন্তু তুমি। কখন কীভাবে আক্রান্ত হবে, কেউ বলতে পারে না। নিজেকে বাঁচানো খুব জরুরি। যদিও যীশু সব দেখেন, সব বোঝেন।"

- "কী মুশকিল; পৃথিবীজোড়া নানারকম কীটপতঙ্গ, তুমি কী করে ওদের সবাইকে নির্মূল করবে, লিন্ডা? পোকামাকড়বিহীন মাটি হয় নাকি কখনো? অসম্ভব আজগুবি প্রস্তাব এটা। সবকিছু নিয়েই তো মানুষের পথচলা ও জীবনযাপন। সবটা মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়। অত আক্রমণাত্মক হলে চলে নাকি? সহ্যশক্তি মহাগুণ, সেটা কাল্টিভেট করা ভাল। তাছাড়া অমরত্ব নিয়েও তো বসে নেই আমরা! কিছু না কিছু তো হবেই রে বাবা!"

- "জানি, জানি, তবুও চেষ্টা করতে হবে, তাই না? সুন্দর একটি পৃথিবী চাই যেখানে শুধু আমরা থাকব।"

- "সে আবার কী? এই আমরাই বা কে? যত্তোসব এলোমেলো বোধবুদ্ধি। তা এতই যদি অসুবিধা, গাছের গায়ে একটা লণ্ঠন-মাছি ধরার ট্র্যাপ ঝুলিয়ে দিলেই তো হয়। অ্যামাজনে আখচার পাওয়া যায়। তা একটা কিনলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বেচারাদের ইহকাল আটকে যাবে বরাবরের মতো। পরকাল তো অলরেডি ঝরঝরে। প্রবলেম সল্ভড্।"

- "আর যেগুলো গাছের থেকে দূরে তোমার আমার চারপাশে ঘুরঘুর করছে, তাদের কী করে নিপাত করব? নাহ! তারচেয়ে এই ভাল। দেখতে পেলেই নিঃশেষ করো।"

- "ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি তাই। কিন্তু তা হলেও তো লক্ষ লক্ষ মাছি থেকে যাবে যাদের তুমি দেখা পাওনি বা পাবেও না কোনদিন।"

- "তা ঠিক। কিন্তু আমার যা করনীয়, তা আমি করব। আজে-বাজে অকেজো কীটনাশক ব্যবহার করে কোন লাভ নেই। তাছাড়া আমি তো আর পাখা নই যে বনবন করে ঘুরে ওদের উড়িয়ে দেব। চিরাচরিত পুরনো প্রথাই উপযুক্ত। আমি মনে করি সব পোকামাকড় খতম করতে হয় নিজেদের সুবিধার জন্য।"

২

লিন্ডাকে বোঝানো মানে ভস্মে ঘি ঢালা। কোনো লাভ নেই। এক চুলও তাকে নড়ানো যাবে না এইসব নানাবিধ বদ্ধমূল ধারণা

থেকে | ওর কাছে লণ্ঠন-মাছি মারা যেন চীনকে ধ্বংস করা | একপ্রকার আক্রোশ মেটানোর প্রচেষ্টা | প্রাচ্যের এই পুরাতন দেশের ইতিহাস, ভূগোল বা সংস্কৃতি সম্পর্কে লিন্ডার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই | নিজের ছোট্ট গন্ডির বাইরে খুব একটা কিছু জানার প্রয়োজনও নেই তার | দিব্যি তো জীবনের অনেকখানিই কেটে গেছে এই ছোট্ট বৃত্তের ভেতর | মুক্ত আকাশের নিচে গলি থেকে রাজপথে পা ফেলার কোনো যুক্তি নেই | কোনো মানেই হয় না অত দরজা জানালা খোলার | এই বেশ |

লিন্ডা নিজের গাড়ির ট্রাংকের ওপর একটি শিশু পদযুগলের স্টিকার লাগিয়ে রেখেছে | ঠিক যেন কোজাগরীর দিন মা লক্ষ্মীর দুটি পা দরজার গোড়ায় আঁকা | তবে তার নীচে লেখা "Equal Rights for Babies in the Womb"| যে আসেইনি তার অধিকার নিয়ে মাতামাতি, আর এদিকে চারপাশে মানুষের ন্যায্য অধিকার নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই! মাঝে মাঝে প্রমীলার, অর্থাৎ পলার ভারি অবাক লাগে ভাবতে যে এমন প্রোলাইফ মানুষই আবার অস্বাভাবিক উল্লাস অনুভব করে প্রাণীহত্যা করে | এই কয়েক বছর আগে পর্যন্তও যখন ওর স্বামী থাকত ওর সাথে, তখন সবাই মিলে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত হরিণ শিকারে বেরোত | ঘোড়ার পিঠে চড়ে ব্রিচেস আর কাউবয় বুট পরে শিকার করত আশপাশের জঙ্গলে | তারপর পালা করে হরিণদেহ কাটাকাটি করে মাংস ভাগ বাটোয়ারা করে ফ্রীজার বোঝাই করে রাখত | হটডগ চাইলে বিশেষ বুচারের কাছে পেনসেলভেনিয়ায় যেতে হতো | ভেনিসন অত্যন্ত সুস্বাদু যে | শীতকালের বরফে যখন শিকার করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে তখন যাতে রোজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্গ্যানিক হাই-প্রোটিন ডায়েট জোটে তাইজন্যই এই শিকারের ব্যবস্থা | কার্ব খাওয়া মানেই অসুখ ডেকে আনা | পেট বোঝাই কাঁড়ি কাঁড়ি অ্যানিমাল প্রোটিন চাই সর্বক্ষণ | পলা মনে মনে হাসে আর ভাবে শুঁটকি দিয়ে ফ্রিজ বোঝাই করার মতো ব্যাপার এটা | জল জমে বরফ হয়ে গেলেও মাছের অভাব হয় না | ড্রাই অ্যাঞ্চভি তো আছেই পাস্তার ফ্লেভার বৃদ্ধির জন্যে | বাঙালের প্রাণের খাবার শেদল লইট্টা চিংড়ি আর চাপা শুঁটকির মতন | দেদার প্রোটিন ও ফসফরাস | এছাড়া একগুচ্ছ মুরগি আর টার্কি পুষে বিশেষ একদিন একদল শিকারী বন্ধু পরিবার মিলে পোল্ট্রি-জবাই উৎসবের আয়োজন করত লিন্ডা | অবারও ভাগাভাগি করে সারা বছরের ফ্রোজেন পোলট্রি প্রস্তুত | এখন এখানে একা একা সেসব মজা বাদ পড়েছে বলে বড় আক্ষেপ লিন্ডার | জীবনের অনেকখানি রস শুকিয়ে কাঠ হয়েছে | ফ্যাকাশে চারপাশ | শিকারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে অ্যাডরিনালিন এমনিতেই পাম্প হতে থাকে সারা শরীরে | এক সাংঘাতিক হাই মানসিক অবস্থা | ম্যারিওয়ানা নস্যি তার কাছে |

কিন্তু লিন্ডার কুকুরপ্রীতি দেখলে এই প্রবল পশু হত্যানন্দ বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে | ও আপাতত গত সাত বছর ধরে ওর জার্মান শেপার্ডের শোকে মূহ্যমান হয়ে আছে | প্রতি মুহূর্তে তাকে চোখে হারায় | ওয়ালেটে তার ছবি নিয়ে ঘোরে | ড্রেসারের ওপর ছেলে মেয়ের ছবির পাশাপাশি রাখা আছে তার ছবি | ম্যাক্সিম দ্য বিগ ডগ ওর হিরো ছিল | সন্তানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় | কিন্তু ভয়ংকর ঝঞ্ঝাট করেও বিবাহ বিচ্ছেদের সময় তাকে পায়নি লিন্ডা | কেনেথ কিছুতেই ম্যাক্সিমকে আলাদা করবে না নিজের থেকে | সেজন্য অবশ্য লিন্ডার কাছে ওর প্রাক্তন স্বামী কেনেথের কোনো ক্ষমা নেই | এত বছরে না জানি কী হয়েছে | বেঁচে আছে ম্যাক্সিম নাকি রামধনু ব্রিজের ওপারে চলে গেছে, কে জানে! বড় কুকুরদের আয়ু যে কম হয় | চোখ চিকচিক করে ওর কথা ভাবলেই | লিন্ডার ওপর তখন মায়া হয় পলার | ভাবে আহা, সন্তানহারা মায়ের বুকে বড় ব্যথা | হাঁটতে বেরোলেই তাই ডগ পেরেন্টদের থামিয়ে তাদের কুকুরদের আদর আহ্লাদ সেরে তবেই এগোবে লিন্ডা | কতবার পলাকে বলেছে যদি কোনোদিন আগের মতো একটা ব্যাকইয়ার্ডসহ বাড়ি জোটে ওর কপালে, ও ঠিক বিশাল এক কুকুর পুষবে | এসব এক চিলতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রুমিং হাউসের পুচকে ঘরে অসম্ভব | বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে এখানে উপায় নেই বলে, তাই বলে যাপন আর মূল্যবোধ কি পুরোপুরি পালটানো যায়! লিন্ডা যে মিল্ড্রেডকে সহ্য করে সেটাই যথেষ্ট |

৩

সে আবার আরেক গোলযোগ | একে তো মিল্ড্রেড সমকামী, তার ওপর আবার কৃষ্ণাঙ্গী | তাই শুধু নয়, ওর ডোমেস্টিক পার্টনার মেরিবেথ প্রতিবন্ধী | হুইলচেয়ার ছাড়া অচলাবস্থা | খুব প্রচ্ছন্নভাবে এড়িয়ে চলে লিন্ডা ওদের | অপছন্দ করার ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও সূক্ষ্মভাবে তির তির করে বয়ে

চলে মনজমিনে। পলার সাথে অবশ্য ওদের দিব্যি আড্ডা জমে; শীতের সময় কমন লিভিংরুমে ফায়ারপ্লেসের পাশে আর গ্রীষ্মে বারবিকিউ গ্রিলের ধারে। ঝুলিভরা গল্পের ভান্ডার ওদের।

মেরিবেথ বাচ্চাদের গান শেখাত এক সময় আর মিল্ড্রেড শপরাইটে বেকিং সেকশনে কাজ করত। ওদের আলাপ-ভাব-ভালবাসা লোকাল ব্যাপটিস্ট চার্চের সদস্য হবার পর। আর সে জন্যেই হয়তো দুই মহিলা অত্যন্ত সহ্যশীল ও ক্ষমাশীল। কী অপূর্ব গস্পেল গায় মেরিবেথ। অমন দরাজ কণ্ঠস্বর কমই শোনা যায়। মন ভরিয়ে দেয় এই চমৎকার দুটি মানুষের সঙ্গ। পলার হাতের পাটিসাপ্টা দুজনের ভারি পছন্দ। প্রতি বছর থ্যাংক্সগিভিং-এ তাই আবদার করে মেরিবেথ।

- "পলা তুমি নিশ্চয়ই এবারও তোমার সেই অসাধারণ থিন ক্রেপস্ উইথ কোকোনাট ফিলিং পরিবেশন করবে? ইটস্ এ টেস্ট অফ হেভেন সুইটহার্ট। অপেক্ষায় আছি কিন্তু।"

- "কিন্তু একটিই শর্ত – প্রাণ ভরিয়ে গস্পেল শোনাতে হবে!"

- "ডান!"

মেরিবেথ হেসে হুইলচেয়ারে বসেই হাই ফাইভ করে।

৪

ওরা সবাই এই সিনিয়ার রুমিং হাউসে একটি করে বাথরুম সংলগ্ন নিজস্ব ঘরে স্বল্প ভাড়ায় থাকে। যারা গাড়ি চলায়, তাদের জন্য পার্কিংলটে অনেক জায়গা। ভাগ্যিস হাউসিং লটারিতে নাম উঠেছিল, তা না হলে এই মুদ্রাস্ফীতির বাজারে কী যে হতো কে জানে! ওয়েটিং লিস্টে বসে দিন গুনতে গুনতে বছরের পর বছর চলে যেত। সীমিত পেনশনের ডলারে কীভাবেই বা ম্যানেজ করত পলা? সেভিংসই বা কোথায়? কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায়। ঠাকুর আছেন, তাই তাঁর করুণার বর্ষণও হয়। এখানে লিভিংরুম আর সব অ্যাপ্লায়েন্সসহ বিরাট কিচেন, সবার জন্য অবশ্য একটাই। মিলেমিশে সুবিধা অসুবিধা মাথায় রেখে সবাই নিজের রান্নাবান্না করে নেয়। বেশিরভাগই হয় বেক বা গ্রিল কিম্বা ফ্রোজেন খাবার মাইক্রোওয়েভে গরম করে খায়। তার সাথে ফল আর প্রচুর স্যালাড। পলা শুধু সপ্তাহে একদিন নিজের মতন কিছু সবজিপাতি, ডাল, ডিম আর চিকেন স্টোভটপে রান্না করে নেয়। বাঙালির জিভের স্বাদ বিদেশ বলে তো আর সম্পূর্ণ বদলে যাবে না! যা খেয়ে ছোট থেকে বড় হয়েছে, সেটাই কম্ফর্ট ফুড। তবে রুই-কাতলা-পাবদা-ইলিশ আর ছোট মাছের বিলাসিতা ত্যাগ করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে যখন মাছ মাছ করে প্রাণ ছটফট করে তখন বেরিয়ে পড়ে জ্যাক্সন হাইটসের উদ্দেশ্যে। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে... জমিয়ে আনন্দ বাংলাদেশীদের রেস্তোরাঁয়।

লিন্ডা বাদে অন্য কেউ পলার রান্নাবান্না নিয়ে আপত্তি করে না। মশলার গন্ধে নাকি লিন্ডার মাইগ্রেন হয়। তাই পাবলিক লাইব্রেরী বা শপিং মলে চলে যায় যেদিন রান্নার গন্ধ পায়। এদিকে পোর্টোরিকান হুয়ান পলার স্পাইসি খাবার দাবারের খুব ভক্ত। নরম তুলতুলে ছানার কোফতা শেয়ার করলেই বৃদ্ধ একগাল দন্তহীন হাসি নিয়ে আশীর্বাদ করে ইন্ডিয়ান চীজ বল পেয়ে। টিমের (আইরিশ) লুচি আর সাদা আলুর ছেঁচকি আর লেবানীজ মিরিয়ামের সেমাইয়ের পায়েস খুব পছন্দ। আর মুসুর ডাল অর্থাৎ লেন্টিল সুপ বরিসকে বাদ দিয়ে তো কখনই খাওয়া যাবে না। মিল্ড্রেডের কেক, পেস্ট্রি, মাফিন অবশ্য সর্বদাই সুপার হিট! বেশ লাগে সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকতে। কেউ কারুর ওপর নির্ভর না করে দিব্যি আছে একাকিত্বকে তুড়ি মেরে। যাদের ছেলে মেয়েরা নেমন্তন্ন করে থ্যাংক্সগিভিং-এ বা খ্রিস্টমাসে তারা কয়েকদিন নাতি নাতনিদের সাথে হৈহৈ করে ফিরে আসে বাসায়। শূন্য ঘর আবার ভরে ওঠে।

৫

কাল বিকেলে হেঁটে ফেরার পর থেকে আর দেখা হয়নি লিন্ডার সাথে। ডিনারে স্যান্ডুইচ খাবে বলে টেস্টি সাব থেকে লিন্ডা হ্যাম সালামি চীজ সাব, চিপস্ আর কোক নিয়ে বাড়ি ফিরল। পলা নিল টুনা মেল্ট। শোবার ঘরের রিক্লাইনারে আধশোওয়া হয়ে নেটফ্লিক্সে ইন্টারেস্টিং এক টার্কিশ সিরিজ দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে মনে পড়ল আজ বিকেলে লিন্ডাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। চারটেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। চোখ ডায়েলেট করবে বলে নিজে ড্রাইভ করতে পারবে না লিন্ডা। লাঞ্চের পর ২:৩০ নাগাদ ওকে রেডি হয়ে নিতে বলবে পলা। কিন্তু তার আগেই দুটো নাগাদ হৈহৈ পড়ে গেল। প্রথম চোখে পড়েছে মেরিবেথের। হুইলচেয়ার চালিয়ে কিচেনের দিকে যেতে গিয়ে দেখে লিন্ডার ঘরের দরজা খোলা এবং লিন্ডা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওর ডান হাতের ঈগল ট্যাটু যেন আরো জ্বলজ্বল করছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে ওকে

ডাকাডাকি করে ওঠাতে গিয়ে টের পেয়েছে ঘরে একটা বুনো গন্ধ, ঠিক স্কাঙ্কের মতন। শিগ্গির মিল্ড্রেডকে ডেকে এনেছে। ড্রাগ ওভারডোজ। মিল্ড্রেড বহুবার ওর ভাইকে প্রাণসংশয় থেকে বাঁচিয়েছে, তাই অনেক অভিজ্ঞতা ওর। মিল্ড্রেড এসেই নাকে নারক্যান দিয়ে লিন্ডার প্রাণ ফিরিয়েছে। বরিস ও পলা সমান তালে সিপিআর করেছে। ততক্ষণে ৯১১ও পৌঁছেছে। যেহেতু লিন্ডা রেসপন্ড করেছে এবং হাসপাতালে যেতে রাজি নয়, তাই রিপোর্ট ডক্যুমেন্ট করে ৯১১ ফিরে গেছে। সময়মতো প্রশাসনের কানে পৌঁছে দেবে ব্যাপারটা।

কী কেলেঙ্কারি! এই সিনিয়ার রুমিং হাউসে ভয়ংকর কড়াকড়ি নিয়ম। ধুমপান বা ড্রাগ সেবন একেবারে নিষিদ্ধ, যদিও রাজ্যে উইড বৈধ। সেটা লিন্ডার খুব ভালই জানা আছে। মদ্যপান বারণ নয় অবশ্য। তাই ওরা সবাই অল্পবিস্তর সোশ্যাল ড্রিংকিং করেই থাকে কোনো উৎসবের দিনে। কারুরই রোজ মদ্যপানের অভ্যেস নেই। কিন্তু সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজ এখানে এই প্রথম।

লিন্ডার জন্য দুশ্চিন্তায় পলা হাইপারভেন্টিলেট করতে আরম্ভ করেছে এবার। এর পরিণতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানা নেই। কী করে যে ওকে বাঁচাবে বুঝে উঠতে পারছে না। সবাই মিলে যদি ওর পক্ষ নিয়ে বোঝায় যে এটি প্রথম এবং শেষবার; ভুল তো মানুষ মাত্রই হয়, তবে যদি অল্পের ওপর দিয়ে যায়। একটা সেকেন্ড চান্স দেয় ওকে। রুমিং হাউস ছাড়তে বাধ্য করলে কোথায় যাবে অসহায় মহিলা যার আর্থিক পুঁজি প্রায় নেই বললেই চলে? তাছাড়া এভিকশনের বিশ্রী পরিণতি হয় ক্রেডিট হিস্ট্রির ওপর। পরবর্তীতে বাড়ি ভাড়া পাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হতে থাকে। তকমা এঁটে যায় কপালে। বিস্তর সময় লাগে তাকে ঠিক করতে।

হঠাৎ পলা আর মিল্ড্রেডকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল লিন্ডা। বিলাপের মতো শোনাল কথাগুলো।

- "ওরা ম্যাক্সিমকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলল। আমার আর কেউ নেই। কষ্টের সেই বিচ্ছিরি ছবিটা পাঠিয়েছে আমায় কেনেথ।"

- "আহা রে, বড় দুঃসহ এই যন্ত্রণা! একদিন তো যেতেই হয়, তাই না? কেনেথ হয়তো মনে করেছে এটা তোমায় জানানো দরকার।"

- "আমায় না জানালে কী হতো? ছবিটা না দেখলে তো ঘুমোতে পারতাম। এও লিখেছে, আমি যেন শেষ বয়সে টাইলারের কাছে মনট্যানায় বা ডেবির কাছে হাওয়াইতে চলে যাই। কেনেথ তাহলে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে ওর গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে।"

- "সেটা তো ভালই বলেছে, লিন্ডা। তোমার ছেলে তো পার্ক-রেঞ্জার। মনের আনন্দে বেশ ঘুরে বেড়াবে গ্লেসিয়ার ন্যাশানাল পার্কে।"

আর্তনাদ করে আবার কান্নায় জড়িয়ে গেল লিন্ডার গলা।

- "ওরা বলার কে আমি কোথায় বা কীভাবে থাকব? আমার অধিকার আছে আমি কেমন জীবন বাছব নিজের জন্য। আই অ্যাম এ জার্সি গার্ল, পলা। আমাকে প্লিজ যেতে দিও না পান্ডববর্জিত মনট্যানায়। আমি মরে যাব ম্যাক্সিমের মতো। তাছাড়া টাইলারের গার্লফ্রেন্ড পছন্দ করে না যারা বন্য জীব-জন্তুদের শিকার করে। ওরা জঙ্গলের পুজো করে যীশুকে বাদ দিয়ে। আমি কিছুতেই যাব না ওই বিগ স্কাই কান্ট্রিতে টাইলারের হবু নেটিভ-আমেরিকান শ্বশুরবাড়ির আশেপাশে। ওর দাদু দিদারা রিজারভেশনে থাকে।

আর ডেবির কাছে ওয়াইকিকিতে – কক্ষনো না। মারাত্মক এক্সপেনসিভ! হাতজোড় করে ঝুঁকে ঝুঁকে অত 'আলোহা'ও বলতে পারব না সর্বক্ষণ। তোমাদের ছেড়ে ওসব জায়গায় থাকতেই পারব না। জার্সি ছেড়ে কিছুতেই নড়ব না।"

এবার স্পষ্ট হ'ল ম্যারিওয়ানা সেবনের আসল কারণ। সবার মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে কিছু না কিছু ভীতি ও অস্বস্তি। সেটা এক ধরনের ডীপ সীটেড insecurity। সব মানুষই তাই নিজের মতো করে দুঃখ কষ্টকে প্রসেস করে। কোপিং মেকানিজম হিসেবে কে কী বেছে নেয় বোঝা শক্ত। কিন্তু লিন্ডা এটুকু জানে দ্বিতীয়বার এখানে নিয়ম ভাঙলে ওই ওয়াইকিকি বা মনট্যানায় নির্বাসন ছাড়া গতি নেই। তখন হবু পুত্রবধূর কী মনোভাব হবে ভেবেই অস্থির লিন্ডা। জাপানী জামাইও প্রচন্ড যোগাসন আর মাইন্ডফুল মেডিটেশন করে।

এরপর এখানে ওকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। দরকার পড়লে ডিটক্সেও যেতে রাজি লিন্ডা। কারণ ওয়ান্স এ জার্সি গার্ল অলওয়েজ এ জার্সি গার্ল। হুম, সাধে কি আর বলে টলারেন্স কাল্টিভেট করার অনেক সুবিধা! লিভ অ্যান্ড লেট লিভ!

সিধুজ্যাঠার সঙ্গে সিনসিন্যাটিতে

সুজয় দত্ত

"তুমি কি মুকুল ধর নামক ছেলেটির বিষয়ে প্রশ্নটি করছ?" প্রশ্ন শুনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যে সশ্রদ্ধ আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে তাকালেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে, সেটি তিনি পরিচালক মানিকদার নির্দেশে করে থাকতে পারেন, কিন্তু আমরা দর্শকরা হারীন্দ্রনাথের ওই কথাটি এবং পরবর্তী সংলাপগুলো শুনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এক ধরনের বিস্ময় মিশ্রিত সমীহ অনুভব করতে শুরু করি তাঁর অভিনীত চরিত্রটির প্রতি। তিনি গোয়েন্দাগিরিতে নামলে ওই পেশার অনেকেরই যে আর পসার থাকত না, ফেলুদারূপী সৌমিত্রের মুখে একথা শোনার পর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি যা বললেন তা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মনে তাঁর চরিত্রটিকে এক বইমুখো সবজান্তা জ্যাঠা থেকে একজন নিরাসক্ত প্রাজ্ঞ দার্শনিকে রূপান্তরিত করল।

তিনি অনেক কিছু করলেই অনেকের পসার থাকত না – সেকথা তিনি জানেন। জেনেও কিছুই করেননি তিনি, শুধু মনের জানলা খুলে বসে আছেন যাতে বাইরের আলোবাতাস এসে মনটাকে তাজা রাখে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থলিপ্সা যশলোভ এমন মানুষের কাছে লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা পায় না, তাদের মেকি অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে পড়ে। প্রদোষ মিত্রকে তিনি উপদেশ দেন, একজন গোয়েন্দা হিসেবে যদিও মানুষের মনের অন্ধকার দিকগুলো নিয়েই তার নিত্য কারবার, সে যেন নিজের মনকে কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে না দেয়। গোয়েন্দা প্রবরকে সেযাত্রা রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হয় সেই বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটির কাছে যে তার মনও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত।

এই বিশেষ চরিত্রটির নাম যে সিধুজ্যাঠা, তা ফেলুদা-প্রেমীদের অন্ততঃ না বলে দিলেও চলবে। সত্যজিৎ রায়ের প্রায় তিন ডজন ফেলুদা-কাহিনীর মধ্যে এই গল্পটিতে, অর্থাৎ 'সোনার কেল্লা'-তেই চরিত্রটির প্রথম আবির্ভাব। ফেলুদার তারা রোডের (পরে রজনী সেন রোডের) আস্তানা থেকে অল্প কয়েক মিনিটের হাঁটা দূরত্বে সর্দার শংকর রোডের এক সাদামাটা বাড়িতে মগ্ন সাধকের মতো অনাড়ম্বর জীবনযাপন তাঁর; অকৃতদার। ঘর-সংসার বলতে একরাশ বই আলমারিতে, টেবিলে, তক্তপোশে। ভোরে নিয়মবাঁধা প্রাতঃভ্রমণ আর দুপুরের নাওয়া-খাওয়া ছাড়া দিনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে তাদের সঙ্গেই। বিভিন্ন পত্রিকা আর খবরের কাগজ পড়েন, নানারকম উল্লেখযোগ্য-অনুল্লেখযোগ্য খবরের পেপার কাটিং সযত্নে রেখে দেন মোটা মোটা ফাইলে। সারাজীবনই কি তাঁর তাহলে এভাবেই কেটেছে? না, জানা যায় তিনি একসময় নানারকম ব্যবসাপাতি করেছেন, আর্থিক লাভ-লোকসানের মধ্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্যের মোহে জড়িয়ে ওই জগতেই পাকাপাকিভাবে বাঁধা পড়ে যাওয়ার পাত্র তিনি নন। কোনোরকম কাজেই নিজেকে বেঁধে ফেলতে চান না তিনি, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছেমতো নিজের সময় খরচ করতে পারাটা তাঁর কাছে আর্থিক সচ্ছলতা বা পেশাগত নামযশের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। মৌলিক চিন্তাভাবনা করা, প্রথাগত পেশার গড্ডলিকা প্রবাহে না ভেসে অন্য সকলের থেকে একটু আলাদা কিছু করা, বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও পরিসর দেওয়া – এগুলোই সবসময় তাঁর অগ্রাধিকার তালিকায় ওপরের দিকে। জীবিকানির্বাহ নয়।

এই সিধুজ্যাঠার কাছে কিন্তু ফেলুদা শুধু পুরনো খবরের খুঁটিনাটি বা গোয়েন্দাগিরির জন্য দরকারি নানারকম তথ্যই পায় না। তার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব আর বিবেকের উৎকর্ষবর্ধক নানা উপদেশও তিনি দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ এক ধরনের moral compass-এর ভূমিকায়ও দেখা যায় তাঁকে। তিনি ফেলুদাকে স্মরণ করিয়ে দেন, গোয়েন্দাগিরির পেশায় বেশ কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে যেগুলো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আর অপরাধ মানে শুধু মানুষ খুন নয়, দেশের নানা ঐতিহাসিক স্থাপত্যের গা থেকে দুষ্প্রাপ্য মূর্তি খুবলে মোটা টাকার বিনিময়ে বিদেশে পাচার করাও একইরকম ঘৃণ্য অপরাধ। গোয়েন্দাগিরি শুরু করার আগে পেশাটির ইতিহাস ভাল করে পড়ে নিলে কাজে আনন্দ আর আত্মবিশ্বাস – দুটোই যে বাড়বে, এমন পরামর্শ ফেলুদা সিধুজ্যাঠা ছাড়া আর কার কাছে পাবে? তপেশের পৈতৃক ভিটে যে গ্রামে, সেখানে একসময় তার বাবা-জ্যাঠাদের প্রতিবেশী ছিলেন এই ভদ্রলোক। তপেশের বাবারা তিন ভাই, মেজ-ভাইয়ের ছেলে ফেলু আর তার ছোটকাকার ছেলে তপেশ। বয়সে ফেলুদার বাবার চেয়ে বড় হওয়ার দরুণই তিনি গ্রাম-সম্পর্কে ওর জ্যাঠা, ওকে ছোটবেলা থেকে দেখেছেন। একটি

গল্পে ফেলুদার ছোটবেলার এক প্রসঙ্গ তুলে তিনি বললেন, সে একবার এয়ারগান দিয়ে একটা শালিক পাখি মেরে ওঁকে দেখাতে এনেছিল আর উনি তাকে স্নেহের বকুনি দিয়ে বলেছিলেন নিরীহ পশুপাখির প্রতি আর কোনোদিন যেন সে এরকম নিষ্ঠুরতা না দেখায়। দুজনের সম্পর্কের বাঁধুনিটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন পেশাগত ব্যস্ততার কারণে ফেলুদা অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ করতে না এলে প্রবীণ মানুষটির গলায় অভিমান ঝরে পড়ে, আর তার উত্তরে ফেলুদার মতো দৃঢ়চেতা, ঋজু চরিত্রের মানুষও ছাত্রসুলভ শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গীতে কৈফিয়ত দেয়। অবশ্য সেই অভিমান অন্যদের ওপরেও অল্পবিস্তর আছে তাঁর – বুড়ো মানুষটার কেউ তেমন খোঁজখবর রাখে না বলে । তবে তিনি কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য কারুর ওপর নির্ভরশীল নন। ফেলুদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মূলতঃ স্নেহ-ভালবাসার, প্রশ্রয়ের আর বন্ধুত্বের। অভিভাবকসুলভ শাসন বা বয়োজ্যেষ্ঠতার আনুগত্য দাবী নেই তার মধ্যে। নেই প্রজ্ঞার অহংকারও। তিনি যখন তাঁর দুই স্নেহের ভাইপোর সাধারণ জ্ঞানের বা পর্যবেক্ষণ-প্রখরতার পরীক্ষা নেন (যেমন সোনার কেল্লায় ফেলুদার কিংবা বাক্স রহস্যে তোপসের), তা-থেকে এক ধরনের ছেলেমানুষী মজাই ফুটে বেরোয়, কোনো উচ্চম্মন্যতা নয়।

গোয়েন্দাগিরিতে বাজিমাত করার সবরকম গুণই যে আছে সিধুজ্যাঠার মধ্যে, তার ঝলক মাঝেমাঝেই দেখা যায়। যেমন কৈলাসে কেলেঙ্কারি গল্পে রাস্তার পাশে চায়ের খুপরিতে চা খেতে খেতে রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়ানো সাংবাদিককে দেখেই বুঝে যান সে সিদ্দিকপুরের বিমান দুর্ঘটনাস্থল থেকেই আসছে (সে নিজে সেকথা অস্বীকার করলেও), কারণ তার জুতোয় লেগে থাকা ছাই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রখর স্মৃতিশক্তি আর অসাধারণ বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী তিনি, জ্ঞানের বিশ্বকোষ তো বটেই। পাঠকমনে প্রশ্ন জাগতেই পারে – ফেলুদার মতো একজন তুখোড় গোয়েন্দা হিরো থাকা সত্ত্বেও সত্যজিৎ তাঁর গল্পে এরকম একটি চরিত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছেন কেন? লালমোহন গাঙ্গুলীর চরিত্রটি নাহয় বৈপরীত্য আর হালকা বিনোদন (contrast and comic relief) সৃষ্টিতে কাজে লেগেছে, কিন্তু সিধুজ্যাঠা? ফেলুদা-কাহিনী যদি গত শতাব্দীতে লেখা না হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে লেখা হতো, ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ঐরকম একটা চরিত্র আদৌ দরকার হতো কি লেখকের? এই দুটো প্রশ্ন পরস্পর সংযুক্ত, তাই উত্তরও একসঙ্গে খুঁজতে হবে। আসলে, ফেলুদার কাছে এই প্রবীণ ব্যক্তিটি শুধু অভিধান বা বিশ্বকোষ নন, তার চেয়েও বেশী কিছু । পুরনো দিনের সহজ-সরল, নির্লোভ আর সত্যনিষ্ঠ জীবনদর্শনের প্রতীক, সাবেক মূল্যবোধের প্রতীক। আজকাল মুঠিফোনের দু'চারটে বোতাম টিপলেই সারা পৃথিবীর সমস্ত তথ্য তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, পুরনো পেপারকাটিং-এর ফাইল রাখার বা গাদা গাদা বই পড়ার হয়তো দরকার নেই, কিন্তু নতুন শতাব্দীতে মানুষের দ্রুত-বদলাতে-থাকা জীবনদর্শন যখন অন্ধভাবে ভোগবাদ আর সংকীর্ণ স্বার্থপরতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ও যখন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, সামাজিক গণমাধ্যমগুলোর দৌরাত্ম্যে মানুষে-মানুষে পারস্পরিক বন্ধনের সুতোগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে – তখন একজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে সিধুজ্যাঠাকে আমাদের বড্ড দরকার। আরও অনেক বেশী করে দরকার।

সোনার কেল্লায় প্রথম আবির্ভাবে সিধুজ্যাঠা ফেলুদাকে কানাডা-ফেরত নামকরা প্যারাসাইকলজিস্ট ডঃ হেমাঙ্গ হাজরার পূর্বজীবনের একটা ঘটনার হদিশ দিয়েছিলেন, যাতে এলাহাবাদে (অধুনা প্রয়াগরাজ) প্রতারক ভবানন্দ আর তার চ্যালার কুকীর্তির কথা এবং ডঃ হাজরার সেখানে গিয়ে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার কথা বলেন তিনি, যদিও পাঠক বা দর্শক তখনও জানেন না এই জুটিই গল্পের খলনায়ক হতে চলেছে। এলাহাবাদে তাদের ঠগবাজীর ব্যবসাকে তিনি তুলনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানীতে ফ্রাঞ্জ আন্তন মেসমার-এর (যিনি জৈব চৌম্বকশক্তি আর মেসমেরিজম এর প্রবক্তা – মেসমেরিজমই পরবর্তীকালের হিপ্নোটিজম বা সম্মোহনবিদ্যা) বুজরুকির কারবারের সঙ্গে। সেই প্রথম আমরা পরিচয় পাই সিধুজ্যাঠার জ্ঞানের পরিধির। এরপর বাক্স রহস্য গল্পে জানা গেল তিনি পৃথিবী বিখ্যাত সংবাদপত্র লন্ডন টাইমসের নিয়মিত পাঠক; কারণ সেখানে শম্ভুচরণ বসু নামক এক বাঙালি ডাক্তারের (যিনি একইসঙ্গে একজন শিকারী ও পর্যটক) লেখা এবং এক বিলেতি প্রকাশকের ছাপা Terrors of Terai বইটির ভূয়সী প্রশংসা বেরিয়েছিল, যা তিনি পড়েছিলেন। সেই শম্ভুচরণেরই তিব্বত নিয়ে লেখা আরেকটি অপ্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনীর পান্ডুলিপি চুরি

যাওয়াকে কেন্দ্র করে এই গল্প। পাণ্ডুলিপিটি হাতে পাওয়ার ও পড়ে দেখার জন্য সিধুজ্যাঠা এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে বেশ ভাল দাম দিয়ে সেটি কিনে নেওয়ার প্রস্তাবও দিয়ে ফেলেন। উদ্দেশ্য সেটাকে বই হিসেবে ছাপিয়ে অর্থলাভ বা যশলাভ নয়, নিজের দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে বড়াই করাও নয় – স্রেফ লেখকের নিজের হাতের লেখা থেকে তাঁর স্বভাবপ্রকৃতি আর চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে আরও স্পষ্টভাবে জানা।

গোরস্থানে সাবধান গল্পটিতে দেখা যায় ফেলুদা তার প্রিয় জ্যাঠার শরণাপন্ন হয়েছে পুরনো যুগের কলকাতার এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশদ খবরাখবর নিতে। সেই ইতিহাস বলতে গিয়ে লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের হেঁসেল অবধি পৌঁছে গেলেন জ্যাঠা। ব্রিটিশ ভারতের ইতিবৃত্তে তাঁর এই স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখে আমরা আর নতুন করে অবাক হই না। কৈলাসে কেলেঙ্কারি গল্পে ব্যাপারটা একটু উল্টে গেল। এবারে আর ফেলুদা-তোপসে সিধুজ্যাঠার কাছে নয়, তিনি নিজেই প্রবল বৃষ্টিবাদলা উপেক্ষা করে হাজির ফেলুদার বাড়ি। কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের দেশের প্রাচীন মন্দিরগাত্রের অমূল্য ভাস্কর্য চোরাচালানকারীদের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হওয়া-সংক্রান্ত একটি খবরে মনের উদ্বেগ আর আবেগ চেপে রাখতে না পেরে ছুটে এসেছেন সেই বিষয়ে কথা বলতে। শুধু কথা নয়, ফেলুদার সঙ্গে সশরীরে গিয়েই হাজির হলেন একটি বিমান-দুর্ঘটনাস্থলে, যার নিহত যাত্রীদের তালিকায় নাম রয়েছে ভারতীয় ভাস্কর্যের আগ্রহী ক্রেতা এক বিদেশীর। এই গল্পে দেশের প্রাচীন শিল্পকলা চোরাপথে রফতানির ব্যবসা নিয়ে তাঁর তীব্র ঘৃণা ছাড়াও যেটা প্রথমবারের জন্য সামনে এল, তা হ'ল তাঁর সুগভীর শিল্পবোধ। তাঁর মতে, মানুষ শিক্ষিত হলেই যে শিল্পকলার মূল্য বুঝবে, এমন নয়। শিল্পের প্রতি অনুরাগের জন্য চাই শিল্পবোধ।

এরপর গোলোকধাম রহস্য গল্পটিতে আমেরিকা-ফেরত জৈব-রসায়ন গবেষক নীহার দত্তের বাড়ির একটি ঘটনায় তদন্তের আমন্ত্রণ পাওয়ার পর ফেলুদা তাঁর অতীত সম্বন্ধে জানতে সিধুজ্যাঠার কাছে গিয়েই প্রথম জানতে পারে ভদ্রলোক একা গবেষণা করতেন না, তাঁর এক বাঙালি সহকারী ছিল। এই সহকারীটিকে ঘিরেই পরে গল্পের রহস্যজাল ঘনীভূত হয়। সিধুজ্যাঠা পরে কাগজপত্র ঘেঁটে ফেলুদাকে হদিশ দেন নীহারবাবু দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে দেশে ফিরে আসার পর সেই সহকারীটি অন্য দেশে কী এক অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়েছিল। গোলাপী মুক্তো রহস্যে ফেলুদাকে তার জ্যাঠা সাবধান করে দেন মূল্যবান রত্নের এক ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যে অসাধারণ কথাটি বলেন, তা জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মানুষকে ভাল বা খারাপ বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বৃথা, কারণ মানুষের মন তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল ও আলো-আঁধারিতে ধূসর। তাই গোয়েন্দাগিরিতে কারো সম্বন্ধে কোনো বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে না এগিয়ে খোলামনে নমনীয় বিচারবুদ্ধি নিয়ে এগোনোই ভাল। এই গল্পগুলি ছাড়া হত্যাপুরী নামক কাহিনীটিতে সিধু-জ্যাঠার উপস্থিতি না থাকলেও উল্লেখ আছে তাঁর সংগ্রহে থাকা কিছু অতি পুরনো পুঁথি প্রসঙ্গে।

ফেলুদার গল্প সব বয়সের পাঠক বা দর্শকের কাছে সমান জনপ্রিয় হলেও সত্যজিৎ ওগুলি লিখেছিলেন মূলতঃ কিশোর সাহিত্য হিসেবে। ফেলুদা আর সিধুজ্যাঠা – দুজনকেই কিশোর-কিশোরীদের কাছে দুই আদর্শ চরিত্রের রোল-মডেল হিসেবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন লেখক। আর তা করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের এবং রায়চৌধুরী পরিবারের অন্যদের বেশ কিছু চরিত্রবৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন এই দুজনের ওপর। পরে এই গল্পগুলির চলচ্চিত্রায়ণের সময় ফেলুদার চরিত্রটি যেমন সৌমিত্র, সব্যসাচী, আবির, টোটা, ইন্দ্রনীল প্রমুখ প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় অভিনেতারা করেছেন বিভিন্ন সময়ে, তেমনি সিধুজ্যাঠার চরিত্রটিও অনেক হাত ঘুরেছে। সোনার কেল্লায় হারীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু। তারপর মনোজ মিত্র, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্য ভট্টাচার্য্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চরিত্রটিকে স্মরণীয় ও উজ্জ্বল করে রেখেছেন। প্রতিটা ছবিতেই এই স্থিতধী, নিমগ্ন, প্রজ্ঞালোকিত প্রবীণকে দেখে পরম শ্রদ্ধায় আমাদের মন বলে ওঠে, দেখি আপনার পায়ের আঙুলগুলো।

এহেন সিধুজ্যাঠার সঙ্গে সিনসিন্যাটিতে হঠাৎই কয়েক বছর আগে দেখা। একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে। সিনসিন্যাটি হ'ল আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চহ্রদের চতুর্থটির (লেক ইরি) তীরবর্তী রাজ্য ওহায়োর তৃতীয় বৃহত্তম শহর। তেরো বছর আগে

এই ওহায়ো রাজ্যে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে আসার পর একবার সিনসিন্যাটিতে গিয়েছিলাম একটা পেশাগত কাজে | ইউনিভার্সিটি অফ সিনসিন্যাটির ঝাঁ-চকচকে ক্যাম্পাসে কয়েকজন পরিচিত ভারতীয়র সঙ্গে একটা বেশ বড়সড় ক্যাফেটেরিয়ায় খেতে গেছি দুপুরে, খেতে খেতে জমিয়ে আড্ডা মারছি, কথাপ্রসঙ্গে ভারতের নানা বিষয় উঠে আসছে | আমার ভোজনসঙ্গীরা অর্থনীতিবিদ, তারা নব্বই দশকে ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণ আর তার সাড়েতিন দশক পর আজকের নতুন ভারত কী হতে পারত, কী হ'ল না ইত্যাদি নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলতে তুলতে হঠাৎ একটা প্রশ্নে আটকে গেল | অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন উদারনীতি ঘোষণা করছেন, তখন দেশের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? আমারও ঠিক মনে পড়ছিল না – আন্দাজে বললাম, বোধহয় শংকর দয়াল শর্মা | বন্ধুরা 'রাইট রাইট' করে উঠতেই কোথা থেকে একটা গম্ভীর গলা ভেসে এল – রং; রামা সোয়ামি ভেঙ্কটারামান | আমরা চমকে তাকিয়ে দেখি পিছনের টেবিলে একা বসেথাকা এক লোলচর্ম আমেরিকান বৃদ্ধ আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন | লম্বা সাদা দাড়ি, চোখে মোটা চশমা, সামনে কফি-স্যান্ডউইচের পাশে অমর্ত্য সেনের 'দ্য আইডিয়া অফ জাস্টিস' বইটা আধখোলা | আমেরিকানরা সাধারণত অন্যের কথোপ-কথনের মাঝখানে হঠাৎ ঢুকে পড়ে না | আমরা 'ওহ, থ্যাংক ইউ' গোছের কিছু একটা বলার আগেই ওঁর ঠোঁটদুটো (এবং সেই সঙ্গে দাড়ি) আবার নড়ে উঠল, "অ্যান্ড ইন কেস ইউ আর ইন্টারেস্টেড, দ্য স্পীকার অফ ইয়োর পার্লামেন্ট অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়াজ শিভা রাজা পাটিল |" আমেরিকানরা একটা বিস্ময়-সূচক শব্দ খুব ব্যবহার করে – ওয়াও | আমার মুখ থেকেও নিজের অজান্তে বেরিয়ে এল ওটা | ইনি তো যে-সে আমেরিকান নন! চারজন উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়কে ক্যাবলা বানিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাদেরই দেশের রাষ্ট্রপতি আর লোকসভার স্পীকারের নাম? লালমোহন গাঙ্গুলীর ভাষায় মনে মনে বললাম, এঁকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে | ঝুলে পড়ব নাকি এঁর সঙ্গে? এবং পড়লামও | ডঃ সিডনি স্পেনসার জেটসন-এর সঙ্গে আচমকা সেই প্রথম আলাপের পর অনেক বছর ধরে বহুবার ফোনাফুনি, ইমেল চালাচালি আর সাক্ষাৎ হয়েছে আমার | সিনসিন্যাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন, এখন অবসর নিয়ে এমেরিটাস প্রফেসর | একসময় গবেষণার বিষয় ছিল ওরিয়েন্টাল ডেভেলপিং ইকোনমিজ মানে প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতি | ভারতীয় উপ-মহাদেশ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান | কিন্তু ওই জন্য নয়, আমি ওঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে গেলাম অন্য একটা কারণে – সারা পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে এরকম অবিশ্বাস্য লেভেলে খুঁটিনাটি খবর রাখাটা আমি কোনো দেশে আমার চেনাশোনা কারো মধ্যে কখনও দেখিনি | ইথিওপিয়া বা আইভরি কোস্টের কফির সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান কফির তফাৎ কি, বেহালার ছড় কেন পের্নাম্বুকো কাঠ দিয়ে তৈরী হয়, সুমেরু অঞ্চলের বল্গাহরিণদের মূল খাদ্য লাইকেনের পুষ্টিগুণ কিরকম, উষ্ণ সাগরজলের দুই বিশালকায় স্তন্যপায়ী প্রাণী ম্যানাটি আর ডুগং আজ লোপাট হয়ে যেতে বসেছে কেন – ইত্যাদি অজস্র প্রশ্নের (যেগুলো কিনা প্রশ্ন হিসেবে আমার মাথাতেই আসেনি কখনো) তাৎক্ষণিক উত্তর তাঁর নখের ডগায় | যখন সারা পৃথিবী করোনা অতিমারীর কবলে গৃহবন্দী, কয়েকবার ভিডিও চ্যাট হয়েছিল ওঁর সঙ্গে | আমাকে উনি বেশ পছন্দ করতেন – তার কারণ হিসেবে একবার বলেছিলেন যে আমি নাকি খুব ভাল লিসনার, আর কেউ নাকি এত ধৈর্য্য ধরে ওঁর কথা শুনতে চাইত না | তাই আমাকে নিজের জীবনের প্রায় আট দশকের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন, তার মধ্যে অধ্যাপনা বা গবেষণা-সংক্রান্ত পরামর্শও থাকত | ওই ভিডিও চ্যাটগুলোর সময় দেখতাম একটা ছোট দু'কামরার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন এই অকৃতদার প্রফেসর রাশি রাশি বই পরিবৃত হয়ে | কম্পিউটার একটা ছিল, কিন্তু তাতে দিনের খুব বেশী সময় কাটাতেন বলে মনে হয়নি | আচ্ছা, আমি তখন থেকে অতীতকাল ব্যবহার করে যাচ্ছি কেন তাঁর কথা বলার সময়? কারণটা বড় বেদনার আমার কাছে | ২০২১-এর ফেব্রুয়ারীতে কোভিড-মারণ-সংক্রমণ ছিনিয়ে নিল তাঁকে আমাদের সকলের থেকে | শেষ দিনক'টা কেটেছিল হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে একাকী, নিঃসঙ্গভাবে |

এরপর একবার যখন একটা সেমিনারে সিনসিন্যাটি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে গেলাম, একা গিয়ে বসেছিলাম সেই ক্যাফেটেরিয়ায় | জানলার পাশের সেই টেবিলটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খেয়াল হ'ল, সিডনি জেটসন আর সিধুজ্যাঠা – এই দুটো নামে কী মিল, তাই না?

কালক্রমিক চিরকালীন আধুনিক

উদ্দালক ভরদ্বাজ

বন্ধুবর বিস্ময়ের ফোন যখন এসেছিল, প্রায় দু'বছর আগে, আমি তখন সপরিবারে এবং বন্ধু-পরিবার সমভিব্যহারে টেক্সাসে

গ্যালভেস্টন, টেক্সাস

গ্যালভেস্টনের বীচ-সাইড কেবিনে সামনের ঘরে শুয়ে জানলা গলে ঘরের মেঝেতে পিছলে যাওয়া চাঁদের আলোক দেখছিলাম আর ভাবছিলাম... কী ভাবছিলাম মনে নেই অবশ্য। চাঁদের আলোর পাশ কাটিয়ে ফোন ধরে বুঝলাম বিস্ময় চায় আমি কবিতার অনুবাদ বিষয়ে একটা নিবন্ধ লিখি – কেন অনুবাদ, কীভাবে অনুবাদ ইত্যাদি। ভাল প্রস্তাব, আমি অজস্র কবিতা অনুবাদ করি, তাতে একটা আন্দাজ হয়তো হয়েছে। কখন কীভাবে কোন ভাব প্রকাশ করতে হবে, করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় কী ধরনের পরিবর্ত শব্দ ব্যবহার করে মূল কবিতার আবহটিকে ধরা যাবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটু লেখার চেষ্টা করা যেতেই পারে। উৎসাহ হ'ল, বললুম – দাঁড়া, বাড়ি ফিরে শুরু করব লেখা, তোকে জানাব।

আর জানাব! কখন যে আঙুলের ফাঁক গলে দুটো বছর চলে গেল কে জানে! ইচ্ছে থাকলে নাকি উপায় হয়। কাদের হয় কে জানে! আমার তো দেখি ইচ্ছে হলেই উপদ্রব হয়। এবারেও নানাবিধ শারীরিক এবং কর্মক্ষেত্রে নানা মৃত্যুরেখার সুবাদে আবার দিন চলে গেল। লেখা হয়নি।

কিছু কিছু অনুবাদ এবং সেই কবিতাগুলি নিয়ে দু'কথা, কখনো অনুবাদ প্রসঙ্গে, কখনো ভাললাগার কারণে, কখনো বা নেহাতই বকবক। এইসব ঘোরতর অভিসন্ধি নিয়েই লিখতে বসেছি, দেখা যাক কতদূর উদ্ধার হয়। সাম্প্রতিক কবিদের কবিতা যে একবারে পড়িনি, তা নয় কিন্তু অনুবাদের প্রেরণা তেমন পাইনি। তার কারণ কবিতা হিসেবে সেগুলির নিকৃষ্টতা নয়, বরং কবিদের অন্যান্য সৃষ্টির নিরিখে তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক কবিতা হিসেবে বেছে নেওয়ার মতো ক্ষমতা আমার এখনো হয়নি বলে। তবে ইংরেজি ভাষার কবিতার এমন অসীম ভাণ্ডার যে সেখান থেকে যাকিছু তুলে আনা যায়, তাতেই ঠিকরে বেরোয় মাণিক্যের দ্যুতি। তাই কম্পিউটারের অনুবাদ ফোল্ডার খুঁজতে গিয়ে বেছে নিলাম যুক্তরাজ্যের কয়েকজন কবিকে। কেউ বিশেষ খ্যাতনামা, কেউ ততটা নন, কিন্তু কাব্যময়তার নিরিখে কোনও কবিতা বা কবিই কম নন। এই প্রসঙ্গে বলে নিই, অনুবাদের কবিতা বাছার সময় আমার ভাললাগার ওপরেই আমি নির্ভর করি। কবিতা হিসেবে সেটি কতটা বিখ্যাত তা সবসময় মাথায় রাখি না, যদিও কিছু কালজয়ী কবিতা এতই অপূর্ব যে মনে না ধরে উপায় নেই। কবিদের কালক্রম অনুযায়ী সাজানো হ'ল। সমকালীন না হলেও প্রতিটি কবিতাই এই সময়েরও উপযোগী এবং বর্ণে-শৈলীতে-ভাবে-ভাষায় অত্যন্ত আধুনিক, চিরকালীন। অন্তত আমার তাই মনে হয়। পাঠক হিসেবে তোমাদের মত জানতে পারলে ভাল লাগবে।

থমাস ওয়াট (১৫০৩-১৫৪২):

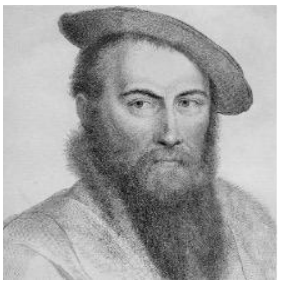

শুরু করি শুরুর কবিতা দিয়ে। ষোলশ শতাব্দীর কবি থমাস ওয়াট বেঁচে ছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বছর। এই স্বল্প পরিসর জীবনে তিনি ইংরেজি ভাষা নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, বিশেষত কবিতার ভাষা ও কাঠামো নিয়ে। রোম্যান্টিক পুনরুত্থানের পূর্বসূরি পেত্রার্কীয় আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন তিনি। ইতালীয় কবি পেত্রার্কের আদলে ইংরেজি ভাষায় সনেটকে নিয়ে আসার কৃতিত্ব অনেকেই তাঁকে দেন। যদিও মাত্রা এবং ছন্দের গঠনে ছিল তাঁর স্বকীয়তা।

অনূদিত কবিতাটি অবশ্য সনেট নয়। মনে আছে কবিতাটি করোনা মহামারী কালের এক ভ্যালেন্টাইন দিবসে অনুবাদ করেছিলুম। এই মহামারী আমাদের অনেকটা পিছিয়ে

নিয়ে গিয়েছিল শতাব্দী পেরিয়ে সেইসব ভয়াবহ দিনে, যখন মারী মড়কে সাফ হয়ে যেত গ্রাম কে গ্রাম, নগর কে নগর। তাই বেছেছিলাম মহামারীর শতক, ষোড়শ শতাব্দীর কবি থমাস ওয়াটকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, পাঁচশ বছর আগেও, মানব মানবীর প্রেমের ভাষা প্রায় একইরকম দেখা যাচ্ছে। চুম্বনের রসায়নেও কোন তফাত নেই। ওই একটি ব্যাপারে বোধহয় প্রযুক্তি বিশেষ কিছু সংযোজন করতে পারেনি। আদি অকৃত্রিম মানব প্রেম ও বাসনা যেভাবে প্রকাশের পথ খুঁজে নিত এবং হারাত, তা আজও সৌভাগ্যক্রমে অপরিবর্তিত। ভাষায়, ভাবে কৌতুকপূর্ণ প্রকাশের আধুনিকতায় সেদিনের কবি যেন আজকের দিনেরই যে কোন কবি, যে কোন প্রেমিক।

ট্রিভিয়া: অপ্রসঙ্গক্রমে, ওয়াট অষ্টম হেনরির রাজদরবারের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কূটনীতিক হিসেবেও কাজ করতেন এবং কূটনৈতিক জগতে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন থমাস ক্রমওয়েল, দেশদ্রোহের অভিযোগে যাঁর শিরচ্ছেদে মৃত্যুর পর ওয়াটকে বিদেশ থেকে ফিরিয়ে এনে জেলে দেওয়া হয়, যদিও অচিরেই ছাড়া পান, তবে এর পরে বেশীদিন বাঁচেননি তিনি।

Alas Madam for Stealing of a Kiss

Thomas Wyatt

Alas, madam, for stealing of a kiss
Have I so much your mind there offended?
Have I then done so grievously amiss
That by no means it may be amended?

Then revenge you, and the next way is this:
Another kiss shall have my life ended,
For to my mouth the first my heart did suck;
The next shall clean out of my breast it pluck.

একটি চুমুর সহজ শাস্তি (অনুবাদ)

কী এমন ক্ষতি করেছি প্রেয়সী, চুমুই তো শুধু খেয়েছি একটা!
সেই অপরাধ এত বড়, তার এমন দহন, এ মর্মপীড়া!
কতটা কষ্ট দিয়েছি বলো তো, কতখানি মন করেছি ক্ষুণ্ন?
কী করতে পারি, এই অপরাধ কি সংশোধনে পাবে সে পুণ্য?
আমি বলে দিই প্রতিশোধ নিতে, কী হবে তোমার আগামী কার্য
আরেকটি চুমু, হবে প্রাণঘাতী এবং সে সাজা শিরেও ধার্য,
প্রথম চুমুতে শুষে নিয়ে প্রাণ, ওষ্ঠে আগত হৃদয় এখন;
দ্বিতীয়টি শুধু সাফাইয়ের কাজ, বুক থেকে তুলে সমুৎপাটন।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০):

আঠারোশ ও উনবিংশ উভয় শতাব্দীর শরিক উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। কবিতায় রোম্যান্টিক পুনরুত্থানের জনক তিনি, তাঁর কবিতা অগ্রাহ্য করে কবিতা সম্বন্ধীয় কোন কাজ করা অসম্ভব। অজস্র কবিতা প্রিয় – তার মধ্যে থেকে লুসি সিরিজের এই কবিতাটি বেছে নেওয়া। পাঁচটি কবিতার এই সিরিজে লুসি এক অলীক নারী; অলীক কিন্তু বিশিষ্ট। অনুভব, কল্পনা ও সংবেদনশীলতার প্রতিমূর্তি, জলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো এই মেয়েটি যেন প্রকৃতিরই আর এক নাম। অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারিণী, কিন্তু কোনও কবিতায় কামনার অলঙ্কারে তাকে সাজাননি কবি। থাকতে চেয়েছেন স্বপ্নের আচ্ছন্নতায় – চাঁদের আলোর মতো শান্ত নরম, আবার পাহাড়ি ঝর্নার মতো চঞ্চল সেই মেয়ের কাছে। তবু প্রথম কবিতা থেকেই তাকে পাওয়ার ইচ্ছার চেয়ে হারানোর আশঙ্কা যেন ঘিরে রেখেছে কবির অন্তরতম সত্তাকে। গোটা সিরিজ জুড়েই লুসির মৃত্যুর সম্ভাবনা, মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী তার অস্তিত্বকে ঘিরে কবির হাহাকার এবং শূন্যতার অনুভব। বিষণ্নতার সেই সুর ছড়িয়ে যায় পাঠকের মনেও।

অন্যান্য কবির উদ্দিষ্ট নারী চরিত্রের মতো কোন নারী লুসি চরিত্রের প্রেরণা ছিলেন, এ নিয়ে পাঠকের জল্পনার অন্ত নেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থও এ ব্যাপারে বিশেষ কোনও আলোকপাত করেননি। কেউ কেউ বলেন লুসি আদতে তাঁর বোন, ডরোথি; কেউ কেউ আবার বলেন লুসি সম্পূর্ণই কাল্পনিক বা বিভিন্ন নারীর এক ঐক্যবদ্ধ রূপ। অধিকাংশের মতো আমারও মনে হয় লুসি এক মানস প্রতিমা, কবির কায়িক বাহ্যিক অভিজ্ঞতা প্রসূত কিন্তু কল্পনারসে সিক্ত এক কাব্যনারী, যাকে ঘিরে কবির কল্পনা, ধ্যান, মগ্নতা। লুসির পক্ষে, লুসিদের পক্ষে রক্তমাংসের শরীর ধারণ প্রায় অসম্ভব। মোহের মাধুরী দিয়ে গড়া এই রূপ কোনো এক মানবীর হতে পারে না। তবে অলীক প্রতিমা হওয়ার সাথে সাথে লুসির আরও একটি পরিচয় আছে। লুসি বড়ই সাধারণ। সমাজ-সংসার থেকে দূরে, ব্যস্ত মানুষের ভিড় থেকে দূরে থাকে সে। আমি-তুমি, ছোট-বড়র যে পরিচয়ে আমরা একে অপরকে

জানি, সে পরিচয়ের সাথে তার কোন সম্বন্ধ নেই | তাই পৃথিবীর কিছু যায় আসে না, লুসি রইল কি গেল | শুধু কবির হৃদয় ব্যাথাতুর, শূন্য হয় তার চলে যাওয়ার অটুট নিস্তব্ধতায় |

যদিও বেশিরভাগ অ্যান্থলজিতেই কবিতাগুলি একত্রে ছাপা হয়, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিন্তু আদতে এগুলিকে একত্রে লেখার কোন পরিকল্পনা করেননি | এগুলি এসেছে তাদের নিজস্ব প্রেরণায় এবং ক্রমে ক্রমে | কিন্তু তাদের ক্রমিকতায় এগুলিকে ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেননি তিনি | কবিতাটি ওয়ার্ডসওয়ার্থের আরও কিছু কবিতা এবং আর এক রোম্যান্টিক পুনরুত্থানের কবি এবং সতীর্থ কোলরিজের লেখা চারটি কবিতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল 'Lyrical Ballads with a Few Other Poems' বইটিতে | ব্রিটিশ কবিতার রোম্যান্টিসিজমের ইতিহাসে এই বইটির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে | ওয়ার্ডসওয়ার্থের এবং কোলরিজের এটি প্রথম কাব্যগ্রন্থ | পাঁচটি কবিতা, Strange Fits of Passion Have I Known, She Dwelt among the Untrodden Ways, I Travelled Among Unknown Men, Three Years She Grew in Sun and Shower, and A Slumber Did My Spirit Seal-এর মধ্যে আপাতত একটিই অনুবাদ করলাম | অদূর ভবিষ্যতে হয়তো গোটা সিরিজটি করে দেখব, যদি লুসিকে আরও একটু বেশী জেনে ফেলতে পারি –

She Dwelt among the Untrodden Ways
William Wordsworth

She dwelt among the untrodden ways
Beside the springs of Dove,
A Maid whom there were none to praise
And very few to love:

A violet by a mossy stone
Half hidden from the eye!
– Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.
She lived unknown, and few could know
When Lucy ceased to be;
But she is in her grave, and, oh,
The difference to me!

যে পথে কেউ যায় না, সেথায় (অনুবাদ)

যে পথে কেউ যায় না, সেথায়
গাংশালিখের ঝিলের পাশে
অভাগা সেই মেয়েটি, যাকে –
কেউ ছিল না, ভালবাসে:

শ্যাওলা-ঢাকা জংলি টিলায়
লুকিয়ে থাকা ফুলের মতো,
শুকতারাটির মতোই সেও,
অবাক, একা, উজলধারা –

থাকত একা | গেল যখন
কাঁদার কেউই ছিল না, তাও
সে নেই বলে আকুল দিনে
শূন্য হ'ল আমার জীবন |

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪):

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ রোম্যান্টিক কবিতার পথিকৃৎ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সহযোগী, বন্ধু | শুধু তাঁকে নিয়েই লিখে ফেলা যায় পাতার পর পাতা | তবে শুরুর দিকে তাঁর কবিতার কল্পনাবিলাস, আত্মমগ্নতা এবং ঐশীবার্তা কিছু পাঠককে দূরে সরিয়ে দিলেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং রবার্ট সাউথির কোনো সন্দেহ ছিল না যে রোম্যান্টিক কাব্যভাষার তিনি এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতে বাধ্য | প্রকৃতি, অতিপ্রাকৃত অনুভব এবং মানব মনের কল্পনা বার বার ফিরে এসেছে তাঁর কবিতায় | আবেগ, গীতিময়তা, রূপকল্পের ব্যবহার এবং মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষণ ছিল তাঁর কবিতার বিষয় | তাঁর লেখা The Rime of the Ancient Mariner এবং Kubla Khan পাঠককে পৌঁছে দেয় এক ভিন্ন জগতে |

অনূদিত কবিতাটি হঠাৎই করা | সত্যি বলতে কি কবিতা বাছতে গিয়ে দেখলাম কোলরিজের একটিও কবিতা অনুবাদ করিনি | তাই ঝট করে অনুবাদ করে ফেললুম | মূল রূপকল্পগুলি পালটানো হয়নি এই অনুবাদে | তবে তৃতীয় লাইনে nobler part-কে মহামান্বিত করতে জীবনের ক্লিন্নতাকে আনা হয়েছে reference frame হিসেবে | আর একটি ভার্শন ছিল, কিন্তু সেটিতে শেষ লাইনে অনুবাদের যে উপমাটুকু কবি দিয়েছেন সেটি অনুপস্থিত বলে এই রূপটিই বেছে নিলাম ফাইনাল ভার্শন বলে | ভালবাসা ও কামনার তুলনা মানব মনের

এক চিরন্তন ভাবনা | কোলরিজের ভাবনায় ভালবাসা হ'ল আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ| কিন্তু যেমন যে কোন আধ্যাত্মিক বস্তুরই প্রকাশের একটা মাধ্যম লাগে, কামনা হ'ল সেই মাধ্যম| তাই কামনা আত্মিক প্রেমের কায়িক প্রকাশ| জানি না কবির এই ভাবনা প্রকাশ করতে পারলাম কিনা আমার অনুবাদে!

Desire

Samuel Taylor Coleridge

Where true Love burns Desire is Love's pure flame;
It is the reflex of our earthly frame,
That takes its meaning from the nobler part,
And but translates the language of the heart.

কামনা (অনুবাদ)

যেখানে পুড়ে যায় সহজ প্রেম, কামনা-শিখা জাগে
অনির্বাণ মর্ত্য জীবনের সে যেন দীপশিখা,
আলোর তরী, গায় অন্য গান
যে গান জেগে ওঠে উদার ভাবনায়, ক্লিন্ন জীবনের পথ ভুলে
হৃদয়বীণা যাকে নীরবে গেয়ে যায়, সহজ অনুবাদে মন খুলে

পার্সি বিসি শেলি (১৭৯২-১৮২২):

রোম্যান্টিক কবিতার আর এক বিশ্ববরেণ্য দিকপাল এই কবি | প্রগতিশীল সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সমূলগত মতবাদে বিশ্বাসী কবি তিরিশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে তেমন স্বীকৃতি পাননি | কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর কবিতার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ভালবাসা ও যুগপৎ খ্যাতি শুধু বেড়েই গেছে| ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অথচ প্রেমের কল্পনায় অন্ধ, সংশয়বাদী অথচ রোম্যান্টিক, একাধারে বস্তুবাদী এবং আদর্শবাদী, উনবিংশ শতাব্দীর কোন লেখকের লেখায় এমন বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল | নানা ধরনের লেখায় ছিল তাঁর অনায়াস সৌকর্য | বিখ্যাত লেখাগুলি – Ode to the West Wind, To a Skylark, Adonais, Prometheus Unbound প্রভৃতি|

অনূদিত কবিতাটি বড় প্রিয় কবিতা, সেই সুদূর কিশোর বয়স থেকে | প্রাণের খুব কাছের বলেই বোধহয় অনুবাদ করে মন ভরেনি| শুধু মনে হয়েছে, না, ঠিক হ'ল না| হয়তো সেদিনের আবেগ নেই বলে শব্দ এল না| বা হয়তো আবেগের আতিশয্য এত বেশী তাই উপযুক্ত শব্দ পাওয়া গেল না... কি জানি!

কবিতাটি Jane Williams-কে নিবেদিত | জেনের প্রতি কবির গভীর অনুরাগই প্রতিপাদ্য এই কবিতায় | জেন ও তার প্রেমিক Edmund Ellerker Williams-এর সাথে শেলির পরিচয় হয় ১৮২১ সালে, ইতালির পিসা শহরে | তিনজনের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে অচিরেই এবং Lord Byron-ও সামিল হন এই বন্ধুদলে| জেনের প্রতি গভীর এক প্রীতির বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন শেলী এবং লেখেন অনেকগুলি কবিতা | প্রায় সব কবিতায়ই নিজের এই অনুরাগ ও প্রেমকে শেলি প্রকাশ করেছেন এক আধ্যাত্মিক, ভক্তি রসাশ্রিত অবয়বে | এ কবিতায়ও তার অন্যথা নেই| শেলির এই অনুরাগের কথা জেন ও উইলিয়াম দুজনেই জানতেন | জানতেন কবিপত্নি Mary Shelleyও | কিন্তু যেহেতু শেলী এই প্রেমকে বরাবরই প্লেটোনিক প্রেম হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন তাই মেরির হৃদয়ে কখনো বিরূপভাব জাগেনি জেনের প্রতি | বরং তিনি পছন্দই করতেন জেন ও উইলিয়ামের সাহচর্য| শেলিও ভালবাসতেন উইলিয়ামের সাথে সময় কাটাতে | যদিও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে দ্বিমত রয়েছে...|

১৮২২ সালের ৮ই জুলাই, Livorno থেকে Leric যাওয়ার পথে নৌকাডুবিতে শেলি ও উইলিয়ামের মৃত্যু হয় | দুর্ঘটনার দশদিন পরে শেলীর পচনোন্মুখ দেহ Viareggio সমুদ্র উপকূলে ভেসে ওঠে| মৃতের কোটের পকেটে কিটসের ল্যামিয়া বইটি দেখে মৃতদেহ সনাক্ত করেন কবির বন্ধু Edward John Trelawny | ১৯২২ সালের ১৬ই অগাস্ট, Viareggio সমুদ্রবেলায় কবিকে দাহ করা হয়| কবির ক্ষুদ্রাকৃতি হৃদয়টি কিন্তু পোড়ানো যায়নি | Tuberculosis আক্রান্ত কবি-হৃদয় প্রস্তরীভূত হয়েছিল অতিরিক্ত calcification-এর কারণে | কবির অস্থিভস্ম রোমের protestant cemetery-তে সমাধিস্ত করা হয়| কিন্তু অর্ধদগ্ধ হৃদয়টি Trelawny দেন কবির আর এক বন্ধু, সমালোচক, প্রবন্ধকার, কবি Leigh Hunt-কে | হান্ট বহুদিন পর্যন্ত সেই হৃদযন্ত্রটি আরকে সংরক্ষণ করে রাখেন এবং কবিপত্নী মেরিকে দিতে অস্বীকার করেন, যদিও অবশেষে সেটিও ইংল্যান্ডের একটি চার্চ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয় | হৃদয়ের গভীর অনুভূতির কবিতার প্রেক্ষাপটে কবির আক্ষরিক হৃদযন্ত্রের পরিণতির এই ছবিটির প্রয়োজন হয়তো ছিল না| তবু

করলাম | লালমোহনবাবুর ভাষায় Truth is stronger than fiction, এক্ষেত্রে দুটি হৃদয়ের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও কাঠিন্যের হিসেব মাপার নিরিখ বোধহয় শেষপর্যন্ত কবিকৃত শব্দবন্ধনই | পঞ্চভূত উৎপন্ন বাহ্য হৃদয়টি তো এতদিনে পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে নিশ্চয় | কিন্তু কবিতার তো মৃত্যু নেই, হতে পারে না | একই ভাবনায় যুগে যুগে ভাবিত হবে আরও অজস্র প্রেমিক হৃদয় | যারে যায় না পাওয়া তারই হাওয়া লাগবে আরও কত নিযুত প্রাণে | বয়ে যাবে জীবন দুর্নিবার | বাঁধা পড়বে মন, সঙ্কেতে, ব্রীড়ায়, আলো-ছায়ার খেলায় | লেখা হবে আরও অজস্র কবিতা, মায়াবীর প্রয়োজনে |

To

Percy Bysshe Shelley

One word is too often profaned
For me to profane it,
One feeling too falsely disdained
For thee to disdain it;

One hope is too like despair
For prudence to smother,
And pity from thee more dear
Than that from another.

I can give not what men call love,
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not,

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow?

তাকে (অনুবাদ)

একটি শব্দ বড় বেশী ব্যবহৃত,
তাই সেই কথা কাজ নেই আজ বলে,
একটি আবেগ সয় বহু অবহেলা
তুমি যেন তাকে ফেলে যেও না গো চলে!

এ আশা নেহাতই দুরাশা, আমিও জানি
ক্ষণভঙ্গুর, অর্বাচীনের দাবি
তবুও শ্লাঘ্য ক্ষণিকের করুণাও
মনে মনে তাকে চির-পরিমলই ভাবি |

প্রেম-অর্পণে নেই যোগ্যতা, জানি,
তবু কি কোমল করপুটে নেবে তুমি?
দেবতাও যাকে করেন না অবহেলা,
যে ফুল-অর্ঘ্য মেলে ধরে হৃদি-ভূমি,

জোনাকির মনে তারাকে ছোঁবার আশা
ভোরের আকুতি, যেমন রাতের বুকে –
এই অর্চনা, রক্তিম অনুরাগ
আমাদের এই ব্যথার বৃত্ত থেকে?

ফ্র্যান্সিস উইলিয়াম বুড়ডিলন (১৮৫২-১৯২১):

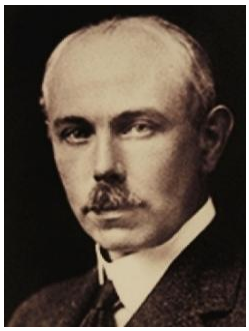

কবি ও অনুবাদক ফ্র্যান্সিসের জন্ম ইংল্যান্ডের চেশায়ারের রানকর্ন শহরে | বাবাও ছিলেন লেখক এবং ইউনাইটেড চার্চের পক্ষে শহরের আবাসিক ধর্মযাজক | The Flowers, And Other Poems, Minuscula: lyrics of Nature, Art and loveসহ একাধিক কবিতার বই, একটি উপন্যাস ও বেশ কয়েকটি অনুবাদ-গ্রন্থ এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের লেখক তিনি | ভিক্টোরিয়ান সমাজের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও বস্তুবাদীতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে নান্দনিক আন্দোলনের (Aesthetic Movement) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন | পরিশীলিত ভাষা, তার সূক্ষ্ম কারিগরি এবং সংবেদনশীলতা, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, এবং আত্মমগ্নতা ছিল তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য | The Night has a Thousand Eyes ছিল ফ্র্যান্সিসের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা |

জীবনের একমাত্র সত্য ভালবাসা, হৃদয়-গভীরে জেগে থাকা আলোর প্রদীপ | বুদ্ধি দিয়ে বিচার দিয়ে অনেক কিছু দেখা যায় কিন্তু ভালবাসার প্রলেপ না থাকলে সব জ্ঞান বৃথা | তারাভরা রাত্রি আর সূর্যস্নাত দিনের রূপকল্পে এই সহজ সত্যটি কবি তুলে ধরলেন | কবিতা অনুবাদের কাহিনীটি একটু অদ্ভুত হলেও সত্যি; কাঁচির দিব্যি!

ছেলের বুকশেল্ফে কাঁচি খুঁজতে গিয়েছিলাম | করোনার প্রকোপে চুল কাটতে যাওয়া বন্ধই হয়ে গেছে | কোনক্রমে দু'নম্বর কাঁটা ব্যবহার করে এদিক ওদিক থেকে খাবলা খাবলা চুল ফেলে তবু একটু কমানো গেছে কয়েকদিন

আগে | কিন্তু জুলফি তো ক্রমশ মধুসূদন দত্ত, লর্ড ক্লাইভের মতো হয়ে চলেছে | এদিকে বন্ধু বলেছেন গোষ্ঠী-কবিতা পড়ার নাকি ভিডিও তুলতে হবে | সুতরাং জুলফি কাটা জরুরি | ট্রিমার নেই, অতএব কাঁচিই ভরসা; বাড়িতে আবার একটিই সবেধন চালু কাঁচি | রান্নাঘরে থাকার কথা, কিন্তু কখনো তাকে গোলাপবাগানে পাওয়া যায়, কখনও বাথরুমের ক্লসেটে | কিন্তু সেটা এত গোবদা যে তা দিয়ে জুলফি কাটা প্রায় অসম্ভব | অতএব ছোট কাঁচি খুঁজতে ছেলের বুকশেল্ফ | কাঁচি অবশ্য সেখানে পাওয়া যায়নি, অন্যত্র গিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত জুলফি ভিন্ন পদ্ধতিতে ছাঁটতে হয়েছিল | কিন্তু চুলের চুলবুলি বা কাঁচির ক্যাঁচক্যাঁচ প্রসঙ্গে এই কাহিনীর অবতারনা নয় | ঘটনা হ'ল, কাঁচি খুঁজতে গিয়ে অনেক আগে কেনা Great Short Poems নামে একটা চটি কবিতার বই পাওয়া গেল | উল্টেপাল্টে দেখলুম অনেকগুলো কবিতায় দাগ দিয়ে রেখেছি অনুবাদের সদিচ্ছায় | এদিকে অফিসের কাজ চলছে, দুদিন বাদেই ডেডলাইন | অতএব বই ফেলে কাজে মন | সন্ধ্যেবেলা আবার দেখি বইটা উঁকি মারছে, এবারে বসার ঘরে কাঁচের টেবিলের নিচ থেকে | অগত্যা খোলা হ'ল বই | ছোট কবিতা তো, বেশী সময় লাগবে না, ঝট করে করেই ফেলি | সন্ধ্যের চা পর্বের মাঝের সময়টুকুতে অনূদিত হলেন ইনি | এদিকে কাঁচের তলায় পাওয়া বইও উত্যক্ত করছে তো!

The Night has a Thousand Eyes
Francis William Bourdillon

The night has a thousand eyes,
And the day but one;
Yet the light of the bright world dies
With the dying sun.
The mind has a thousand eyes,
And the heart but one;
Yet the light of a whole life die,
When love is done.

রাত্রি জাগে হাজার চোখে (অনুবাদ)

রাত্রি জাগে হাজার চোখে
দিন রেখেছে একটি মেলে |
অন্ধ তবু এই পৃথিবী
সূর্য নিভে সাঁঝ গড়ালে |
মনের আছে হাজারটা চোখ
হৃদয় শুধু আলোয় খেলে |
জীবনজুড়ে তাই তো আঁধার,
ভালবাসার গান ফুরলে |

অ্যালফ্রেড এডওয়ার্ড হাউসম্যান (১৮৫৯-১৯৩৬):

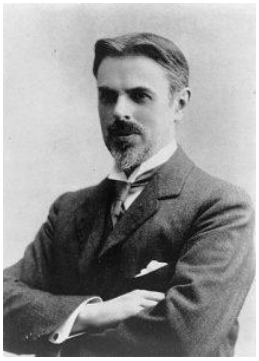

কবি প্রায় সারাজীবন শুধু বিষাদের কবিতাই লিখে গেলেন | ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ A Shropshire Lad-এ ভারাক্রান্ত হৃদয় এক কিশোরের অনবরত মৃত্যু-চিন্তার প্রসঙ্গ প্রথমে পাঠক তেমন করে না নিলেও, অচিরেই বিশ্বযুদ্ধ ও তার প্রেক্ষাপটে ধ্বংস ও মৃত্যুর তাণ্ডবে ম্রিয়মাণ অল্পবয়সি পাঠকেরা একাত্মবোধ করতে শুরু করে |

সাত ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাউসম্যান, ১২ বছর বয়সে মাকে হারান ক্যান্সারে | ছোট ভাই-বোনের দেখা-শোনার ভার পড়ে ছোট্ট হাউসম্যানের ওপর | ছোটবেলায় ঈশ্বরে বিশ্বাসী হাউসম্যান কিন্তু বড় হওয়ার পথে হয়ে ওঠেন নাস্তিক | ছোটবেলা থেকেই হাউসম্যান পাঠ্য এবং ক্লাসিক সাহিত্যের বইয়ে সহজে ভুলভ্রান্তি ধরে ফেলতে পারতেন, তাই তিনি জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন রিড্যাক্টরের কাজ | ছোটবেলায় বার্মিংহ্যামের King Edward's স্কুলে পড়াশোনার পর হাউসম্যান যান ব্রমসগ্রোভ স্কুলে | এখানে তাঁর কাব্যপ্রতিভা সকলের নজরে আসে এবং বেশ কয়েকটি পুরস্কার পাওয়ার পরে তিনি স্কলারশিপ পান অক্সফোর্ডের সেন্ট জেমস কলেজে পড়াশোনা করার | এখানেই সমকামী হাউসম্যানের আলাপ হয় তাঁর জীবনের একমাত্র প্রেম মোসেস জ্যাকসনের সঙ্গে | তাঁরা প্রায় পাঁচ বছর (১৮৮৩-১৮৮৭) একসঙ্গে থাকেন এবং সম্ভবত মোসেসকে নিয়ে তাঁর এই পাগলামির কারণে পড়াশোনায় বিশেষ মন দিতে না পারায় ফেলও করেন হাউসম্যান | কিন্তু মোসেস কখনো সেভাবে সাড়া দেননি হাউসম্যানের প্রেমের আহ্বানে | রেজাল্ট এতই খারাপ হয় যে তাঁকে প্যাটেন্ট অফিসে কেরানির কাজ নিতে হয় | সেই ঘিঞ্জি অফিসে বসে লজেন্স এবং বিয়ারের ট্রেডমার্কের দরখাস্ত দেখতে দেখতে বহু সন্ধ্যায় তিনি

চলে যেতেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে রাত জেগে পড়াশোনা এবং অনুবাদের কাজ করতে | ক্রমশ প্রকাশ করতে থাকেন রোমান লিরিক কবি কুইন্টাস হোরাশিও ফ্লাকাসের কাজের অনুবাদ এবং একে একে ওভিড, এস্কাইলাস, ইউরিপিডিস এবং সফোক্লিসের কাজের অনুবাদও | অচিরেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যের এক বিদগ্ধ সমালোচক হিসেবে এবং অত্যাশ্চর্যভাবে সেই ক্লিন্ন ট্রেডমার্ক অফিস থেকে হাউসম্যান উন্নীত হন লন্ডনের ইউনিভার্সিটিতে লাতিন বিভাগে প্রধানের পদে |

১৮৮৭ সালে বিয়ে করে জ্যাকসন ভারতবর্ষে যান এবং করাচীর জিন্না ইউনিভার্সিটির প্রিন্সিপাল হয়ে retire করে ১৯১১ সালে কানাডায় চলে যান| কানাডায় ক্যান্সারে আক্রান্ত মোসেস মৃত্যশয্যায়, এ কথা শুনে ১৯২২ সালের ৩০শে মার্চ ও ৯ই এপ্রিলের মধ্যে হাউসম্যান তাঁর অতীতের ভালবাসাকে স্মরণ করে লিখে ফেলেন সাতান্ন পাতা কবিতা এবং একটি সম্পূর্ণ বই ছেপে ফেলেন, নাম রাখেন 'Last Poems'| মৃত্যুর আগে সেই বই পৌঁছায় তাঁর প্রেমিকের হাতে; তিনি পড়েন কবিতাগুলি | ১৯২৩ সালে জানুয়ারি মাসে বন্ধুর মৃত্যুর পর হাউসম্যান তাঁদের দুজনেরই বন্ধু অ্যালফ্রেড পোলার্ডকে লেখেন:

প্রিয় পোলার্ড,

রবিবার রাত্রে জ্যাকসন চলে গেল | অনেকদিন ধরেই অ্যানিমিয়ায় ভুগছিল | আমি ওর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম এই খ্রিস্টমাসে, ও আমাকে বিদায় জানিয়ে গেছে; এখন আমিও শান্তিতে মরতে পারব| নাহলে ওকে এই পৃথিবীতে ফেলে রেখে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হতো |

ভালবাসা,

ইতি হাউসম্যান

ওঁর অনেকগুলি কবিতাই অনুবাদ করেছি, এটি আমার বিশেষ প্রিয় কবিতা | বিষণ্নতা কাম্য নয়, তবু কখনো বিষণ্নতার আড়ালেই যেন ধরা যায় আনন্দের সঠিক রূপ; বা যায় না | এই কবিতার রূঢ় সত্যের আড়ালে যেন খেলা করছে চিরন্তন জীবনধারার সেই রূপটুকু | আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, আলো-আঁধারি এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেরই কী অপরিসীম মূল্য | একটু না থামলে এই বোধ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না | এই কবিতাটিতে গঠনগত, ছন্দগত এবং শব্দের প্রয়োগগত প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে অনুবাদ করতে গিয়ে | তবু অনুবাদটি আমার বেশ ভাল লাগে এখনো |

Rue মানে অনুতাপ বা বিষাদ, সেই বিষাদে ভরে আছে হৃদয়, এরকমটা অর্থ করা যায় | কিন্তু বাংলায় হৃদয়কে subject করা হ'ল এবং কান্নাকে আনা হ'ল | এবং বিষাদের উৎপত্তি হিসেবে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের স্মৃতিকে এনে অনুবাদ হ'ল 'রুদ্ধ হৃদয় একলা কাঁদে স্মৃতির ভারে' এবং স্বভাবতই যে হৃদয় এই কথা ভাবছে তার একাকীত্বটুকু সহজেই অনুমেয়, তাই 'একা' শব্দটি জোড়া হ'ল | তেমনই Golden Friends হয়ে গেছে হীরে মানিক বন্ধুগুলো | And Many a Lightfoot Lad-এর অনুবাদ হয়েছে কারণ বিনা চঞ্চলতা, সেই যে ছেলেগুলো; যেহেতু অল্প বয়সের একটাই পরিচয়, কারণহীন হইহল্লা, ভাললাগা, আনন্দের ভাব | Brooks হয়েছে নদী, too broad এর জায়গায় খরস্রোতা, এবং গাঢ় | শুধু Lightfoot Lad না বলে কত সহজে সেই নদী সেই বালকেরা পেরিয়ে যেত এ কথা বলা হয়েছে | শুধু rose-lipt না বলে মেয়েগুলির মনের রঙিন স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে |

In fields where roses fade-এ যেন জীবনের নৈর্ব্যক্তিক বহমানতার কথা তেমন বলা হ'ল না | হয়তো কবি বলতে চেয়েছেন পৃথিবীর সব রঙ রূপ, মানুষের সাহচর্য, ভালবাসা, সম্পর্ক বিনা ম্লান হয়ে যায় | সেক্ষেত্রে আমি এখানে ভাবটা একটু পাল্টালাম | বললাম, যে মাঠে সেইসব গোলাপি ঠোঁটের মেয়েরা শয়ান, সেখানেই সারাবছর ফুটে চলে দুরন্ত গোলাপ | জানি না ঠিক ব্যাখ্যা হ'ল কিনা, তবে অনেক বকা হ'ল অনুবাদ নিয়ে | ধৈর্য নিয়ে পড়া মুশকিল, সেও এক কথা! তাই আপাতত বাকযত হলুম |

With Rue My Heart is Laden

Alfred Edward Housman

With rue my heart is laden
For golden friends I had,
For many a rose-lipt maiden
And many a light foot lad.

By brooks too broad for leaping
The light foot boys are laid;
The rose-lipt girls are sleeping
In fields where roses fade.

বিষণ্ণতা (অনুবাদ)

রুদ্ধ হৃদয় একলা কাঁদে, স্মৃতির ভারে একা,
হীরে মানিক বন্ধুগুলো, আর হবে না দেখা;
গোলাপ ঠোঁটের মেয়েগুলো সব, চিকন বাহুমূলও,
কারণ বিনা চঞ্চলতা, সেই যে ছেলেগুলো...

এখন নদী খরস্রোতা, এখন নদী গাঢ়
লাফিয়ে যেত দামাল ছেলে, শায়িত শব তারও;
অধরে রঙ, মধুপে মন, কুসুমফোটা মেয়ে
ঘুমোয় এখন, লুকিয়ে ফোটে গোলাপ আকাশ ছেয়ে।

লরেন্স হোপ (১৮৬৫-১৯০৪):

ইংরেজ কবি অ্যাডেলা ফ্লোরেন্স কোরি নিকলসন লিখতেন 'লরেন্স হোপ' ছদ্মনামে, যদিও তিনি 'ভায়োলেট নিকলসন' হিসেবেও পরিচিত। যৌথ পরিবারে বড় হওয়া অ্যাডেলা ১৬ বছর বয়সে বাবার কাছে ভারতবর্ষে যান। সেখানে তাঁর বাবা ও বোনেদের সাথে 'সিন্ধ গেজেট' নামে পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অ্যাডেলার দুই বোনই সাহিত্যচর্চায় ব্যাপ্ত থাকতেন। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বড়বোন, ইসাবেল সিন্ধ গেজেটের সম্পাদক হয়ে যান এবং ছোটবোন, অ্যানি সোফি 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' ছদ্মনামে প্রায় কুড়িটির ওপর জনপ্রিয় উপন্যাস লেখেন।

২৩ বছর বয়সে বম্বে সৈন্যবাহিনীর কর্নেল ম্যালকম হেসেলের সঙ্গে বিয়ের পর অ্যাডেলা ভারতের বহু শহর ঘুরে অবশেষে মধ্যপ্রদেশের মহাও (অধুনা আম্বেদকর) শহরে থেকে যান। ১৯০০ সাল থেকে অ্যাডেলা কবিতা ছাপতে শুরু করেন লরেন্স হোপ ছদ্মনামে। হোপের কবিতায় ছড়ানো ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ভূচিত্র আর সুফি প্রতীকীবাদ। বহু কবিতায় ভারতীয় নর্তকী ও শ্রমজীবী মানুষের প্রেম বিরহের আবেগগাথা। ১৯০১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Garden of Kama প্রথমে অনুবাদ-গ্রন্থ হিসেবে প্রচারিত হলেও পরে জানা যায় লেখাগুলি লরেন্সের মৌলিক রচনা। ১৯০১ থেকে ১৯০৪-এর মাঝখানে তিনি ইংল্যান্ড, ভারত এবং সাউথ আফ্রিকাতে বসবাস করেন। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় Indian Love Lyrics। ১৯০৪ সালে সারজিকাল অপারেশনের সময়ে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর দু'মাস পরে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন অ্যাডেলা।

জীবদ্দশায় তাঁর কবিতা সমালোচক ও পাঠক উভয়ের অনুগ্রহই পেয়েছে। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় Last Poems: Translations from the Book of Indian Love এবং ১৯২২ সালে ছেলে ম্যালকম জসেলিন নিকলসনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় Selected Poems from the Indian Love Lyrics of Laurence Hope কাব্যগ্রন্থ দুটি। এবং Indian Love Lyrics-এর কিছু কবিতায় পরবর্তীকালে সুর দেন ব্রিটিশ সুরকার এমি উডফ্রেন ফিন্ডেন। অ্যাডেলা (লরেন্স) তাঁর অন্তিম শয়নে শায়িত বম্বের সেন্ট মেরি সেমেটারিতে।

Till I Wake
Laurence Hope

When I am dying, lean over me tenderly, softly,
Stoop, as the yellow roses droop
in the wind from the South.
So I may, when I wake, if there be an Awakening,
Keep, what lulled me to sleep,
the touch of your lips on my mouth.

মৃত্যুর আগে (অনুবাদ)

মরণোন্মুখ, যখন নিশ্চিত ধ্বংসের
দিকে চলে যাচ্ছি আমি
মৃদু কাঁধ এলিয়ে
ঝুঁকে এসো তুমি।

স্তব্ধ, বিষণ্ন
তোমার পেলব ঠোঁট,
নমনীয় বুকের উদ্যানে
রাখা হাত –
যেভাবে দখিন হাওয়ায়
নুয়ে পড়ে হলুদ গোলাপকুঁড়ি!
আমার শিয়রের পাশে এসো।

যাতে, যখন জাগব আমি,
(যদি জাগি), যেন মনে থেকে
যায় শুধু এই স্পর্শটুকু –
আমাকে শান্ত ঘুমে

পাঠালো যে গান গেয়ে;
তোমার ঠোঁটের ছোঁয়া,
আমার তৃষ্ণার মুখে।

হিলেয়ার বেলক (১৮৭০-১৯৫৩):

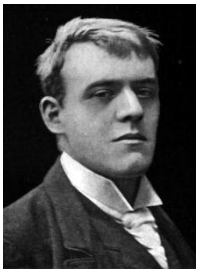

বিংশ শতাব্দীর বিশেষ প্রভাবশালী এবং বিতর্কিত লেখক হিলেয়ার বেলক। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধ শুরুর অল্প আগেই তাঁর জন্ম হয় ফ্রান্সের La Celle St. Cloud শহরে। কিন্তু ফরাসী বাহিনীর হারের খবর পেয়ে সপরিবারে পালিয়ে আসেন ইংল্যান্ডে। বজ্রপাতসহ তীব্র ঝড়ের রাতে জন্ম বলে তাঁর ডাকনাম রাখা হয়েছিল 'Old Thunder' এবং তাঁর মেজাজ মর্জির সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে গিয়েছিল এই নাম। হিলেয়ার বেলক ছিলেন তীব্র আবেগ ও সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। বিনা নিমন্ত্রণে বন্ধুদের বাড়িতে উপস্থিত হতেন, পরনে ঘামেভেজা শার্ট, সাতদিনের ভ্রমণের গ্লানি সারা দেহে, মুখে গালি, এসেই চিৎকার করতেন বিয়ার খাবেন বলে। রাজনৈতিক জীবনও তাঁর একই রকম বিতর্কিত। বহু বছর লিবারাল এমপি থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করতেন ইউরোপের আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতি একমাত্র সম্ভব রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্ম প্রত্যাবর্তনের পথেই। এ প্রসঙ্গে তাঁর লেখা The Path to Rome স্মরণীয়। মূলত এই রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই তিনি ছিলেন বিতর্কিত। যদিও তাঁর প্রথম জনপ্রিয় কবিতার বই, The Bad Child's Book of Beasts ছিল নীতিপূর্ণ নির্দেশাত্মক শিশু-পাঠ্য কবিতার স্যাটায়ার। ব্যক্তিগত জীবনের ওঠাপড়া, পেশাদারি অসাফল্য, রাজনৈতিক পরাজয়, যাই আসুক না কেন, বেলক সেইসবের মধ্যেই দেখতে পেতেন জীবনের রূপ এবং প্রকাশ করতে পারতেন কবিতার ভাষায়। টড ওয়ারনারের কথায়, "যে ভাষা একইসঙ্গে ঝকঝকে, তীব্র এবং বুদ্ধিদীপ্ত, অভব্য এবং স্বর্গীয়; যে ভাষা আমাদের থমকে দেয় অনর্থক দৌড়ানোর পথে, আমাদের ভাবতে শেখায়, নিয়ে যায় জীবনের কমনীয় সত্যের দিকে, তার মরমী রূপের আভাস দেখায়।"

অনূদিত কবিতাটি দু'লাইনে এমন আচ্ছন্নতার কথা ভদ্রলোক দেড়শ বছর আগে কীভাবে বলতে পারলেন? আসলে যুগ যুগ ধরে মানুষ, মানুষের অনুভব, তার ভাবের প্রকাশ পাল্টায়নি বোধহয়। সেই প্রেম বিরহ, আচ্ছন্নতা গ্লানির চেনা গল্প তো! বুকের ভাষা আর মুখের ভাষা পাল্টায়নি। লেখ্য ভাষায় প্রকাশ-রীতি পাল্টেছে কিছু কিছু। কিন্তু খুঁজে দেখলে দেখা যায় বহু মানুষ যুগের রীতির মধ্যে দাঁড়িয়েও, প্রকাশ করেছেন সম্পূর্ণ আধুনিক ভাষায়। হয়তো হৃদয়ের সহজ অনুভব প্রকাশের পন্থাটি এমনই সহজ আর সংক্ষেপ, তাতে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই, কারিগরির প্রয়োজন হয় না, সময়ের ছায়াও ঢাকতে পারে না সেই আলো। অনুবাদের চেষ্টা করলাম, জানি না কতটা সার্থক হ'ল; ঠিকমতো বুঝলাম কিনা, বোঝালাম কিনা!

Juliet
Hilaire Belloc

How did the party go in Portman Square?
I cannot tell you; Juliet was not there.

And how did Lady Gaster's party go?
Juliet was next me and I do not know.

অনামিকা (অনুবাদ)

চিমনি রকের পার্টি কেমন হ'ল?
কী করে বলব, অনামিকা ছিল না তো!

আর, মালাদির বাড়ি পার্টি কেমন হ'ল?
সঙ্গে ছিল ও, আর কিছু দেখিনি তো!

ডিলান থমাস (১৯১৭-১৯৫২):

এই কবিকে নিয়ে কিছু লিখব না আজ। ভেবেছিলাম এই কবির কোন কবিতাই অনুবাদ করিনি। কিন্তু আশ্চর্য – খুঁজতে গিয়ে দেখালাম, ডিলান থমাসের একটা কবিতা অনুবাদ করে রেখেছি বটে! অনূদিত কবিতাটি নিয়েও বেশী কথা বলার নেই। ভাল লেগেছিল, তাই অনুবাদ করার প্রয়াস। কিন্তু মনে হ'ল কাজটি খুব সোজা নয়। বিশেষত কবিতার শিরোনাম এবং প্রথম লাইনের Being but men শব্দপঞ্জীর যে ঠিক কী অর্থ এখানে? প্রকৃতির মাঝে ফিরে যাওয়ার কারণ কি এই শব্দবন্ধ? মনে হয়, জানি না ঠিক – তবু ভাবলাম অনুবাদ করে দেখি।

Being But Men

Dylan Thomas

Being but men, we walked into the trees
Afraid, letting our syllables be soft
For fear of waking the rooks,
For fear of coming
Noiselessly into a world of wings and cries.

If we were children we might climb,
Catch the rooks sleeping, and break no twig
And, after the soft ascent,
Thrust out our heads above the branches
To wonder at the unfailing stars.

Out of confusion, as the way is,
And the wonder, that man knows,
Out of the chaos would come bliss.

That, then, is loveliness, we said,
Children in wonder watching the stars,
Is the aim and the end.
Being but men, we walked into the trees.

ছেলেমানুষি (অনুবাদ)

বিচক্ষণতায় সতর্ক মানুষ হয়েই ঢুকে পড়েছিলাম
গাছের শরীরে একদিন, আমরা।
ভয়ে ভয়ে, ফিসফিসিয়ে হচ্ছিল কথা, ঘুমন্ত ডালগুলো
জেগে না যায় আবার! যেন সন্তর্পণে ঢুকে পড়তে হবে
ডানা আর পালকের এই নিঃশব্দ প্রান্তরে।

ছেলেবেলা হলে তরতরিয়ে উঠে যেতাম মগডালে
ঘুমন্ত পাখিগুলোকে না জাগিয়ে, কোনো ডাল না ভেঙে
একদম ওপরে গিয়ে মাথা উঁচিয়ে অবাক চোখে
দেখে নিতাম তারাগুলোকে, আর ভাবতাম
আর সব পাল্টায়, ওরা কেমন কিছুতেই পাল্টায় না।

জীবনের এই বিভ্রান্তি আর মনের এই
চিরন্তন বিস্ময়, একদিন ঠিকই দেখাবে পথ
এ জটিল ঘূর্ণাবর্তেও এ বিশ্বাসে জেগে উঠি আজও।

একমাত্র মাধুর্য বোধহয় সেইই – কৈশোরক বিস্ময়ে
চেয়ে থাকা অবাক রাত্রির তারাভরা আকাশের গায়ে।
সেটুকুই জানার যেন, অজানার বিস্ময়
অনাদির রহস্যেই শেষ, আর কিছু নয়।
বড়-হয়ে যাওয়া মানুষের মতো তবু,
ঢুকে পড়ি আমরা বার বার,
গাছের পবিত্র শরীরে।

শেষের কথা: আমার কথাটি ফুরোল, এই লেখাটির মতো। অনেক কথা বললাম, কিছু কথা প্রাসঙ্গিক, কিছু অপ্রাসঙ্গিক। কিছু কবিতা নিয়ে, কিছু কবিদের নিয়ে। অনুবাদ করার এটাও একটা মজা – বেশ কয়েকদিন কবিতা আর কবিকে নিয়ে মজে থাকা যায়। কোনো কবিতার সঠিক ব্যাখ্যা না পেলে কবির জীবন ঘেঁটে বার করার চেষ্টা করি, সেখান থেকে কি কিছু জানা যাবে? দেখা গেল জানা যায় অনেককিছুই। কিছু ভাল কথা, কিছু বা শুধুই কষ্টের ইতিবৃত্ত। তবে কিনা কষ্টের তীব্রতা তেমন না হলে কি আর কবিতা লেখা হয়? কবিরা সংবেদনশীল, তাই তারা সহজেই দাগা খেয়ে যান, তাঁদের জীবনের পেন্ডুলাম ভীষণভাবে নড়ে যায় (অনুপম ত্রিবেদী স্মরণীয়), কিন্তু যায় বলেই তো আমরা পাঠকরা কবিতা পেয়ে যাই। তবু কখনো তাঁদের দুঃখে সম্পৃক্ত হয়ে মন কেঁদে ওঠে। একটা নিবিড় মমত্ববোধে তুলে নিই সেই কবির অন্যান্য কবিতা বা অনলাইন অর্ডার করে দিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার বই। বাড়তে থাকে পরিচয়, আত্মীয়তা। সম্পর্ক নিবিড় হয় কবির সাথে, কবিতার সাথে। সেটুকুই লাভ। আর লাভ তোমাদের সকলকে পড়ানোর এই সুযোগটুকু। পড়ো যদি, ভালবাসো যদি, কবিকে, কবিতাকে, যদি মনে হয় অনুবাদ করা গেছে তাঁদের হৃদয়ের, হৃদয়ের অনুভবের – জানিয়ো।

আকাশে ওড়ার বিড়ম্বনা

হুসনে জাহান

জুনিয়র স্কুলে পড়ার সময় থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ, পর্যটন, আবিষ্কারের কাহিনী পড়ে আমাদের দেশ বিদেশ দেখার ও বেড়াবার দারুণ আগ্রহ। বৃহত্তর বাংলায় আমরা তো কলকাতারই অধিবাসী, সেখানেই পড়াশোনা। সেদিনের কিছু শিক্ষিত মহলের মেয়েদের মতো আমার বাবা-মা'ও আমাকে দার্জিলিং-এর কনভেন্ট স্কুলে পাঠানোর চিন্তা করেছেন। কিন্তু তাঁদের গুরুজনরা সে প্রস্তাব সমর্থন না করায় কলকাতারই এক ইংরেজি স্কুলে আমাকে ভর্তি করা হয়।

আমাদের বাসা ছিল থিয়েটার রোডে। প্রতি রোববার, স্কুলের ছুটির দিন ঘুম থেকে ডেকে তুলে বাবা আমাদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পার্কে হাঁটতে নিয়ে যেতেন। সেখান থেকে ফিরে নাস্তা শেষে বাবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রবিবারের স্টেটসম্যান পত্রিকা খুলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চায় অংশ গ্রহণ করতে হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম, রাজধানী, রাজা-রানী, প্রেসিডেন্টের নাম, সরকারি ব্যবস্থা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিখতাম। বাবা আমাদের জন্য সেকালের ছোটদের মাসিক প্রকাশনা 'শিশুসাথী'র ব্যবস্থা করে দেন। প্রতিমাসে ডেলিভারির দিন আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে ধাক্কধাক্কি আরম্ভ হয়ে যেত সবার আগে পত্রিকাটি হাতে নেয়ার জন্য। যে প্রথমে নেবে, সে মাঝখানে সেটা কোলে নিয়ে বসবে আর প্রতি পাতা পড়া শেষ হলে পাতা উল্টাবে। বাকি দুজন দুপাশে বসে শুধু পড়বে। আমাদের বড় ও ছোট দুবোনের মাঝের ভাই বেশিরভাগ সময় সে দায়িত্ব পালন করত। তার পড়ার গতি আমাদের দু'বোনের চাইতে দ্রুত ছিল। প্রতি পাতা ঊর্ধ্বশ্বাসে অবিশ্বাস্য গতিতে পড়ে শেষ করত। ভাইয়ের অন্য পাশে বসা ছোটবোনও আমার থেকে আগে পড়ে ফেলত। তাহলে বোঝো! আমার সম্বন্ধে শোনা কথাটা মোটেই ভুল নয়। কিন্তু তখন সেকথা মোটেই স্বীকার করিনি। আমি এখন পুরোপুরি বুঝি যে আমি একটু ধীরে পড়ি। সম্ভবত প্রতিটি শব্দ ধীরে পড়ে, বুঝে মনে রাখার চেষ্টা করাই বোধহয় আমার চিরকালের অভ্যাস। তার ফলে আমার পড়ার গতি অন্যান্যদের চাইতে অনেক কম। তবে এ সন্দেহও হয় যে ওরা কি তাহলে না বুঝেই গড়গড়িয়ে পড়ে শেষ করে? না, সেও ঠিক নয়।

যাহোক, বলছিলাম যে আমাদের বাসায় পড়াশোনা ও জ্ঞান-অর্জনের এক পরিবেশ ছিল। বাবা, কাকা, মামা তো বই কিনে দিতেনই, জন্মদিনেও উপহার হতো বই। তাছাড়াও আমাদের মাসিক হাতখরচ থেকে জমিয়ে আমরাও বই কিনে একটা লাইব্রেরির মতো পরিবেশ তৈরি করেছিলাম। নিয়ম ছিল সেখানে বসে বই পড়া চলবে কিন্তু সেখান থেকে বই বাড়িতে নিয়ে গেলে চাঁদা দিয়ে মেম্বার হতে হবে আর সময়মতো ফেরত না দিলে সাপ্তাহিক ফাইনও দিতে হবে। এসব গল্প আজ করছি একথা বোঝাবার জন্য যে এই পরিবেশে পালিত হয়ে আমাদের ছোটবেলা থেকেই সাধারণ জ্ঞান, দেশ বিদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, রাজধানী, রাজপরিচালকদের নাম, রাজকার্যের নিয়মাবলী, রীতিনীতি, পাহাড়-পর্বত, চড়াই-উৎরাই, নদী-সমুদ্র, মরুভূমি, জীবজন্তু সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা হয়ে যায়। ফলে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে স্বচক্ষে সব পরিদর্শন করার আগ্রহ প্রবল হয়। তাই যখন সর্বোন্নত দেশবাসীর মুখে শুনি, ইন্ডিয়া, কলকাতা, বাংলাদেশ, ওগুলো সব কোথায়? তারা কোন ভাষায় কথা বলে? তাদের খাবার, পোশাক কি ধরনের... ইত্যাদি; তখন তাদের উন্নত মানের পড়াশোনা ও জ্ঞানের সম্পর্কে অবাক না হয়ে পারি না। বোঝার চেষ্টা করি যে এই মেগা দেশের অধিবাসীদের বাকি পৃথিবী সম্বন্ধে এত অজ্ঞান হয়ে জীবন ধারণে কি কোনো অসুবিধা হয় না? না হয় না, কারণ, তারা যে পশ্চিম ভূমণ্ডলের উন্নত মানুষ, আর আমরা হলাম প্রাচ্যের অনুন্নত দেশের পিছনে পড়েথাকা জংলী-অধিবাসী। আমাদের জ্ঞানের সীমাই বা কতদূর আর আমাদের তৃতীয় বিশ্বের অস্তিত্ব যে পশ্চিমের সাহায্য ছাড়া নড়বড়ে!

এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে করা যায় যে অন্তত এক জায়গায় আমাদের জ্ঞান, চিন্তা পাশ্চাত্যের চাইতে দু'পা এগিয়ে, যা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে আমরা বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও প্রাচীন স্থাপত্য ও সভ্যতায় আমরা অবশ্যই এগিয়ে। যাক, অন্যের ত্রুটি না খুঁজে এখন নিজের কথায় ফিরে যাই।

আকাশ ভ্রমণের উন্নতির সাথে যাতায়াত অনেক সুলভ ও সহজ হয়ে গেছে। ভাড়ার পয়সাটা জোগাড় হলে আর কে ঠেকাতে পারে? তবে পকেটভরা অর্থ থাকা সত্ত্বেও আকাশ

ভ্রমণে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তা বিমানযাত্রীরা কোনো না কোনো সময় অবশ্যই উপলব্ধি করেছে। তাই আজ আমার ঐতিহাসিক ভ্রমণের গল্প শুরু করার সঙ্গে নিজের উড়ে বেড়ানোর কিছু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে চাই, যাতে সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

বলা বাহুল্য, আকাশ ভ্রমণের উন্নতি, গতি ও সুবিধা এখন এতই উন্নত হয়েছে যে সবাই পাখির মতো শূন্যে উড়তে চায়। উড়োজাহাজের অনেক সুবিধা সত্ত্বেও সকলেই কিছু না কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে – হয় এঞ্জিনের দোষ, নয় আবহাওয়ার কারণ, নয় মালপত্র হারিয়ে যাওয়া। এসব ক্ষেত্রে দুর্ভোগের আর অন্ত থাকে না। আমার নিজের এ ধরনের কিছু অসুবিধাজনক ঘটনার কথাই আজ বলব।

একবার কুয়ালালামপুর থেকে বাংলাদেশী বিমানে ঢাকায় ফিরছি। আমার স্থানীয় আত্মীয় পরিবার এয়ারপোর্টে চেক-ইন শেষ হবার পর বিদায় নিলেন। তখন রাত আটটা। প্লেন ছাড়ার কথা ন'টায়। অপেক্ষা করতে করতে সাড়ে আটটা পেরিয়ে ন'টাও বেজে গেল; তখনো প্লেনে ওঠার ঘোষণা শোনা গেল না। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল প্লেনের এঞ্জিনে সমস্যা, ঠিক করার চেষ্টা চলছে। সাড়ে ন'টা বেজে গেল। তবু বিমানের তরফ থেকে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। এক অফিসারের কাছে জানা গেল প্লেনের সমস্যা দূর করতে রাত বারোটাও বেজে যেতে পারে। কিন্তু তারা আমাদের কোনো হোটেলে পাঠানোরও চিন্তা করছে না। রাতের খাবার তো বাতিলই মনে হচ্ছে। যাত্রীদের পেটে ইঁদুরের লাফালাফি শুরু হয়েছে। বিষয়টার একটা সমাধান করার জন্য আমরা কয়েকজন যাত্রী প্লেনের অফিসারের সাথে কথা বলতে গেলাম। জানা গেল প্লেনে প্যাসেঞ্জারের রক্ষিত খাবার প্লেনের বাইরে দেওয়া সম্ভব নয়। হৈচৈ শুনে ম্যানেজার জানালেন, "ঠিক আছে, আমরা কিছু ব্যবস্থা করছি।" এক ঘন্টার ওপর অপেক্ষার পর খাবার টেবিলে বসার আমন্ত্রণ এল। সবার সামনে সদ্যরাঁধা ভাত, ডাল, শাক আর মাছের তরকারি পরিবেশন করা হ'ল। আমরা হয়তো বা একটু অধৈর্য হয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্তই হৈচৈ করেছিলাম। কিন্তু ওরকম না করলে তো পেটের ক্ষুধা নিয়েই রাত কাটাতে হতো। বাঙালির তো পেটুক বলে সুনাম আছে, তাই সময়মতো খাবার না পেলে খুব মুশকিল!

আর এক বিমান ভ্রমণের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। BOAC-র ফ্লাইটে বস্টন বিমান-বন্দর থেকে লন্ডনে প্লেন বদল করে আমি দেশে ফিরছি। প্লেন কিছুটা দেরি করেই বস্টন থেকে রওনা হয়েছে। লন্ডনে হিতরো এয়ারপোর্টে পৌঁছে জানা গেল আমার কানেকটিং ফ্লাইট আধঘন্টা আগে রওনা হয়ে গেছে। তাহলে এখন কী হবে! BOAC-র পরবর্তী ফ্লাইট এক সপ্তাহ পর। যদি এক সপ্তাহ আমি লন্ডনে অপেক্ষা করতে না চাই তাহলে বাংলাদেশী এয়ারলাইনে সেদিনই যেতে পারি। লন্ডনে আমার সেরকম পরিচিত কেউ ছিল না, তাই দেশী বিমানে যাওয়াই সমীচীন মনে হ'ল। বিমান কাউন্টারে দাঁড়িয়ে জানা গেল এখানেও নাকি এঞ্জিনের গন্ডগোল। তাদের ফ্লাইটও সেদিন আকাশে উড়বে না। তাহলে কী করব! বিমান কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য বলল, আমি তো তাদের যাত্রী নই, কাজেই আমার সমস্যার সমাধান তারা করতে বাধ্য নয়। মহা মুশকিল! আমি তাহলে কার দায়িত্ব? নিজের গ্যাঁটের পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে যাত্রা শুরু করেছি। প্লেন মিস করার জন্য তো আমি দায়ী নই। কয়েকবার ব্রিটিশ কাউন্টার আর বিমানের কাউন্টারে হাঁটাহাঁটি করার পর নিরুপায় হয়ে বিমান আমাকে সে রাতের মতো হোটেলে ব্যবস্থা করে দিল। হোটেলের একতলায় একটা ঘর পেলাম। পরদিন সকাল ১০টায় এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর কথা জানিয়ে হোটেলের ট্যাক্সিতে তারা আমাকে পাঠিয়ে দিল।

পরদিন সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে দশটার আগেই হিতরোতে পৌঁছালাম। বিমান কাউন্টারের লাইনে দাঁড়ালাম। ১১টা বাজল, ১২টাও বেজে গেল, কী ব্যাপার, প্লেন ছাড়বে কখন? বার দু'তিন "এই তো, কিছুক্ষণ পরেই" জবাব পাওয়া গেল। তারপর বিমানের লোকজন আর আমাদের প্রশ্নের জবাবও দিচ্ছে না। বেলা ১২টায় জানা গেল সেদিনও প্লেনের সমস্যা। বিমান সেদিন উড়বে না। তাহলে আমি কী করব? হোটেল থেকে চেক আউট করে এসেছি। সে হোটেল এখন ভর্তি হয়ে গেছে। আরেক হোটেলে যেতে হবে। সেখানে নিচের তলায় কোনো ঘর খালি নেই। চার তলার ঘর খালি আছে। তাহলে উপায়? আমার যে আবার এলিভেটরে সমস্যা। আমি একা এলিভেটরে ওঠানামা করতে ভয় পাই। এরকম সমস্যা আমি কীভাবে সামলাই সে গোপন কথাটা এবার বলি। লিফ্টের

দরজার সামনে পায়চারি করি অন্য যাত্রীর অপেক্ষায়। যেইমাত্র আরেক যাত্রী লিফ্টে ঢোকে, আমিও চট করে তার সাথে ঢুকে পড়ি। আর তা না হলে সিঁড়ি তো আছে, তাতেই তরতরিয়ে ওঠানামা করি। সেসব বয়সে পাদুটো কোনো আপত্তি করেনি।

পরদিন সকালে আবার হোটেল ছেড়ে মাল নিয়ে হিতরো এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম। প্লেনের অপেক্ষায় লাইনে দাঁড়ালাম। সেদিনের অবস্থাও সেই একই দাঁড়াল। বেলা ১২ টায় জানা গেল প্লেন সেদিনও উড়বে না। তার মানে আবার হোটেল! হঠাৎ মনে পড়ল কেমব্রিজবাসী আমার দেশের এক প্রফেসর ও তাঁর স্ত্রীর কথা। কিন্তু কেমব্রিজ তো লন্ডন থেকে বেশ দূরে। তাঁর নম্বর খুঁজে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বলায় তাঁরা আগ্রহের সাথে তাঁদের আতিথেয়তা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছাব কী করে? প্রফেসর আমাকে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে কেমব্রিজের অর্ধেক রাস্তার নির্দেশ বলে দিলেন। সেখানে তিনি আমার অপেক্ষায় ছিলেন। তারপর আমরা কেমব্রিজগামী ট্রেনে তাঁর বাসায় গেলাম। সপ্তাহের বাকি কয়েকদিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে নির্ধারিত দিনে হিতরোতে গিয়ে BOAC-র প্লেনে উঠলাম। এবারে ভ্রমণের এই ডামাডোলে পড়ে উচ্চশিক্ষার পুরনো কেন্দ্র কেমব্রিজ শহরটা বেশ ভাল করে বেড়ানো হ'ল। আর আমার প্রফেসর ও তাঁর স্ত্রীর সান্নিধ্যে সময়টাও খুব আনন্দে কাটল। সেই প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেল, "every dark cloud has a silver lining" প্রতিটি কালো মেঘের কিনারে থাকে রূপালী রেখা।

এর পরের ঘটনাস্থল ছিল ইউরোপ থেকে মেক্সিকো যাবার পথে। আমি তখন আমেরিকার ভারমন্টে মাস্টার ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করছি। ভারমন্ট আমেরিকার পুরোপুরি উত্তরে, দারুণ শীত। ডিসেম্বর মাসে ক্যাম্পাস ছেড়ে সবাই যে যার সুবিধার জায়গায় চলে গেছে। পুরু বরফে ক্যাম্পাস, রাস্তাঘাট, বনজঙ্গল ঢেকে গেছে। প্রথমদিকে বরফ পড়লে সবার সাথে স্লেডে চড়ে বরফ ছোঁড়াছুঁড়ি করে হৈহুল্লোড়টা ভালই লাগত। কিন্তু বরফে আমার খুব অসুবিধা হয়। তাই ইউরোপের জেনেভা শহরে আমার ভাইয়ের কাছে শীতের ছুটিতে চলে গেলাম। সেখান থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মেক্সিকোতে যাবার সময় নাজেহাল অবস্থার কথাই আজ বলব।

কিন্তু সে বিবরণ লিখতে গিয়ে আমার জেনেভার আরেক মজার ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। জেনেভা থেকে বেশ অনেকটা দূরে উঁচু বরফে ঢাকা পাহাড়ের কোলে শামনি বলে এক ছোট্ট এলাকায় ভাইয়ের এক স্থানীয় বন্ধুর বাসায় যাবার সিদ্ধান্ত হ'ল। ভাইয়ের গাড়িতে দু'ঘন্টা পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে পাহাড়ের কোলে শামনিতে বেলা ১২টা নাগাদ পৌঁছালাম। আমাদের অভ্যর্থনা করে ভাইয়ের বন্ধু বাজারে গেলেন। নানা ধরনের পনির ও সুরার বোতল নিয়ে তিনি ফিরলেন। একটা মাটির হাঁড়িতে ওগুলো এক এক করে মিশিয়ে একঘন্টা ধরে নেড়েচেড়ে রাঁধলেন। তারপর টেবিলের মাঝখানে ছোট হালকা আঁচের আগুনের উপর হাঁড়িটা বসালেন। তারপর বাটিভর্তি টোস্ট রুটির ছোট ছোট টুকরো অতিথিদের সামনে পরিবেশন করলেন। বোঝা গেল কাঁটা দিয়ে রুটির টুকরো তুলে সেই পনির ঘন্টর মধ্যে ডুবিয়ে মুখে পুরতে হবে। ভাল মনে এক টুকরো সেভাবে উঠিয়ে যেই না মুখে পুরেছি অমনি বুঝলাম এ আমি গলা দিয়ে পাঠাতে পারব না। আমার ভাইয়ের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখভঙ্গিও আমার চাইতে খুব ভিন্ন নয়। তবে সে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও ভদ্রতার খাতিরে কোনোমতে কয়েক টুকরো গিলতে চেষ্টা করছে আমার পক্ষে তাও সম্ভব হ'ল না। শুধু সেই রুটির টুকরোগুলো দিয়ে আমি সেদিন ক্ষুধা নিবৃত্তি করলাম। সেই ঘটনার কথা চিন্তা করে এখনো কুল কিনারা পাইনি যে কেন সেদিন ও খাবার আমার মুখে এত বিস্বাদ মনে হয়েছিল। আমি পনির পছন্দ করি আর ফন্ডু তো সবাই বলে খুবই সুস্বাদু খাবার! সাধারণত খাবার নিয়ে কারো বাসায় আমার ঝামেলা করার অভ্যাস নেই। তাহলে কেন এমন হ'ল সেদিন সে এখনো রহস্যই থেকে গেছে।

এবার মেক্সিকোর পথে ওড়ার গল্প শোনাই। মেক্সিকো রওনা দেওয়ার দিনদুয়েক আগে জেনেভায় অবিরাম বরফ পড়ায় বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, জেনেভা লেক সব সাদা বরফে ঢেকে গেল। বিনা প্রয়োজনে মানুষ বাইরে বেরোচ্ছে না। আমার বুকিং ছিল সুইস এয়ার লাইনে। ওড়ার ব্যাপারে তারা মনে হয় বেশ সাবধানী ও খুঁতখুঁতে। আমার ডিগ্রি প্রোগ্রামের কারণে মেক্সিকো যাত্রা বাতিল করাও সম্ভব ছিল না। এয়ারলাইন ফোনে এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পরামর্শ দিল। মালপত্র প্লেনের আওতায় দেওয়ার পর জানা গেল এরোপ্লেন সেদিন উড়বে না। কবে উড়বে সঠিক জানা নেই। আমি ফ্লাইটের তারিখ বদলাতেও

সাহস পাচ্ছি না | সময়মতো না পৌঁছালে আমার মেক্সিকোর প্রোগ্রামে যে দেরি হয়ে যাবে! সারাদিন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করে বাসায় ফিরে এলাম | পরদিন এয়ারপোর্ট থেকে জানাল যে আমি এয়ার ফ্রান্সের এরোপ্লেনে ফ্লাই করতে পারি |

নিরুপায় আমি রাজি হলাম | মেক্সিকোতে পৌঁছালাম | কিন্তু আমার মালপত্র তখনো সুইস এয়ারের জিম্মায় | আমার কাপড়চোপড়, পড়ানোর সরঞ্জাম সবই আমার চেক-ইন ব্যাগেজে | আমাদের প্রোগ্রামের সুপারভাইজার এয়ারপোর্টে এসেছিলেন | তাঁর পরামর্শে হারানো ব্যাগের ক্ষতিপূরণ হিসাবে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য ১০০ ডলারের আবেদন করলাম | কিন্তু টাকাটা কেনাকাটার পর রশিদ জমা দিয়ে ফেরত পাওয়া যাবে | কোনো উপায় নেই – সেদিন ছিল শনিবার রাত | সুপারভাইজার আশ্বাস দিলেন পরদিন সকালে মার্কেটে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে সাহায্য করবেন |

পরদিন রবিবার খোলা বাজারের মেলা থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনলাম | কিন্তু এরোপ্লেন জার্নির পোশাক পরেই কাজের এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে হ'ল | পরের সপ্তাহ শেষে বিকেলে সুপারভাইজার দুই হাতে আমার দুটো সুটকেস নিয়ে হোস্ট ফ্যামিলির দরজায় হাজির | বাহবা না দিলে চলে না এদেশের কর্মপরায়ণতার | কিন্তু এয়ারলাইনের কাছে রশিদ জমা দেওয়ার প্রায় তিনমাস পর ভারমন্টে ফিরে গিয়ে সেই ১০০ ডলার ফেরত পেলাম | এরপরও কি সবাই দিব্যি দিয়ে বলতে পারে যে আকাশে পাখির মতো বা রূপকথার জাদুগরের মতো ম্যাজিক কার্পেটে উড়তে পারলেই জীবনের সব সমস্যা সমাধান হয়ে মানুষের স্বপ্ন অতি অনায়াসে, নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে পূরণ হয়ে যায়?

এরকম আরো কিছু আকাশ ভ্রমণের হয়রানির অভিজ্ঞতা আমার এবং সব ভ্রমণকারীরই আছে | কিন্ত তা সত্ত্বেও ভ্রমণের কথা শুনলেই সবার মন খুশিতে ভরে ওঠে | তবে এখন যে বয়সে এসে দাঁড়িয়েছি, মন নেচে উঠলেও শরীর তার সাথে তাল মেলাতে না পারার ব্যর্থতায় আপত্তি জানায় | তাই ভ্রমণের আনন্দ স্মৃতির মণিকোঠা থেকে প্রায়ই বের করে এনে তার স্বাদ উপভোগ করি |

হকুণ্ড'র দার্জিলিং ভ্রমণ (সত্য ঘটনা)

স্যমন্তক দত্ত

বাঙালির চিরকাল দার্জিলিং-এ যাবার শখ | কিন্তু এককালে সেটা খুব সহজ ছিল না | অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতো | ১৮৭৮-এ North Bengal State Railway সাধারণ লোকজনের জন্য খুলে দেওয়া হ'ল | তবু কি যাওয়া সহজ ছিল? হাওড়া থেকে ট্রেনে চড়ে নদিয়া, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর পার হয়ে মধ্যরাত্রে হার্ডিঞ্জ সেতুর ওপর দিয়ে পদ্মানদী পেরিয়ে আসত সাহেবগঞ্জ | সেখানে জাহাজে গঙ্গা পার হয়ে কারাগলা ঘাটে পৌঁছে গরুরগাড়ি করে পুরনিয়া | পুরনিয়া থেকে শিলিগুড়ি | সেখান থেকে রিক্সা নিয়ে Hillcart Road | এরপর ছোট ট্রেন | পুরো যাত্রা – যেতে ছ'দিন, আসতে ছ'দিন!

আমাদের হিরো হকুণ্ড ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম | সত্যবাদী, কোনদিন কথার খেলাপ হতো না | ইংরেজদের অফিসে সকাল সন্ধ্যে কলম পিষে সাহেবদের অতি প্রিয় | তিনি বিয়ে করেছিলেন মজিলপুরে আমার দেশের বাড়ির দূর সম্পর্কের আত্মীয় বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কালিনাথ দত্তর দ্বিতীয় কন্যা হেমন্তকে | কাজ করতেন ঢাকা Royal Indian Agricultural Department-এ | তাঁর সাহেব ছিলেন North Brook Hamilton, in short, 'NBH' | তাঁকে ফাইলে NBH সই করতে দেখে আমাদের হর কুমার গুহ নিজের নাম ছোট করে 'হকুণ্ড' করেছিলেন | আমাদের গল্প অবশ্য তাঁর বিবাহের আগের |

একবার অনেক কষ্ট করে হকুণ্ড ছুটি পেলেন | পয়লা এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল | যাবেন দার্জিলিং-এ | গোলাপফুল আঁকা ছোট টিনের বাক্স এবং একটা দড়িবাঁধা বিছানা, হকুণ্ড ঢাকা ইস্টিশানে ঢুকে দেখলেন পয়লা এপ্রিল থেকে ট্রেনের টাইম পাল্টে গেছে | দার্জিলিং যাবার ট্রেন দশমিনিট আগেই ছেড়ে গেছে | হকুণ্ড কোনদিন কথার খেলাপ করেননি | আজও করলেন না | তিনি মাথায় বাক্স আর বগলে বিছানা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন! দার্জিলিং পৌঁছোতে তাঁর ২৪দিন লেগেছিল | একদিন ঠাণ্ডা পাহাড়ে কাটিয়ে পরের দিন ট্রেন ধরলেন | ৩০ তারিখে ঢাকায়, তার পরের দিন অফিস!

একেই বলে চরিত্র! আমরা কোন ছার |

চিলেকোঠার আয়না: দ্বিতীয় পর্ব

সফিক আহমেদ

চুঁচড়োর মগরাতে যৌথ পরিবারে মানুষ হয়ে ওঠার সুবাদে মা, মাসি আর কমলিমাসির মুখে চিলেকোঠার আয়নার অর্ধ-সত্য অর্ধ-কল্পিত ইতিহাস শুনে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ আর আকর্ষণ অনুভব করতাম ওই প্রবেশ-নিষিদ্ধ রহস্যময় চিলেকোঠায় যাওয়ার জন্য। সবাই যখন দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকত বা ছুটির দিনে অলস দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকত, আমি তখন কারণে অকারণে সবার নজর এড়িয়ে ছাদের দরজার খিল খুলে চলে যেতাম চিলেকোঠার ঘরে।

সেখানে দেখতাম আলসেতে বসে কর্কশ স্বরে এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে কাকের সভার সদস্যরা। কখনো এক সর্দার গোছের কাক দোর্দন্ড প্রতাপে হেঁকে উঠছে আর বাকি সদস্য কাকেরা যে যার মতো উত্তর দিচ্ছে বা কখনো কখনো সমস্বরে চেঁচাচ্ছে। এই হৈচৈ-এর মধ্যে আমজনতার মতো চড়ুইপাখির দল মাথা নিচু করে ছাদের চাতালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্ন সংগ্রহে ব্যস্ত। তাদের কিচিরমিচির খেটে খাওয়া জনসাধারণের স্বরের মতোই চাপা পড়ে যাচ্ছে উচ্চবর্গের উচ্চৈঃস্বরে।

সেই ঠা ঠা রোদ্দুরে ফ্যাকাশে নীল আকাশের মেঘেরাও দল বাঁধতে পারত না, কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে ভেসে থাকত। এই অকাব্যিক প্রেক্ষাপটে রঙ আনত আমাদের আশপাশের ছাদে দড়িতে ঝোলানো রঙ-বেরঙের শাড়িগুলো। কোনটা লাল, কোনটা হলুদ বা সস্তা ছাপা ফুল-লতা-পাতা, কোনটা এক্কেবারে সাদা – তাতে সরু সুতোর মতো পাড়। একেকটা রঙ বা রঙহীন শাড়ি এক একটা গল্পের প্রচ্ছদ যেন। এর পেছনে লুকিয়ে আছে হয়তো একেকটা আস্ত জীবনের গল্প। আমার সেই কল্পনার জগতে ছন্দপতন ঘটাত রঙচটা ঝুলন্ত ম্যাক্সিগুলো। এই ছিরিছাঁদহীন বস্ত্রখন্ড কখন যে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের জীবনে নিদ্রাবস্ত্র থেকে সারাদিনের অঙ্গবস্ত্র হয়ে উঠেছিল কে জানে! এতে না আছে শাড়ির রোম্যান্টিকতা, না আছে পাশ্চাত্য পোশাকের আধুনিকতা। এ যেন আগেকার দিনের হোল্ড-অল বা নিতান্ত পাশ-বালিশের খোলের সমগোত্রীয়। এ যেন পুরুষদের লুঙ্গির নারীবাদী প্রতিবাদের প্রতীক। এমনকী, মাঝে সাঝে এই অল-পারপাস নাইটি-কাম-ম্যাক্সির উপরে একটা ওড়না বা হাফ চাদর জড়িয়ে আব্রু রক্ষা করে মেয়েদের পাড়ার দোকানে বাজার করতেও দেখা যায়।

যাইহোক, ফিরে আসি মূল গল্পের স্রোতে – আমার তখন উঠতি বয়স। সদ্য যৌবনের চিহ্ন ফুটে উঠছে দেহে। অপার কৌতূহলে নিজের দেহকে দেখা আর শিহরিত হয়ে ওঠার সাক্ষী এই চিলেকোঠার আয়না। সরস্বতী পুজোর দিনের কিশোরী প্রেমের প্রথম উন্মেষ বা আমার একান্ত আপন মুহূর্তেও দিনের শেষে ফিরে যেতাম এই আয়নার কাছে; নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করে দিতাম। নিজেকে আবিষ্কার করতাম, কখনো লজ্জায় অবনত হতো দৃষ্টি, কখনো পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম আমার নারীত্বের সম্পদের দিকে। স্কুল পেরিয়ে কলেজ, নতুন প্রেমিক, উদ্ভিন্ন যৌবনা নারীত্ব, আমার দেহবল্লরী, এই আয়না আমাকে করেছিল গর্বিত। আয়নাকে সাক্ষী রেখে নিজের মুখেই বলছি আমি ছিলাম অসামান্যা সুন্দরী।

কলেজ জীবনের ছাত্র-ছাত্রীদের আলোচনার শিরোনামে থাকত আমার আর সপ্তর্ষির প্রেম। মফস্বল কলেজ ক্যান্টিনে, গঞ্জের হাটে বা কখনো গঙ্গার ধারে বটের নিচে আমাদের অবাধ মেলামেশার খবর পৌঁছাতে দেরি হয়নি আমাদের প্রাচীনপন্থী বাড়ির অভিভাবকদের কাছে। চিরাচরিত ফিল্মি কায়দায় সম্বন্ধ আনতে শুরু করল বাড়ির অভিভাবক আর শুভাকাঙ্ক্ষী-বেশী আত্মীয়-অনাত্মীয়রা। কলেজের প্রেমিক সপ্তর্ষি আমাকে ধরে রাখতে পারেনি। প্রেম আর প্রাচুর্যের উভয় সংকটে আমিও কেমন যেন রূপের দেমাকে প্রাচুর্যের দিকেই ঢলে পড়লাম। সম্বন্ধ করে বিয়ে করে নিয়ে গেল বয়সে বেশ খানিকটা বড়, প্যারি ক্লারা LLP, লন্ডনের প্রতিষ্ঠিত ল-ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং ওয়ার্কিং পার্টনার পরিতোষ চাকলাদার।

এরপর মগরা ছেড়ে আসার দিন শেষবার দেখা করে এসেছিলাম আমার একান্ত আপন চিলেকোঠার আয়নার সাথে।

এর পরের জীবন একটু ফাস্ট-ফরওয়ার্ড করে আজকের দিনে চলে এলে গল্পটা দাঁড়ায় এইরকম – আমি এখন রিচমন্ডের বাসিন্দা। রিচমন্ডের পুরো নাম Royal Borough of Richmond upon Thames, লন্ডন সাবার্বে বসবাসের জন্য সবচেয়ে নামকরা এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম। রিচমন্ডে ইউরোপের বৃহত্তম শহুরে পার্কে (রিচমন্ড পার্ক) প্রাতঃভ্রমণ আর সন্ধ্যায় টেমস নদীর তীরে মনোরম হাঁটাহাটি করার রুটিনে

কোনোদিনই ব্যতিক্রম হয় না আমার | বিলাসবহুল জীবন, প্রাসাদোপম বাড়ি, এন স্যুট বাথরুম আর মার্বেল ফিনিশসহ একটি দুর্দান্ত বেডরুম স্যুইট। ঘর থেকে টেমস নদী এবং ওল্ড ডিয়ার পার্কের চমৎকার 'সবুজ' দৃশ্য দেখা যায়। ড্রেসিংরুমে তিন-দেয়াল-জোড়া আয়না। এই আয়না আজ আমায় দেখিয়ে দেয় দিনে দিনে যৌবন পেরিয়ে কালের ছাপ পড়ছে সর্বাঙ্গে। এত ঐশ্বর্য প্রসাধনী, বোটক্স, কসমেটিক সার্জারিও ফিরিয়ে আনতে পারছে না আমার চিলেকোঠার আয়নার আমাকে। আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে আমার দেহসর্বস্ব রূপের গর্ব যা নিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম সপ্তর্ষিকে, আমার প্রথম প্রেমিক।

"আজ আমি সর্বস্বান্ত। আজকাল আমি আর আয়না দেখি না। আমি আর আয়না দেখি না, ডাক্তারবাবু।"

লন্ডনের সবথেকে নামজাদা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার মুখার্জীর চেম্বারের নীল আলোতে এই পর্যন্ত বলে অনামিকা চাকলাদার সম্মোহনের গভীর জগৎ থেকে ফিরে আসে ধীরে ধীরে। বড় আলোটা জ্বলে উঠতে অনামিকা অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে সপ্তর্ষির দুহাত চেপে ধরে।

- "রূপের গরবে আমার বড় ভুল হয়ে গেছে সপ্তর্ষি | আমায় তুমি ফিরিয়ে নাও। ফিরিয়ে দাও আমার চিলেকোঠার আয়নার আমাকে।"

ডাক্তার সপ্তর্ষি মুখার্জী বেল দিতেই ঘরে ঢুকল সুন্দরী নার্স, মার্গারেট। রুপোলি চুল আর ভারী ফ্রেমের চশমাপরা সুপুরুষ ডাক্তার মুখার্জী প্রফেশনাল গাম্ভীর্য নিয়ে খস খস করে অ্যান্টি-ডিপ্রেশন প্রেসক্রিপশন লিখে ম্যাগিকে বললেন মিসেস চাকলাদারকে ওষুধটা বুঝিয়ে দিতে এবং এক মাস পরে আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিডিউল করতে।

বিধ্বস্ত, বিগতযৌবনা অনামিকার বেরিয়ে যাওয়ার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অকৃতদার সপ্তর্ষি দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে মনে মনে আওড়াতে লাগল কাল রাত্রে পড়া কবিতাটি –

'তোকে নিয়ে আবার আমার শুরু হ'ল স্বপ্ন দেখা
মোরাম দেওয়া নদীর পারে পা মিলিয়ে আবার হাঁটা
এলোমেলো গল্প কথার ফুলঝুরি আর তর্ক করা
ঠোঁট ফোলানো রাগ করা আর অভিমানের কালো ছায়া
মেঘ সরাতে ঝড় হয়ে তোর উড়িয়ে দিলাম আঁচলখানা
বিদ্যুতেরই এক চমকে আপন করে জড়িয়ে ধরা
অঝোর ধারায় বৃষ্টি এসে স্বপ্নটাকে ভিজিয়ে দিল
দুরন্ত এক ঝোড়ো-হাওয়ায় স্বপ্নটাকে উড়িয়ে দিল
পাড়ভাঙা এক বানের জলে স্বপ্নটাকে ভাসিয়ে দিল
ধেয়ে আসা দাবানলে স্বপ্নটাকে জ্বালিয়ে দিল
রুক্ষ, কঠোর বাস্তবতা স্বপ্নটাকে গুঁড়িয়ে দিল
গুমরে ওঠা কান্না আমার দিকবিদিকে ছড়িয়ে গেল

সম্মোহন-কক্ষের নীল আলোতে আত্ম-সম্মোহিত সপ্তর্ষি ভাবতে থাকে, আবারও কি একবার পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটা যায় মোরাম দেওয়া নদীর পাড়ের বদলে টেমস নদীর ধারের সাজানো গোছানো রাস্তায়!

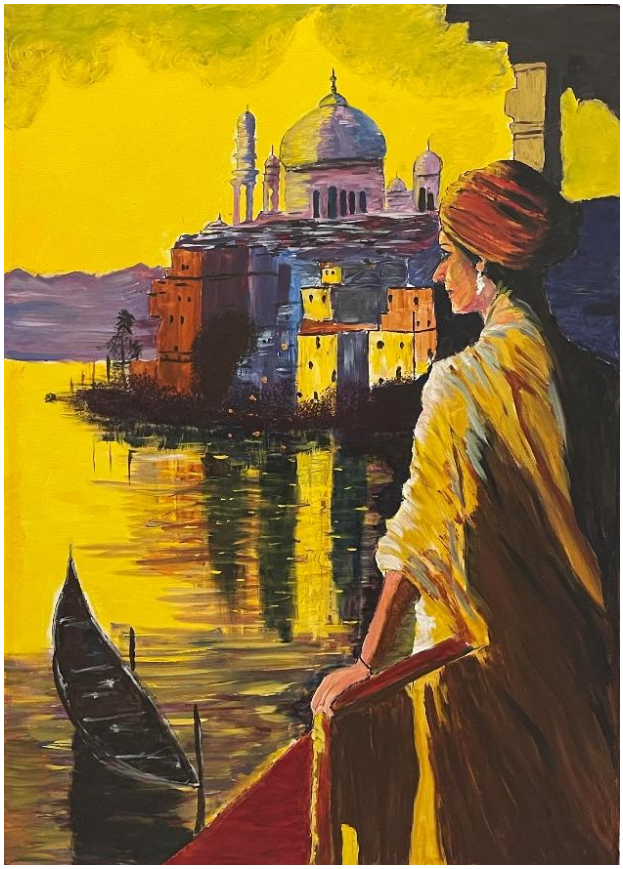

শিল্পী: সফিক আহমেদ

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি

শান্তনু চক্রবর্তী

রোলিক আইসক্রিম:

বিখ্যাত অভিনেতা সংযম সরকারের বাড়িতে সাংবাদিক এসে ইন্টারভিউ নিয়ে চলে যাবার পর ওঁর দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন:

- বাবা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
- একটা কেন মা, হাজারটা জিজ্ঞেস কর না! আমি আজকের মতো ফ্রি।
- তাহলে আজ আর শুটিং নেই?
- না।
- হিহি, আসলে আমি তোমার ইন্টারভিউ একটু লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছি।
- দুষ্টু মেয়ে, তুই আড়ি পেতেছিস?
- কী করব বলো, তোমরা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলছিলে যে!
- যেমন?
- স্বপ্নের খুনী, পর পর ছক্কা আর নীল সাগরের রাজপুত্র – এই সিনেমাগুলো তো আমার খুব প্রিয়।
- হ্যাঁ, এগুলো সব ছোটদের ছবি। আমি সবগুলোতেই ছিলাম। সৃজিতের স্বপ্নের খুনী, শিবদের পর পর ছক্কা বা রাজের নীল সাগরের রাজপুত্র – সবগুলো ছবিই খুব পপুলার হয়েছিল।
- এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে বাবা। যাঁদের কথা বললে, এঁরা সবাই তোমার চেয়ে বড় না?
- হতে পারে। তুই কী করে জানলি?
- এ আর এমন কী বাবা? গুগল দেখলেই জানা যায়! তুমি তো এইট্টিটুতে বর্ন, আর এঁরা সবাই সেভেন্টিজ-এ। তাই না?
- তাই হবে। তুই যখন বলছিস, তাহলে তাই।
- তাহলে বাবা, তুমি ওঁদের নাম ধরে ডাকো কেন? ইন্টারভিউয়ের সময়ও তুমি ওঁদের নাম ধরেই বলছিলে।
- কারণ আমরা বন্ধু, একই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি।
- কিন্তু বাবা, আমাদের কমপ্লেক্সের সুমেধামাসীর ছেলে গিলুদা বা মেয়ে গিলিদি তো আমার বন্ধু। আমি প্রথম প্রথম ওদের নাম ধরে ডেকেছিলাম বলে তুমি আর মা আমাকে বকোনি, বলো?
- ও হ্যাঁ, ঠিকই তো বলছিস!
- তাহলে আমিও কি ওদের আবার নাম ধরে ডাকা শুরু করব?
- না না, এতদিন দাদা-দিদি ডেকে নাম ধরে ডাকলে ওরা খুব খারাপ ভাববে।
- তাহলে তুমিও কি এখন থেকে সৃজিৎদা, শিবুদা, রাজদা – এরকম বলবে?
- সেটাই বা কী করে সম্ভব? এতদিন নাম ধরে ডেকে এবারে কী করে...
- তাহলে আমিও গিলু আর গিলি বলব, হিহিহি!
- নারে মা, প্লীজ না, চল তোকে রোলিকের আইসক্রিম খাওয়াই!

হজমোলা:

ভ্যালেন্টাইনস্ ডেতে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা মফস্বলের এক মলে ইন্দোচাইনীজ রেস্তোরাঁয় ডিনার সারছিল। ওদের মধ্যে এরকম কথোপকথন হচ্ছিল:

- এটা আমাদের থার্ড ভ্যালেন্টাইনস্ ডে, অঙ্কন। এবারেও তুমি পারলে না। সব বারই তুমি বলো – সাউথ সিটিতে যাব আমরা, মেনল্যান্ড চায়নায় খাব। কিন্তু শেষমেশ সেই কম্প্রোমাইজ।
- কিন্তু এদের খাবারটা তো ভাল!
- ওই আরকি।
- আগেরবারেরটাও কিন্তু খারাপ ছিল না।
- এগুলো অক্ষমের সান্ত্বনা, অঙ্কন। এ তো তাও ভাল। মাসের শেষ আসতে এখনো দেরী, তাই আমরা অ্যাট লীস্ট কোথাও এসে ডিনার করতে পারছি। আমার জন্মদিন বা আমাদের প্রথম দেখার দিন – এগুলোতে তো কেক এনেই দায়িত্ব সেরে ফেলো!
- সত্যিই সরি। তোমার জন্মদিন আর আমাদের প্রথম দেখা হবার দিন – দুটোই মাসের শেষে। সেসময় আমি চোখে সর্ষেফুল দেখি। ভেবেছিলাম এবারে ইনক্রিমেন্ট হবে। কিন্তু এরা শুধু মুখেই বলে। শেষ মুহূর্তে কোনো না কোনও বাহানায় কাটিয়ে দেয়।
- মাঝে মাঝে ভাবি ঠিক করলাম কিনা তোমাকে ভালবেসে। এখনও পর্যন্ত তো আমাদের বিয়ে হয়নি। বিয়ে হলে সংসারের খরচা কী করে সামলাবে?
- একদিন দুজনে একসঙ্গে বসে প্ল্যান করতে হবে। আজ বরং ভ্যালেন্টাইনস্ ডেতে একটু অন্য কথা বলি, চলো।
- তোমার অন্য কথা মাথায় আসছে, অঙ্কন? বিয়ে হলে তোমার

এই মাইনেতে আমাদের কুলোবে না।

- বেশ, তাহলে এই প্রসঙ্গই চলুক। আচ্ছা রচিতা, তুমিও তো চাকরি করো।

- তাতে কী?

- তুমি বললে থার্ড ভ্যালেন্টাইনস্ ডে। তিনবারই তো আমি খাওয়ালাম। কখনো তোমারও তো খাওয়ানোর কথা, তাই না?

- ঠিক আছে, নেক্সটবার আমি খাওয়াব।

- তারপর আমার জন্মদিন তো ৮ই এপ্রিল, মাসের শুরু। তুমি কি গ্রিটিংস কার্ড ছাড়া গত দুবার আমাকে কিছু দিয়েছ? একটা কেকও কি এনেছ কোনোবার?

- সরি, ওটা ভুল হয়ে গেছে।

- আর তুমি কি কোনোবার আমাদের ফার্স্ট মিটিং ডেতে কখনো কিছু কন্ট্রিবিউট করেছ?

- ওকে, এখন থেকে করব।

- তাহলে আমিই শুধু অক্ষম?

- সো সরি অঙ্কন। এবার থেকে সত্যি খেয়াল করব। আসলে অফিসে এত চাপ না...

- ঠিক আছে, তাহলে তোমার অফিস, বাড়ি এগুলো নিয়েই ভাবো। আমি কাটি।

- না, প্লিজ না, অঙ্কন। আজকে আমিই খাওয়াব।

- আজ তো আমি পে করে দিয়েছি।

- না, আসলে তো অনেক খাওয়া হয়েছে, ডাইজেস্ট হতে হবে তো! এই নাও হজমোলা...

একটি সিগারেট:

ইউটিউবের দুর্জয় সেন তার চ্যানেলের জন্য একটি পডকাস্টে ডেকেছিল বিখ্যাত পরিচালক তমোনাশ ব্যানার্জীকে। সম্প্রতি তমোনাশবাবুর ছবি 'মার্কিন মুলুকে উল্কাপাত'-এর প্রোমো সংক্রান্ত ব্যাপারে এই ইন্টারভিউ বা পডকাস্ট। সেই পডকাস্টের কিছু অংশ:

- আচ্ছা তমোনাশদা, আপনার তো অনেকগুলো বছর হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিতে। কী মনে হয়, এখনো সেই প্রথমদিককার উৎসাহ, উদ্দীপনা বজায় রয়েছে?

- আসলে জানো তো, এই উৎসাহ-উদ্দীপনার ব্যাপারটা বয়সের সঙ্গে ঠিকমতো তাল মিলিয়ে চলে না। যেমন ধরো, মাঝখানে একটা সময় আমার সত্যিই কিছু ভাল লাগছিল না। বিশেষ করে কোভিডের ঠিক আগের সময়টায়। সে সময় আমার পরপর তিনটে সিনেমা একদমই চলেনি – যদিও তিনটে সিনেমাই ছিল ভিন্ন স্বাদের। অনেক সাংবাদিকও তখন ধরে নিয়েছিলেন আমি শেষ। আমিও ভাবছিলাম আমি আর হয়তো ছবি করতে পারব না। কোভিডের পর যখন আবার শুটিং শুরু করলাম, তখন আত্মবিশ্বাস একেবারে তলানিতে। কিন্তু তিন বছর আগে আমার কোভিডের পরের প্রথম রিলিজ 'ঢেউয়ের পরে ঢেউ' যখন সুপারহিট হ'ল, তখন মনে হ'ল – নাহ, তাহলে সত্যিই শেষ হয়ে যাইনি।

- তমোনাশদা, আপনি এই যে ভিন্ন স্বাদের কথা বললেন, সেটা যেমন আপনার ক্ষেত্রে সত্যি, তেমনি অন্য যাঁরা নামীদামীরা রয়েছেন, তাঁদের মাধ্যমেও আমরা অনেক বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়ে থাকি। কিন্তু একটা কথা বলুন তো, সিনেমায় তো এখন সিগারেট খাওয়াটা প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু ওয়েব সিরিজগুলো এখনো তা থেকে মুক্ত নয়। ওয়েব সিরিজে সিগারেট যেন একটা বেশ বড় অংশ। আগে সিনেমাতেও তাই ছিল। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় – এঁদেরকে আমরা সিনেমার পর্দায় প্রচুর সিগারেট খেতে দেখেছি। আপনার এসব নিয়ে কি কোনো মন্তব্য আছে?

- আমি তো এখনো ওয়েব সিরিজ বানাইনি, কিন্তু যদি বানাই কোনোদিন, তখন নিশ্চয়ই ভেবে দেখব। যদি দেখি জনগণ সিগারেট জিনিসটা বেশ পছন্দ করে, তাহলে হয়তো আমিও রাখব।

- আচ্ছা, একসময় সিগারেট ছাড়া সিনেমা ভাবাই যেত না। এখন তো সিগারেট খাওয়া না দেখিয়েও সিনেমা সুপারহিট হচ্ছে। তাহলে সিগারেট ছাড়া ওয়েব সিরিজ কেন চলবে না?

- সিনেমা চলছে মানেটা আমরা সবাই জানি। সিঙ্গল স্ক্রিন কমে গিয়ে মাল্টিপ্লেক্স বেড়ে যাবার পর তো আরবান জনগণই এই ফিল্মগুলো দেখতে আসছেন। ওঁরা জানেন সিগারেটের কী পরিণতি! কিন্তু গ্রামেগঞ্জে এখনো হিরোকে সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে গুন্ডাবাহিনীকে পেটাতে দেখলে পাবলিক আনন্দে সিটি দেবে। অনেক মেয়ের কাছে সিগারেটে টান দেওয়া পুরুষের একটা ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাপিল রয়েছে। সেজন্য এই একবিংশ শতাব্দীতেও সিগারেটের চাহিদা শেষ হয়ে যায়নি।

- হয়তো ঠিকই বলেছেন, গল্পের নায়কের এই সিগারেটের

সুখটানকে বর্ণনা করতে গিয়ে ছোট-বড়-মাঝারি কত প্রিন্টিং প্রেসের কী ভীষণ পরিমাণ কালি খরচ হয়ে গেছে – তা ডেনসিটোমিটার দিয়ে মেপেও হয়তো কুলকিনারা পাওয়া যাবে না | তেমনি ছবির ক্ষেত্রেও কত লক্ষ ফুট ফিল্ম ব্যয় হয়েছে হিরোর এই সিগারেটের টান বোঝাতে, তারও কোনো মাপজোখ নেই | আপনার কি মনে হয় না, যে মাধ্যমই হোক, এই সিগারেট ব্যাপারটা এবারে বন্ধ হওয়া দরকার? সব জেনেশুনে আপনারা কেন দেখাবেন?

- সব ঠিক | যা বলেছ, তা নিয়ে দ্বিমতের কোনো প্রশ্নই নেই | বিশেষ করে সিগারেটের সবরকম অপকারিতার কথা জানবার পর | কিন্তু, সবকিছুর পরেও সেই একটি কথায় তো ফিরতেই হয় – আমরা বাঙালি | আর বাঙালিকে সিগারেট ছাড়া ভাবা বা কল্পনা করা একটু মুশকিল | বাঙালি হয়তো সিগারেটে সুখটান দিয়ে গুল্ডা পেটায়নি, সাহিত্যে-সঙ্গীতে-সিনেমায়-বিজ্ঞানে এই সিগারেটে সুখটান দিয়েই তার নৈপুণ্য দেখিয়েছে | এই এত বছরের নস্টালজিয়াকে ঝেড়ে ফেলা কি এতটাই সহজ? তবু আমি বলব – আজ থেকে দুশো বছর আগে তো সিগারেট ছিল না | তখন যদি মানুষ শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চা করেছে, তাহলে ভবিষ্যতেই বা পারবে না কেন?

- অনেক ধন্যবাদ তমোনাশদা আপনাকে | আপাতত একটু বিরতি | তারপর আপনার এই নতুন ছবি নিয়ে কিছু কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব | তার আগে একটু ছোট্ট ব্রেক |

- নিশ্চয়ই | তা, এই ছোট্ট ব্রেকের সময়টায় সিগারেট চলতে পারে?

- (মুচকি হেসে ক্যামেরাটা অফ করতে করতে) অবশ্যই, আমারও খুব সিগারেট পাচ্ছে | একটি সিগারেট ধরাতেই হবে!

খোলা মনে

প্রদ্যুৎ কুমার গুপ্ত

গাড়ি থেকে নামতেই চিৎকার শুনতে পেলাম – "কাকু এসেছে, কাকু এসেছে |" রূপা ছুটতে ছুটতে চলেও এল গাড়ির কাছে | গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর রূপা? কেমন আছ? তোমার বাবা কোথায়?" রূপা কোনও উত্তর দিল না | হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে | বলল, "কাকু, মা আমায় একটা নতুন খেলনা কিনে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে খেলব |" ওর হাত ধরে প্রায় দৌড়োতে শুরু করলাম |

নিউ ইয়র্কে নতুন এসেছি, দেশ-ফেরৎ অসফল এঞ্জিনিয়ার হিসেবে | আমেরিকার গল্প ও স্বপ্ন অনেক আবেশ এনেছিল দেশে | দেশকে তখনও ভালবাসতে শিখিনি | এঞ্জিনিয়ারিং পাস্ করে নতুন একটা জীবন আবিষ্কারের ইচ্ছায় কেরিয়ারটাকে নিয়ে যখন টানা-হ্যাঁচড়া করছিলাম, তার মাঝেই বেশ কয়েকজন বন্ধু আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েছে | ওদের প্রতিজনের যাওয়ায় আমার দীর্ঘশ্বাস জমে উঠছিল | হঠাৎ রূপকথার গল্পের মতো ভিসা চলে এল আমার হাতেও | দেরি করলাম না আর – মা-বাবার পায়ে হাত দিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে হিন্দি সিনেমার হিরোর মতন স্বপ্নদেশে পাড়ি দিলাম | ভাস্বতী একটু কান্নাকাটি করছিল একসাথে যেতে পারবে না বলে | গুরুজনরা কেউ কাঁদেনি – হয়তো বর্তমানের আনন্দে আর পাড়ায় বিখ্যাত হবার কথা ভেবে অন্য আর কোনো অনুভূতি ছিল না |

নিউ ইয়র্কে নেমে বিকাশদার সঙ্গে দেখা হ'ল | বিকাশদা আমার সিনিয়র, আমাদের কলেজ থেকেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস্ করেছিলেন | বেশ কয়েক বছর হ'ল এদেশে এসেছেন | দেশে থাকাকালীন শুধু মুখ-চেনা ছিল | এখানে এসে ওঁর দেখা পেয়ে খুব ভাল লাগল | বৌদির সঙ্গে পরিচয়টা জমিয়ে নিতে একটুও দেরি করলাম না | প্রতি উইকেন্ডেই নেমন্তন্ন থাকত বিকাশদার বাড়িতে | ভোজনরসিক হিসেবে আমার নাম ছিল দেশে | এদেশে এসে নিজের হাতের এবি-ডিবি (আলুভাতে, ডিমভাতে) আর চলছিল না | তার ওপর বিকাশদার দু'বছরের মেয়ে রূপা আমার বিরাট 'ফ্যান' হয়ে গেল |

কুইন্সে বিকাশদা ছোট্ট একটা বাড়ি কিনেছেন; বেশ ফাঁকা জায়গা – আশেপাশে কয়েকটা গাছ আর পাশ দিয়ে গেছে কাঁচা রাস্তা, যা সচরাচর এখানে দেখা যায় না। বিকাশদা আর বৌদি দুজনেই গানবাজনায় বেশ আগ্রহী। প্রায় প্রতি শনিবার বাঙালিরা সমবেত হতো তাঁদের বাড়িতে; তার সঙ্গে বসত গল্পদাদুর আসর – সেখানে আমেরিকার একটু আধটু গালাগালি, দেশে ফেলে আসা জীবনের কিছু আলোচনা এবং চাকরির গল্পে যখন ছেলেরা মশগুল থাকত, তখন আমি এক কোনায় রূপার সঙ্গে খেলা করছি। খাবার সময়েই শুধু আমার উপস্থিতি। আমার বরাবরই বাচ্চা ভাল লাগে। ওদের হাসি,সরলতা, অবুঝ কথা, মুখভঙ্গী সবকিছুই ভাল লাগে। রূপাকেও ভারী মিষ্টি লাগত। বাচ্চাদের মতো করে মিশতে পারতাম বলে বাচ্চারাও আমাকে ভালবাসত। রূপা তো আমাকে ছাড়তেই চাইত না। প্রতিবারই আমি চলে আসার পর খুব কাঁদত। বৌদি বলতেন, "রূপা তোমার দিদিমা ছিল আগের জন্মে।"

ভাস্বতী দেশ থেকে আসার পর বিকাশদার বাড়িতে যাওয়াটা একটু কমে গেল। রূপার সঙ্গে প্রায়ই টেলিফোনে কথা হতো। ও ওদের বাড়িতে যেতে বলত, অথচ আমারই যাওয়া হয়ে উঠত না। ভাস্বতীকে বলতাম, "আমার ঐসব শপিং সেন্টারে যাওয়া ভাল লাগে না।" ভাস্বতী বলত, "জানো, রূপা আমাকে হিংসে করে।" আমি হাসতাম, খুব হাসতাম; যেজন্য বাচ্চাদের ভাল লাগে। ওরা কোনকিছু ঘুরিয়ে চিন্তা করতে পারে না। বলতাম, "তোমরা নারীজাতি বুঝি তেমনই!"

প্রায় একমাস পরে গেছি বিকাশদার বাড়িতে। সামান্য একটু শীত পড়েছে – শরতের রোদ আর ঝরাপাতার মাঝে দিনটা ঝলমল করছে। ভাবলাম এমন দিনে রূপার সঙ্গে বাইরে বল লোফালুফি খেলতে ভাল লাগবে। রূপার সঙ্গে ওর টয়-রুমে গেলাম। বিকাশদা একটা বাচ্চাদের মুভি প্রজেক্টর দিয়েছেন জন্মদিনে, তাতে একটা ফিল্ম আছে। রূপা সগৌরবে ঘোষণা করল, "এটা আমার টিভি, কাকু – দেখো, কী সুন্দর!" আমি চালালাম, রূপাও দেখল, প্রশ্ন করল নানারকম; বুঝিয়ে বললাম। কিছুক্ষণ পরে বললাম, "রূপা বল খেলবে?" রূপা কোনো উত্তর দিল না। বল হাতে নিয়ে বাড়ির বাইরে ছুটে গেল। বল লুফতে না পেরে পড়ে যাচ্ছে, আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমি খেলছি আর ওকে দেখছি। হঠাৎ ও বলল, "কাকু, তুমি আর আমার জন্য কেয়ার করো না একটুও। আজকাল খেলা করতে আসো না।" আমি ওর মাথায় হাত রেখে মিথ্যে বললাম, "তোকে বলার জন্য গল্প বানাই, জানিস?" সঙ্গে সঙ্গে "গল্প বলো" বলে আমাকে টেনে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চলল।

এভাবেই রূপার সঙ্গে গল্প করে কাটত; আমার যেমন গল্প ফুরোয় না, তেমন রূপারও গল্প শোনার উৎসাহ ফুরোয় না। এরই মাঝে দেশ থেকে খবর এল ছোট ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। ভাস্বতী দেশে যেতে পারবে বলে খুব খুশি। দেশের বন্ধু-মহলে আমেরিকায় থাকার কারণে যে সম্মান পাবো সেটা চিন্তা করে পাড়ি দিলাম বিবেকানন্দের মৃত্তিকায়।

মাসখানেক পরে ফিরে এলাম; ভাস্বতী রয়ে গেল দেশের বন্ধুদের আমেরিকার গল্প শোনাবে বলে। ফিরে এসে শুনলাম বিকাশদা নতুন চাকরি নিয়ে টেক্সাসে চলে গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। অসহায় লাগল এত ভাল একজন বন্ধু এত দূরে চলে যাবার জন্য। রূপার অনুপস্থিতিটাই বেশি করে মনে লাগছিল, বিশেষ করে উইকএন্ডের দুপুরগুলোয়। ভাস্বতীকে আর বেশিদিন থাকতে দিলাম না দেশে। পরে অবশ্য শুনলাম ওর বন্ধুদের কাছে বলেছে, "দেখছিস, আমাকে ছাড়া ও একটুও থাকতে পারে না!"

কথায় বলে 'আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড'। প্রথম দিকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে, তারপর প্রতি মাসে আর শেষে বিশেষ কোনও কারণ ছাড়া বিকাশদার সঙ্গে কথা হতো না। আমি কম্পিউটারের একটা দু'বছরের ইভনিং কোর্স নিয়েছি। সময় পিছনে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে প্ল্যান করেও ড্যালাসে বিকাশদার বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। নতুন বন্ধুদের মাঝে বিকাশদা, শম্পা-বৌদি আর আমার ছোট্ট বন্ধু রূপা হারিয়ে যেতে লাগল।

কোনো এক বছর ফোর্থ অফ জুলাইয়ের ছুটির সাথে আরো কয়েকদিন ছুটি নিয়ে পশ্চিমে পাড়ি দিয়েছি। আমেরিকার মিড্-ওয়েস্ট। শিকাগো বেড়িয়ে দুপুরের দিকে সেন্ট লুইসের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে পৌঁছালাম। হঠাৎ ভাস্বতী চেঁচিয়ে উঠল "শম্পাদি" বলে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে শাড়িপরা কাউকে দেখলাম। থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কে, শম্পাদি?" ভাস্বতী হেসে বলল, "বাঃ, তোমার রূপার..." আর বলতে হ'ল না – মনে যেন একটা আনন্দের জোয়ার বয়ে

চলল | রূপার সরল মুখটি মনে পড়ে গেল | পাঁচটা বছরের ব্যবধান পাঁচদিনের চেয়েও কম লাগছিল | "বিকাশদা" বলে চেঁচিয়ে উঠলাম | ওঁরা এগিয়ে এলেন | রূপাকে চিনতে পারলাম না; অনেক বড় হয়ে গিয়েছে | আশ্চর্যভাবে আমার দিকে চেয়ে মা'র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল | "রূপা, কেমন আছ?" সেই একইভাবে জিজ্ঞেস করলাম | উত্তর পেলাম "ভাল" | উত্তরে কোনো জড়তা ছিল না | শম্পাবৌদি বললেন, "রূপা, চিনতে পারছ না? তোমার সেই পুরনো 'কাকু'!" রূপা মা'র কাঁধে মাথাটা রেখে নির্লিপ্তভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল | কত বড় দেখাচ্ছে রূপাকে – স্ল্যাকস্ পরেছে, বয়সের তুলনায় অনেক লম্বা লাগছে | বুঝলাম রূপা আমাকে বেমালুম ভুলে গেছে | খারাপ লাগল, দুঃখও লাগল – রূপার আর আমার ফেলে আসা সেই স্বতঃস্ফূর্ত দিনগুলো আবার করে মনে করতে ইচ্ছে করল না | বিকাশদার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করার পর বিদায়ের প্রস্তুতির সময় রূপাকে বললাম, "রূপা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ! তোমার কি গল্প শুনতে ভাল লাগে এখনও?" রূপা একটু হাসল | তার কিছুক্ষণ পর গুডবাইয়ের মাঝে রূপা মিলিয়ে গেল |

বিদেশে আর বেশিদিন থাকতে পারলাম না | দেশের টানে সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বরাবরের জন্য ফিরে গেলাম কলকাতায় | সেখানে গিয়ে বিদেশের ছাড়পত্র বার করে গরুখোঁজার মতো চাকরির খোঁজ করতে শুরু করলাম | অনেক কষ্টে সেলসে একটা চাকরি পেলাম | ভালই লাগল; কেরিয়ারের স্বপ্ন তখন একটুও ছিল না | একটা কিছু যে পেয়েছি, তাতেই নিশ্চিন্তি | এরপর সংসার বাড়বে – এইসব চিন্তায় সংসারে জড়িয়ে পড়লাম |

অফিসের কাজে জয়পুরে যেতে হয়েছিল | সেখানে কম্পানির একটা বড় অর্ডার ধরতে হবে | মিটিং-এ পরিচয় হ'ল ওখানকার পারচেস্ ম্যানেজারের সঙ্গে – বাঙালি ভদ্রলোক, বেশ বয়স হয়েছে জমাটি মানুষ | সন্ধ্যেবেলায় তাঁর বাড়িতে মাছ-ভাতের নেমন্তন্ন পেয়ে গেলাম | খাবার টেবিলে নানান গল্পের পর পরিচয় বেরোতেই তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আরে, তুমি চন্দননগরের বীরু সেনের ছোট ছেলে বিল্টু!" আমি কিছু বলার আগেই তিনি হৈহৈ করে বলে উঠলেন, "তুমি যখন ছোট ছিলে তখন তোমাদের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম | যখন আমি কলকাতায় ছিলাম তোমার বাবা আমার খুব বন্ধু ছিলেন | তুমি তো আমার কোলে কত খেলা করেছ, গল্প শুনেছ | কত ছোট ছিলে তখন... মনে আছে তোমার সেসব দিনের কথা? আমায় চিনতে পারছ?" ভদ্রলোক আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন |

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু ভাবতে চেষ্টা করলাম | মুখে কোনো কথা সরছিল না | চোখের সামনে রূপার মুখটি ভেসে উঠল সেন্ট লুইসে সেই আশ্চর্য দুপুরের পটভূমিতে | অদ্ভুত এক ভাল লাগায় ভরে উঠল মনটা!

আমার মা

বীরেশ্বর মিত্র

তখন কতই বা বয়স ছিল আমার, বছর পাঁচেক হবে। বড় হয়ে সেই বয়সের সব স্মৃতি পুরোপুরি মনে থাকে না, তবু আমার আবছা আবছা মনে পড়ে বেশ কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনা। সেই বয়সের বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে মা-বাবা নির্ভরশীল। আমার মনে আছে, মা আমাকে স্নান করিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে দিতেন। তারপর ছিল সকালের জলখাবার খাওয়া আর সব শেষে মায়ের হাত ধরে স্কুলে যাওয়া। আমার প্রথম স্কুল ছিল বাড়ির খুব কাছেই। প্রথম প্রথম মা পৌঁছে দিতেন, তারপর থেকে নিজেই যাতায়াত করতাম। যদিও আধবেলার স্কুল, তবু ছোট্ট একটা টিফিন-বক্স থাকত স্কুলব্যাগে। স্কুল শেষ হবার পর দৌড়ে বাড়ি ফিরে আসতাম। বাড়ি ফিরে খুব খিদে পেত। তখন মা যত্ন করে আমাকে খাইয়ে দিতেন, মাছের কাঁটা বেছে সেই খাওয়ানোর স্মৃতি আজও পরিষ্কার মনে আছে। বেশ সুন্দর কেটে যাচ্ছিল ছেলেবেলার সেই দিনগুলি। আমার হাতেখড়ি হয়েছিল মায়ের কাছে, নিজেদের বাড়িতেই সরস্বতী পুজোর সময়।

সেই দিনগুলো পেরিয়ে আরও কয়েকটা বছর চলে গেল। আগে বলা হয়নি, আমি যখন স্কুলে যেতে শুরু করেছি, সেই সময়ের আগেই আমার থেকে চার বছরের ছোট বোনটি এসে গেছে আমাদের সংসারে। আমার বড় আদরের ছোট্ট বোন! আমার এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে প্রমোশন পেয়ে ওঠার সাথে সেও বড় হতে শুরু করেছে। এবার আমাদের দুই ভাই-বোনের মধ্যে মায়ের আদর আর ভালবাসা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হ'ল । মায়ের কাছে গল্প না শুনলে আমাদের ঘুম হতো না, ঐতিহাসিক গল্প – কত চরিত্র সেখানে, রানা প্রতাপ, শিবাজি মহারাজ, রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি, এঁদের জীবনের গল্প – এমনি আরও কত। আমার বোন, মিতালি পছন্দ করত রূপকথার গল্প। মা দুজনকে দুপাশে নিয়ে শুতেন। বোনের ধারণা ছিল, মা দাদাকে বেশী ভালবাসেন। তখন ক্লাস থ্রি থেকে সারাদিনের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত স্কুল। মায়ের হাতে তৈরী টিফিন নিয়ে যেতাম, মাঝখানে একটা আধঘন্টার টিফিন ব্রেকে বন্ধুরা মিলে ভাগাভাগি করে খুব মজায় খেতাম সেইসব খাবার। স্কুল শেষে বাড়িতে এসে কোনরকমে ব্যাগ রেখে দৌড় লাগাতাম খেলার মাঠে। বাড়ি ফিরে আসতাম সন্ধ্যে হবার আগে। বাবার কড়া হুকুম ছিল, সন্ধ্যে হবার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে, এর অন্যথা হলেই কপালে ছিল বেশ ভাল মতন বকুনি। এইসব পরিস্থিতি অবশ্য মা ঠিক সামলে দিতেন। হাত-পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে নিয়ে পড়তে বসতে হতো। তখনকার দিনে তো কোচিং ক্লাসের বালাই ছিল না, অনেকটা সময় নিয়ে, মায়ের কাছেই পড়তাম। স্পষ্ট মনে আছে, ক্লাস এইট পর্যন্ত মায়ের কাছে সমস্ত সাবজেক্ট পড়েছি। আর তখনই জেনেছি যে আমাদের মা পড়াশুনোয় খুবই ভাল ছিলেন। তখনকার দিনের ম্যাট্রিক পাস। প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়তেন, আর পড়তেন অজস্র বাংলা বই – সমসাময়িক বা তার কিছু আগের সময়ের সব নামকরা সাহিত্যিকদের লেখা। মায়ের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। সেই সময়ে শুধু রেডিও আর খবরের কাগজ – তার সুবাদেই সারা পৃথিবীর সব খবর একবারে মায়ের নখের ডগায়। মায়ের পড়ানো আমার খুব ভাল লাগত। খুব সুন্দর করে একেবারে ছবির মতো সবকিছু বুঝিয়ে দিতেন। আমার তো মনে হতো যেন স্কুলের টিচারদের থেকেও মায়ের পড়ানো অনেক ভাল ছিল। অঙ্কের জন্য মাঝে মাঝে বাবার কাছে যেতাম, কিন্তু বাবাকে বড্ড ভয় পেতাম।

আমাদের মাকে কখনও বসে থাকতে দেখিনি । কাজের অবসরে হয় বই পড়তেন, নয়তো সেলাই করতেন। মা'র হাতেবোনা সোয়েটার পরে কেটেছে সম্পূর্ণ স্কুল জীবন। আর মায়ের সেলাই করা কাঁথা গায়ে না দিলে ঘুমই আসত না। যাইহোক, পড়াশুনো, খেলাধুলো নিয়ে ভালই কাটছিল আমার দিনগুলো।

আমাদের ছিল মধ্যবিত্ত পরিবার। বিলাসিতা ছিল না একেবারেই, কিন্তু আমাদের সব প্রয়োজন মিটত সহজেই। কোনকিছুর অভাব ছিল না, কিন্তু প্রাচুর্য বলতে যা বোঝায়, সেটাও ছিল না। বাবা রেলওয়েতে ভাল কাজই করতেন, এবং খুব সৎ ও নিরহঙ্কারী বলে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। আমারও স্কুলের রেজাল্ট ভালই হতো। ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট হতাম বলে কখনও পড়ার খরচ লাগেনি। তাছাড়া পুরস্কার হিসেবে বই পেতাম বলে বইও বিশেষ কিনতে হয়নি। আমার

থেকে আমার মায়ের কৃতিত্বই এ ব্যাপারে অনেক বেশী ছিল।

মা দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলেন। মায়ের সঙ্গে যখন বাইরে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতাম, খুব ভাল লাগত। সবাই বলত আমি আমার মায়ের মতো দেখতে; মাতৃমুখী পুত্র সন্তান নাকি খুব সুখী হয়। সবাই এটাও বলত যে, আমার বোন বাবার মতো দেখতে, আর পিতৃমুখী কন্যা সুখী।

বাবা বাড়ির বড় ছেলে ছিলেন, তাই অনেক দায়দায়িত্ব ছিল, বিশেষ করে ঠাকুরদাদা মারা যাবার পর। মা কিন্তু সবকিছু ঠিক সামলে চলতেন। বাবা সংসার খরচের টাকা মায়ের হাতে তুলে দিতেন, আর মা সংসারের সবদিক সামলাতেন। সব খরচাপাতি খাতায় লিখে রাখতেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হতো। মা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তেন, আর আমরা দুই ভাইবোন মাকে সাহায্য করতাম। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিনে আমার নজর থাকত নারকোল নাড়ুর দিকে, কিন্তু পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হতো, আর পুজো শেষ হলেই মা নিজে চিনি দিয়ে তৈরী নারকোল নাড়ু আমার হাতে তুলে দিয়ে হাসতেন, সন্তানের মন বোঝা তো মায়ের কাছে জলভাত, মা'র চোখ কি এড়ানো যায়! মা খুব গুছিয়ে সংসার করতেন।

খুব হৈ হৈ আর মজা হতো আমার জন্মদিনে। স্কুলের আর পাড়ার সব বন্ধু-বান্ধব আসত, লুচি-তরকারি হতো, পায়েস হতো। প্রতি বছর নতুন জামা পেতাম, আরও অনেক উপহার পেতাম। একটা জন্মদিন পার হলেই অপেক্ষা করে থাকতাম পরের জন্মদিনটার জন্য।

তখন ক্লাস এইটে পড়ি। সামনেই পরীক্ষা। খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরলাম বৃষ্টিতে ভিজে, সঙ্গে হাঁচি আর কাশি। মা গায়ে হাত দিয়ে বুঝলেন বেশ জ্বর। মায়ের কাছে কিছুটা বকুনি খেলাম। কিন্তু আসল বকুনি তো তখনো বাকি ছিল, সেটা হ'ল বাবা আসার পর। বাবা বললেন, আমার পড়াশোনায় বিন্দুমাত্র মন নেই, আমি দিনকে দিন গোল্লায় যাচ্ছি আর আমাকে নাকি আদর দিয়ে মাথায় তুলেছেন আমার মা। রাতে জ্বর বাড়ল, সঙ্গে অসহ্য মাথাব্যথা। সারারাত জেগে মা জলপটি দিলেন আর সকাল হতেই মাথা ধুইয়ে দিলেন। তাতে জ্বর অনেকটা কমল। একটু পরে বাবাকে পাঠালেন রেলওয়ে হাসপাতালে, সেই দাগকাটা কাঁচের বোতলে লাল রঙের মিক্সচার আনতে। তিনদিনের ওষুধ। তাতে জ্বর না কমলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তিনদিনের মাথায় জ্বর কমল। মা আর বোনের সেবায় সেরে উঠলাম। বুঝলাম মা তিনরাত ঘুমোননি, আর এই তিনদিনে খেয়েছেন কিনা সন্দেহ। সেরে উঠে বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, ভাল রেজাল্ট করবই। সেই প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছিলাম। তিন বছরের কঠোর পরিশ্রম, স্কুলের শিক্ষকদের চ্যালেঞ্জ আর মা-বাবার আশীর্বাদে হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট আশাতীত ভাল হ'ল। আমি জেলায় প্রথম আর বোর্ডে কুড়িতম স্থান পেয়েছিলাম, সঙ্গে ন্যাশানাল স্কলারশিপ। এই রেজাল্ট আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। স্কুলের মুখ উজ্জ্বল হ'ল। মা-বাবা তো খুবই গর্বিত।

ভারতের নামজাদা এক এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চান্স পেলাম। পাঁচটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল, ভালভাবে পাস করে বেরোলাম। কিন্তু তখন চাকরির বাজার মন্দা। তবু বাবা-মায়ের আশীর্বাদে শেষপর্যন্ত একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেলাম, যদিও চাকরির জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হবে, সেখানেই থাকতে হবে। মা-বাবাকে ছেড়ে আসতে মন সায় দিচ্ছিল না। বাবা-ই আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠালেন। মা আশীর্বাদ করে বললেন, যেন কৃতি হতে পারি, দেশের ও দশের সেবায় যেন পাশে দাঁড়াতে পারি। মা-বাবা কথা দিলেন মাঝে মাঝে আসবেন আমার কাছে। এরপর মায়ের পছন্দমতো পাত্রী, মন্দিরার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল। সংসারের সব খুঁটিনাটি আস্তে আস্তে মন্দিরাকে বুঝিয়ে দিলেন মা। তারপর আমরা কলকাতার বাইরে প্রবাসে চলে এলাম।

খুবই কাজের চাপ। নতুন জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অনেক দায়িত্ব মাথার উপর। প্রায় বারোঘন্টা বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। ইতিমধ্যে একটি কন্যা সন্তান এসেছে মন্দিরার কোলে। ফুলের মতো মেয়ে, কী মিষ্টি চেহারা। অনেক ভেবেচিন্তে নাম রাখা হ'ল মাধুরী আর ডাক নাম হ'ল মিষ্টি। ওকে নিয়ে সময় কেটে যায় মন্দিরার। মা'র ফোন আসে প্রায় রোজই। নাতনির মুখেভাতের সময় বাবা-মা এলেন। খুব ঘটা করে হ'ল সেই অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবও হয়েছে। মিতালিও এসেছিল বর আর ছেলেকে নিয়ে দিল্লি থেকে। পরের বছর আমরা গেলাম কলকাতায়। এইভাবেই যাতায়াত চলছিল। আমাকে অবশ্য অফিসের কাজে মাঝে-

মাঝেই কলকাতায় যেতে হতো। মা-বাবাকে খুবই মিস্ করতাম, আমার মেয়েও দাদু-ঠাম্মাকে ভীষণ ভালবাসত, এখানে এলে একদমই সঙ্গ ছাড়তে চাইত না। মন্দিরা শ্বশুর-শাশুড়িকে খুব যত্ন করত। আর আমার মাও মন্দিরাকে খুব পছন্দ করতেন। আরো বছর চারেক চলে গেল এইভাবে। মিষ্টি তখন একটু বড় হয়েছে।

হঠাৎ একদিন আমাদের কলকাতার বাড়ির এক প্রতিবেশীর ফোন – তখন অনেক রাত; বললেন, "আপনার বাবার খুব শরীর খারাপ, খুব জ্বর আর ভুল বকছেন। পাড়ার ডাক্তার দেখে ওষুধ দিয়েছেন, কিন্তু জ্বর কমছে না। আপনি এলে ভাল হয়, যদিও আপনার মা আপনাকে জানাতে বারণ করেছিলেন কিন্তু আমার মনে হ'ল আপনার জানা উচিত।" ভোরবেলার ফ্লাইট ধরলাম। সকাল ন'টায় বাড়ি পৌঁছালাম। মা তো আমাকে দেখে অবাক। এ কী চেহারা হয়েছে মায়ের! মনে হ'ল বেশ কয়েকদিন ঘুমাতে পারেননি। মাকে বকলাম আমাকে না জানাবার জন্য। মায়ের কথা, "তোর এত কাজের চাপ, তাই বলিনি।" পাড়ার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে বাবাকে একটি ভাল নার্সিংহোমে ভর্তি করলাম। সবরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা গেল, মাথায় ভালরকম আঘাত লেগেছে, ইন্টারনাল ব্লীডিং। অপারেশন ছাড়া কিছু করার নেই এবং তাতেও নিরাময়ের চান্স কম। অগত্যা রাজি হতে হ'ল। অনেক চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না বাবাকে। মা'র সামনে কীভাবে দাঁড়াব! নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। মা খুবই ভেঙে পড়েছিলেন; এতদিনের সাথী! মাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব ঠিক করলাম। মা যেতে চাইছিলেন না। অনেকটা জোর করেই নিয়ে যেতে হ'ল। মা'র বিধবার বেশ দেখে বুক ফেটে কান্না আসছিল। নিজের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে নতুন জায়গায় নতুন করে ওঁকে মানিয়ে নিতে হবে! মন্দিরা আর মিষ্টি আপ্রাণ চেষ্টা করত মাকে ভাল রাখবার। মিতালি এসেছিল মাকে কিছুদিনের জন্য তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য। মা বলেছিলেন, পরে যাবেন।

অফিস থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরি হতো। দেখতাম মা বারান্দায় পায়চারি করছেন। বয়সের ভারে অনেকটা ঝুঁকে গেছেন। অভিযোগ করতেন দেরি করে আসবার জন্য। বলতেন, "বসকে বলিস তোকে এত না খাটাতে।" বলার চেষ্টা করতাম, এখানে আমার মাথার উপর কেউ নেই। আমাকেই সব সামলাতে হয়। রাতের খাবার খাননি। আমি খেতে বসার পর সব দেখেশুনে তারপর নিজে খেতে বসতেন। দুধ আর রুটি। আমাকে না খাইয়ে উনি খাবেন না। মিষ্টি নিজের ঘরে পড়ায় ব্যস্ত। মন্দিরা এসে বসতো খাবার টেবিলে। ও খেয়ে নিত আর অভিযোগ করত মা কিছুতেই খাবেন না যতক্ষণ না আমি বাড়ি ফিরে খেতে বসব। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যেত।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেল। পরিবর্তিত জীবন মা অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছেন। তবে বয়সের ব্যাপারটা তো আছেই। শীর্ণকায় হয়ে গেছেন, মাঝে মাঝে হাঁপানির টান হয়। অনেকটা শ্লথ হয়ে গেছেন, হাঁটাচলায় সময় লাগে, তবু নিজের কাজ মা নিজেই করতেন।

রবিবার সবাই মিলে আড্ডা জমত। মাঝে মাঝে সবাই মিলে বেড়াতে যেতাম। মন্দিরা গান গাইত মা'র যা ভাল লাগে। ইতিমধ্যে আমাদের মেয়ে অনেকটা বড় হয়েছে, যেন এক পাকা গিন্নি। সব ব্যাপারে ওর মতামত নিতেই হবে। BA পাস করে, MA পাসও করল। এরপর বায়না ধরল বিদেশে যাবে উচ্চশিক্ষার জন্য। নিজের চেষ্টায় ইউ এস এ-তে ভাল কলেজে চান্স পেয়ে গেল। মিতালি এসে মাকে নিজের কাছে নিয়ে গেল কিছুদিনের জন্য আর আমরা গেলাম মিষ্টিকে বিদেশে গুছিয়ে দিয়ে আসতে। তখন মোবাইলের চল ছিল না, তাই লং-ডিস্টেন্স কল করে মা'র খবর নিতাম।

যাবার সময় দেখে গিয়েছিলাম মায়ের শরীর খুব একটা ভাল যাচ্ছিল না। হাঁপানির টান বেড়েছিল। মিতালি আশ্বাস দিল, "দাদা তোরা ঘুরে আয়। আমি মা'র দেখাশুনো করব। চিন্তা করিস না।" প্রায় কুড়িদিন বাদে দেশে ফিরলাম। মুম্বাই এয়ারপোর্টে নেমেই মিতালিকে ফোন করলাম। বলল, "দাদা, তোরা কোথায়? মার শরীর খুব খারাপ। প্রায়ই জ্ঞান হারাচ্ছেন আর জ্ঞান ফিরলেই বিড়বিড় করে তোর নাম করছেন।" সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের টিকিট জোগাড় করে দিল্লিতে মিতালির বাড়িতে গেলাম। তখন সকাল ন'টা। দেখলাম সবাই দাঁড়িয়ে ভগবানের নাম নিচ্ছেন। ডাক্তার ডাকা হয়েছে – শিগ্গির আসবেন। মায়ের সামনে দাঁড়ালাম। মা চোখ খুললেন। কিছু বলার চেষ্টা করলেন, মুখে সেই মিষ্টি মধুর হাসি। তারপর যখন চোখ বন্ধ করলেন আর খুললেন না। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে জানিয়ে দিলেন, প্রাণ আর নেই। মিতালি বলল, "মার ক'দিন থেকেই শরীর খুব খারাপ প্রায়

যায় যায় অবস্থা। ঘুমের ঘোরে শুধু তোরই নাম নিচ্ছিলেন; তুই খুব ভাগ্যবান, শেষ দেখা দেখতে পেলি।"

বুক থেকে কান্না ঠেলে আসছিল, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। সম্বিত ফিরে পেলাম বেশ কিছুক্ষণ পর। জানি একদিন না একদিন সবাইকে যেতে হবে, মায়ের বয়স হয়েছিল, আর হাঁপানিতে অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছিলেন – এ সবই ছিল নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া!

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবন ফিরে এল। অফিস থেকে ফেরার সময় দোতলার বারান্দার দিকে নজর পড়লে মনে হতো মা যেন হাত নাড়ছেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে বসতাম। আকাশভর্তি তারা। আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাদের মাঝে মাকে খুঁজতাম। মা বলতেন, মানুষ মরে গেলে আকাশের তারা হয়ে যায়। তারাদের দিকে তাকিয়ে বলতাম, 'মা তুমি কেমন আছ? কোথায় আছ? যেখানেই থাকো, ভাল থাকো। তুমি তো ভাল মা, সত্যি করে বলো তো মা, আমি কি তোমার ভাল ছেলে হতে পেরেছি?'

কখন মন্দিরা এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাইনি। মন্দিরা বলছে, "অনেক রাত হয়েছে – চলো খাবে চলো।"

কলহ

সিদ্ধার্থ সিংহ

গ্রামের মাতব্বররা এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। এ কী বলছে ওরা!

ওরা মানে টগর আর মাটি। বিয়ে হয়েছে ছ'মাসও কাটেনি। দু'বাড়ি থেকে দেখাশোনা করে বিয়ে। কিন্তু বিয়ের পরদিনই ওদের অমন খোলামেলা কথাবার্তা শুনে কারও কারও ভ্রু কুঁচকেছিল। দু'একজন জানতেও চেয়েছিল, "তোমাদের কি প্রেম করে বিয়ে?"

টগর হেসেছিল। উত্তর নয়, মাটি উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল – "বিয়ে কি ঝগড়া করে হয় নাকি?"

হানিমুন সেরে আসার পর প্রথম ক'টা দিন সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু মাস গড়াতে না-গড়াতেই শুরু হ'ল সমস্যা। টগর হাড়ে হাড়ে টের পেল, এ রকম স্বামীর সঙ্গে ঘর করা যায় না। মাটির চোখেও ঘুম নেই। এমন একটা বউয়ের সঙ্গে বাকি জীবন কাটাতে হবে, ভাবতে গিয়েই তার গায়ে যেন জ্বর এল।

দ্বিতীয় মাসের শুরুতেই একদিন এমন কথা-কাটাকাটি হ'ল যে, মাটি কাজে বেরিয়ে যেতেই টগরও ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে রওনা হ'ল কলকাতায়। কলকাতা মানে কৃষ্ণনগর, বাপের বাড়ি; কৃষ্ণনগর থেকে আশি কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের বর্ডার লাগোয়া করিমপুরের লোকেরা কৃষ্ণনগরকে কলকাতাই বলে। শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে চলে এসেছে শুনে মা বাবার মাথায় হাত! তিলজলা থেকে ছুটে এল টগরের বড়দা। উস্তি থেকে মেজদি। কাঁচরাপাড়া থেকে ছোড়দা। সবাই কত করে বোঝাল, কিন্তু ওর সেই এক কথা, "না, ওবাড়িতে আমি আর কিছুতেই যাব না।"

- "কিন্তু কেন? কী হয়েছে বল। ওর কি কারও সঙ্গে কিছু আছে? কিছু টের পেয়েছিস?"

একটার পর একটা প্রশ্ন। অথচ টগর নিশ্চুপ।

মাটির বাড়িতেও হাজার প্রশ্ন – "হ্যাঁরে, তোর বউ সেই যে গেল, গেল তো গেলই, আসার আর নামগন্ধ নেই। কী ব্যাপার? ও কি আসবে না?"

বন্ধুরা বলে, "তুই কী রে? বিয়ে হতে না-হতেই বউটাকে বাপেরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিস, তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কী ভাববে বল তো?"

দু'বাড়ি থেকেই নানা কথা উঠছিল। তার হাত থেকে রেহাই পেতেই টগর একদিন তার দাদাদের জানিয়ে দিল, তার পক্ষে ওর সঙ্গে ঘর করা আর সম্ভব নয়। সে ডিভোর্স চায়। সবাই অবাক। এই তো সবে বিয়ে হ'ল। এর মধ্যেই এই! আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ফিসফাস, ফোনাফুনি। মুখে মুখে সে খবর এসে পৌঁছাল মাটিদের বাড়িতে। সে কথা শুনে মাটি বলল, "আমিও ওর সঙ্গে আর ঘর করতে চাই না।"

এ বোঝায়। ও বোঝায়। সে বোঝায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! অবশেষে টগরের দাদারা যখন দেখল, আর কোনও উপায় নেই, তখন বোনকে বলল, "তাহলে উকিলের সঙ্গে আমরা কথা বলি?" টগর বলল, "না। কোর্ট-কাছারি নয়। আমি মিউচুয়াল ডিভোর্স চাই।"

মাটিও তাই চায়। কিন্তু মিউচুয়াল ডিভোর্স হলেও দু'পক্ষেরই কিছু লোক থাকা দরকার। যতই আইন হোক, পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠুক থানা, তবু এখনও শহরতলি এবং গ্রামের দিকের ক্লাবগুলোতে মাঝে মাঝেই বিচারসভা বসে। সেখানে জমিজমার বিবাদ থেকে গাছের পেয়ারা চুরি, কার বাচ্চাকে কোন বাচ্চা প্রথম মেরেছে থেকে কারা পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছে, এমনকী পারিবারিক ঝগড়া – সবকিছুরই বিচার করা হয়। বিচার করেন এলাকার কিছু মাতব্বর গোছের লোক।

ওদের এই ডিভোর্স নিয়েও বিচারসভা বসল করিমপুরে। টগরের দাদাদের উদ্যোগে সেখানে হাজির হলেন কৃষ্ণনগরের কয়েকজন মাথা। দু'পক্ষের লোকেরাই জেনে গিয়েছিলেন, ওরা কেউই কারও সঙ্গে ঘর করতে চায় না। কিন্তু বউয়ের যদি কোনও আর্থিক সংস্থান না থাকে, তাহলে তার চলবে কী করে? তাই বোনের দায়িত্ব যাতে তাদের ঘাড়ে এসে না পড়ে, সেজন্য মেয়ের দাদারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাদের পক্ষের লোকদের আগেই বলে দিয়েছিল, ভরণপোষণের টাকা মাসে মাসে নয় – মাসে মাসে দেওয়ার কথা হলে নাকি প্রথম কয়েক মাস দিয়েই ছেলেরা টাকা বন্ধ করে দেয়। তখন আবার সেই থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি।

"আপনারা বরং, এককালীন খোরপোষ আদায় করে দিন এবং সেটা যেন পনেরো-কুড়ি লাখ টাকার কম না হয়।" মাতব্বররা বললেন, "পনেরো-কুড়ি লাখ টাকা চাইলেই তো আর পনেরো-কুড়ি লাখ দেবে না। দরাদরি করবে। আমরা বরং প্রথমে পঁচিশ লাখ বলি?"

সেইমতো মাটির কাছে খোরপোষ বাবদ পঁচিশ লাখ টাকা দাবি করতেই বিস্ফারিত চোখে তাকাল টগর। বলল, "আমি তো টাকা চাইনি। ডিভোর্স চেয়েছি।" কিন্তু টগর সেই কথা এত আস্তে বলল যে, সে কথা কারও কানে গিয়েই পৌঁছাল না।

- "পঁচিশ লাখ? পঁচিশ লাখ টাকায় ওর হবে? ব্যাঙ্কে রাখলে মাসে ক'টা টাকা ইন্টারেস্ট পাবে? তাতে ওর চলবে? দিন দিন জিনিসপত্রের যা দাম বাড়ছে, একটা মানুষের খেয়েপরে ভালভাবে থাকতে গেলে ওই টাকায় কিচ্ছু হবে না। পঁচিশ লাখ নয়, আমি ওকে চল্লিশ লাখ দেব।"

- "না। আমি কোনও টাকা চাই না।" এবার আর আস্তে নয়, বেশ জোরের সঙ্গেই বলল টগর।

বড়দি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপাস্বরে বলল, "বোকার মতো কথা বলিস না। তোর কোনও ভবিষ্যৎ নেই? ও যখন নিজে থেকেই দিতে চাইছে, তোর অসুবিধে কোথায়?"

- "অসুবিধে আছে। কারণ, আমি জানি, আমাকে চল্লিশ লাখ টাকা দিতে গেলে ওর শুধু ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙালেই হবে না, আমার বিয়ের আগে গোপালপুরে যে তিনকাঠা ছ'ছটাক জমি ও কিনেছিল, সেটাও ওকে বিক্রি করতে হবে। তাতেও কি চল্লিশ লাখ হবে? ওকে অফিস থেকে লোন নিতে হবে। আমি চাই না, ও সর্বস্বান্ত হোক।"

টগর আর মাটির কথা শুনে দু'পক্ষের লোকেরাই এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

করিমপুরের এক মাতব্বর টগরকে বললেন, "তোমার যখন ওর প্রতি এতই দরদ, তা হলে ডিভোর্স চাইছ কেন?"

টগর বলল, "ওর সঙ্গে সংসার করা যায় না, তাই।"

প্রশ্ন শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়ল টগর – "জানেন, ও কোনও কথা শোনে না। এত সুগার হয়েছে, ডাক্তার বলেছেন, রোজ সকালে অন্তত ঘন্টাখানেক হাঁটতে। অথচ যতই ডাকি না কেন, ও কিছুতেই সকালে ওঠে না।"

- "কেন, আমি উঠি না?" টগরের চোখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল মাটি।
- "আমি কি বলেছি, ওঠোনি? উঠেছ। গুনে গুনে ঠিক দুদিন। উঠে কী করেছ? হেঁটেছ? আমি ঠেলে বাইরে বের করে দিয়েছি; খানিক পরে বেরিয়ে দেখি, ওদিকের শিমুল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বাবু ঘুমোচ্ছেন...।"
- "হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিলাম। কারণ, আমার ঘুম পেয়েছিল, তাই। আর তুমি কী করেছ? আমি পইপই করে বলেছিলাম, তুমি রোজ বারোটার মধ্যে খেয়ে নেবে। না হলে শরীর খারাপ হবে। কিন্তু কোনদিন দুটো-আড়াইটের আগে তুমি খেয়েছ?"

মাথা নিচু করে নরম গলায় টগর বলল, "কাজ থাকলে কী করব...?"

- "না, করবে না। কাজ করবে না। দরকার হলে ফেলে রাখবে। আমি এসে করব। কিন্তু তুমি যদি অসুস্থ হও, কে দেখবে?"
- "তোমাকে দেখতে হবে না।"
- "আমাকে দেখতে হবে না মানে? আলবাত দেখতে হবে। আমি তোমার স্বামী।"
- "তুমিও ভুলে যেয়ো না, আমি তোমার বউ। তোমাকে যা বলব, তা-ই করতে হবে। সকালে হাঁটতে হবে। ডাক্তার যে ওষুধ খেতে বলেছেন, নিয়ম করে সেগুলো খেতে হবে। প্রতি দু'মাস অন্তর নিয়মিত ফাস্টিং আর পিপি করাতে হবে।"
- "আমি কি করব না বলেছি?"
- "সে তো মুখে বলছ। করো কি?"
- "করি তো।"
- "করো? আবার মিথ্যা কথা? আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না।"
- "আমার কথা না শুনলে আমিও তোমাকে ছাড়ব না।"

বিচারসভায় বাদী-বিবাদীরা কোথায় চুপচাপ থাকবে। মাতব্বররা যে প্রশ্ন করবে, কেবল তার উত্তর দেবে। তা নয়, ওরা রীতিমতো ঝগড়া শুরু করে দিল। বিচারকরা চুপচাপ। এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

হঠাৎ এক মাতব্বর বলে উঠলেন, "কে তোমাদের ছাড়তে বলেছে? আমরা বুঝে গেছি, তোমাদের জোর করে ছাড়ালেও তোমরা আলাদা হওয়ার নও। যে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মঙ্গলের জন্য ডিভোর্স পর্যন্ত চাইতে পারে, তারাই তো প্রকৃত জুটি। আমরা চাইব, তোমরা দুজন অন্তত কয়েক দিনের জন্য কোথাও থেকে একটু ঘুরে এসো।"

টগরের দাদা বলল, "এটা আপনারা মন্দ বলেননি। মকাইমারা ফরেস্টটা খুব ভাল। আমরা গতবার ওখানে গিয়েছিলাম। বললে, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

টগর বলল, "না, ফরেস্টে নয়; আমি পাহাড়ে যাব।"

মাটি বলল, "পাহাড়টাহাড়ে নয়, সমুদ্রে।"

টগর বলল, "না, পাহাড়ে।"

মাটি বলল, "বললাম তো সমুদ্রে।"

টগর বলল, "না, তোমার ঠাণ্ডার ধাত আছে। জলে নামলেই খুব ভোগো। তাছাড়া আমি জানি, তুমি পাহাড় খুব ভালবাস। আমি পাহাড়েই যাব। পাহাড়ে।"

- "না, পাহাড়ে নয়। আমি জানি, পাহাড়ে কয়েক ধাপ উঠে নীচে তাকালে ভয়ে তোমার বুক ধুকপুক করে। আর তাছাড়া, সমুদ্র তোমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। আমি সমুদ্রেই যাব।"

টগর বলল, "পাহাড়ে।" মাটি ফের বলল, "সমুদ্রে।"

- "না, পাহাড়ে।"
- "না, সমুদ্রে।"
- "না, পাহাড়ে।"
- "না, সমুদ্রে।"

দুজনের মধ্যে আবার শুরু হ'ল চাপানউতোর। কিন্তু ওদের এই মধুর ঝগড়ার মধ্যে কেউ আর মাথা গলাল না।

চারশো কত যেন...

আনন্দিতা চৌধুরী

ব্যাপারটা প্রথমে খেয়াল করেন অনিতা | সকাল সকাল স্নান সেরে বারান্দার টবে জল দিতে গিয়ে ঘটনাটা চোখে পড়ে | হাঁ করে দেখতে গিয়ে জল পড়ে পা ভিজে বারান্দা ভেসে যায়, সে যাক; দেখাটা ও বোঝাটা বেশি দরকার | থমকে দাঁড়িয়েই ছিলেন, একটু পরে দেখেন প্রতিবেশী মালা ফিরছেন বড় রাস্তার মুখে স্কুলবাসে নাতনিকে তুলে দিয়ে | "ও মালা, শোনো শোনো..." বলে তাকে ডেকে পুরো ব্যাপারটা বলেন অনিতা | কী হয়েছে, কী হয়ে থাকতে পারে, এই নিয়ে ভালরকম গবেষণা চলে |

- "একবার যাবে নাকি মালা, কী হ'ল একবার গিয়ে ঠিকমতো শুনে আসি!"

- "ইচ্ছে তো করছে দিদি, কিন্তু এখন যে অনেক কাজ |"

কাজ তো মেলা অনিতারও, কিন্তু খবরটা সরাসরি না পাওয়া অবধি শান্তি নেই যে | তাছাড়া খবর পেয়ে সেটা আর পাঁচটা লোককে সময়মতো জানানো, অর্থাৎ আর কেউ জেনে যাওয়ার আগেই জানানোর একটা গুরুদায়িত্ব আছে তো তাঁর! হাজার হোক তাঁর নিজের সামনের বাড়ির খবর বলে কথা!

- "শোনো মালা, সকালের হুটোপাটিটা মিটে যাক, বেলা এগারোটা নাগাদ এসো, আমরা যাব ওদের বাড়িতে | প্রতিবেশীর বিপদে পাশে দাঁড়ানো তো আমাদের কর্তব্য, কী বলো?"

সেই কথাই ঠিক হয় |

কাজকর্মের মাঝে মাঝেই একেকবার বারান্দায় গিয়ে উঁকি দিতে গিয়ে স্বামী অশোকবাবুর চোখে ধরা পড়ে যান অনিতা |

- "কী ব্যাপার, বারে বারে বারান্দায় কেন? কী হয়েছে?"

উফফ, লোকটা আগে সকালে বেরিয়ে রাতে ফিরত, অনিতা সারাদিন স্বাধীন | রিটায়ার করার পর থেকে এই এক জ্বালা হয়েছে, পদে পদে কৈফিয়ত দিতে হয় |

- "ও কিছু না, তুমি কাগজ পড়ো |" মুখঝামটা দেন অনিতা |

তাঁর মন কিন্তু পড়ে থাকে সামনের বাড়িতে | এমন একটা দিন যে আসবে, তা কি তিনি জানতেন না আগে! হুঁ হুঁ বাবা, তাঁকে বোকা বানানো অত সহজ নয়! সামনের বাড়ির রাজা বিয়ে করে আসার দিন থেকেই তো দেখছেন | অষ্টমঙ্গলা মিটতে না মিটতেই বউ চলল অফিসে | আরে, কয়েকটা দিন বাড়িতে থাক, শাশুড়ির কাছে সংসারের হালচাল শিখে নে, তা নয়, উনি বেরিয়ে পড়লেন | নতুন বউ, একটা শাড়ি পর, দুটো গয়না পর, মাথায় মোটা করে সিঁদুর দে, সেসব নেই, উনি চললেন প্যান্টশার্ট পরে | কয়েকদিন নজর করে অনিতা গিয়েছিলেন রাজার মা, অর্থাৎ শিবানীর সঙ্গে কথা বলতে | প্রতিবেশীর একটা দায় আছে তো, নাকি | পাড়ার সম্মানের ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে | কিন্তু দেখা গেল শিবানীর কোনো হেলদোল নেই |

- "ও তো একটা বিদেশী ব্যাংকে কাজ করে দিদি, ওদের ওখানে সবাই ওইরকমই পরে যায় |"

ন্যাকা! আচ্ছা, এই যে বউটা অত রাত করে ফেরে, একটা গাড়ি এসে নামিয়ে দিয়ে যায়, তুই শাশুড়ি মানুষ কিছু বলতে পারিস না! না, ওর নাকি কাজ থাকে, গাড়িটা নাকি অফিসের কারপুল | যত্তোসব! বোঝো এখন | বউকে অত মাথায় তোলা, এখন ঠ্যালা সামলাও | আজকালকার এইসব মেয়েরা... বাপরে বাপ!

এগারোটা বাজতে না বাজতেই মালা এসে হাজির | কে বলে বাঙালির সময়জ্ঞান নেই | যেতে যেতে অনিতা বলেন, "মালা শোনো, তোমাকে তো বলাই হয়নি, ওদের বউটাকে কাল একটা বড় ব্যাগ নিয়ে বেরোতে দেখলাম জানো তো! জিজ্ঞেস করতে গেলাম, কিন্তু তখনই গাড়ি এসে গেল, ও চলে গেল | আমার তো মনে হয় তখনই গিয়ে বাপের বাড়িতে উঠেছে |"

- "ঠিক বলেছ দিদি, ওখানে গিয়ে নিশ্চয়ই তারপর..."

- "হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকাল তো ঘরে ঘরে এইসব | আর আইনকানুনও হয়েছে তেমনই, সব মেয়েদের মাথায় তোলার মতো অবাধ স্বাধীনতা! ছেলের বিয়ে দিয়ে আর শান্তি নেই গো আজকাল!"

- "সত্যি, যা বলেছ দিদি!"

কলিং বেলের শব্দে শিবানী দরজা খুলতেই অনিতা ঘরে ঢুকে বসে পড়েন, পিছন পিছন মালা | গলায় কান্না কান্না ভাব এনে অনিতা বলেন, "কেমন আছ শিবানী? অবশ্য কেমনই বা থাকবে এই সময়ে, বুঝতে পারি তো, তা ব্যবস্থা কিছু করেছ... উকিল টুকিল...?"

মালা দেখেন তাঁর ডায়ালগ দেওয়ার সুযোগ চলে যাচ্ছে,তাড়াতাড়ি শুরু করেন, "আমিও তো ছেলের বিয়ে দিয়ে

অবধি এই ভয়েই ছিলাম গো শিবানী, আজকাল মেয়েগুলো বিয়েই করে এই ধান্দা করে, আর ছাতার মাথা কী সব আইন হয়েছে, চারশো কত যেন? সেইদিনই তো টিভিতে একজন বলছিল, সবাই মিথ্যে মিথ্যে কেস করে আজকাল... নাহলে তোমাদের মতো এত ভদ্র, ভাল মানুষ... তাদেরও এইরকম অবস্থা!"

শিবানী এখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছেন।

অনিতা অস্ফুটে বলেন মালাকে, "শোকে মাথাটা গেছে!" গলা তুলে শিবানীকে বলেন, "আমাদের বলো তুমি, কীভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাদের।"

- "কীসের সাহায্য দিদি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

- "আহা, আমাদের কাছে লুকোনোর কী দরকার। কতগুলো বছর পাশাপাশি আছি আমরা, রাজাকে সেই ছোট থেকে দেখছি, আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো! শোনো, আমার জায়ের ভাই বড় উকিল, আমি নাহয় তোমায় ওর নম্বরটা দিয়ে রাখি। আমার নাম করে বোলো। লজ্জা কোরো না, আজকাল মেয়েগুলো এইরকমই করছে ঘরে ঘরে।"

- "আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না, দিদি। উকিল কেন, কোন মেয়ে কী করল, কী বলছেন আপনি?"

এইবার অনিতার ধৈর্যচ্যুতি হয়।

- "কেন লুকোতে চাইছ শিবানী? আমি যে নিজের চোখে দেখলাম। একটা পুলিসের গাড়ি এল, একজন ইউনিফর্ম পরা লোক তোমাদের বাড়িতে ঢুকল, একটু পরে রাজাকে নিয়ে গিয়ে দুজনে পুলিসের গাড়িতে করে চলে গেল। তুমি বলতে চাইছ তোমার ছেলেকে পুলিস অ্যারেস্ট করেনি! তোমার ছেলের বউ তো চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে, আমি দেখেছি। তারপর নিশ্চয়ই কেস করেছে, ওই যে কী যেন, ওই চারশো কত যেন ধারায়। কি বলো, আমি কি ভুল বলছি?"

হঠাৎ শাড়ির আঁচল মুখে চেপে কোলের ওপর ঝুঁকে পড়েন শিবানী। হ্যাঁ, এইবার, এইবার ঠিক হয়েছে, এইবার কেঁদে ভাসাও, সাবধান করেছিলাম শোনোনি তো, বোঝো এবার! অনিতা আর মালা একে অপরের দিকে তাকিয়ে শিবানীর হাসি দেখে হঠাৎ হোঁচট খায়, যখন বোঝেন শিবানী কাঁদছেন না, মুখে আঁচল দিয়ে হেসে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন। নাহ, বিপদে পড়ে বোধহয় সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন।

কোনমতে হাসি থামিয়ে প্রায় হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলেন শিবানী, "ও দিদি, ও আমার রাজার স্কুলের বন্ধু সিদ্ধার্থ, এখন আমাদের এই থানায় পোস্টিং পেয়েছে, ডিউটি সেরে রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, দুজনে বেরোল থানায় জীপটা জমা দিয়ে আরেক বন্ধুর বাড়ি যাবে, আজ ওদের বন্ধুদের রিইউনিয়ন। আর বৌমা গেছে অফিস ট্যুরে চেন্নাই, চারদিন পরে ফিরবে।"

- "বলো কী! ও আচ্ছা, আমরা তো...বেশ তো...; সে তো ভাল কথা। আমরা তাহলে আসি।"

অনিতা এবং মালার এই পালানোর চেষ্টা থামিয়ে দিয়ে শিবানী বলেন, "এসেছেন যখন একটু মিষ্টিমুখ করে যান দিদি। পরশু আমাদের বিয়ের তিরিশ বছর হ'ল, কোনোদিন তো কিছু করি টরিনি; এই বছর বৌমা কেক, খাবার-দাবার এনে সে এক এলাহী কান্ড করল। একটু কেক খেয়ে যান। বসুন আনি।" হাসি চাপতে চাপতে ভিতরে যান শিবানী।

- "দেখেই যাই, বৌমা কেমন কেক এনেছে, ভাল দোকানের না সস্তায় সেরেছে... কি বলো মালা?" আবার গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েন অনিতা।

একলা পথ

বাপন দেব লাড়ু

প্রথমে সবকিছু নিখুঁত ছিল। অমিত আর রিনা, কলেজে পরিচয়, সেখানকার খুনসুটি, প্রেম, লুকিয়ে দেখা, পার্কের ঝালমুড়ি আর প্রথম স্পর্শের কাঁপুনি, সব পেরিয়ে এসে ওরা বিয়ে করেছিল পাঁচ বছর আগে। তখন তারা ভেবেছিল ভালবাসা থাকলে আর কী লাগে! একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল শহরের এক কোণে; নয়তলা থেকে দেখা যেত বিকেলের আকাশ কমলা রঙ ধারণ করে নিচে নামছে। শুরুর বছরগুলো যেন লম্বা একটা উজ্জ্বল ঋতু। অফিস ফেরৎ বৃষ্টি দেখলে ছাতা ছাড়াই দুজনে ঝটপট রাস্তায় নেমে পড়ত, রাতদুপুরে বিরিয়ানি আনত, রবিবার সকালে একসাথে রান্না করত। রিনার আবদার একটু বেশীই ছিল... আর আজেবাজে বকতে ভালবাসত, কখনও হাসি, কখনও অদ্ভুত সব অভিমান। সেই অভিমানও অমিতের কাছে ছিল আনন্দ। রিনার রাগ মানে ওকে আরও একটু ভালবাসা দেওয়া, একটু বেশি আদর আর কফি বানিয়ে দেওয়া, তারপর সব ঠিক।

কিন্তু ধীরে ধীরে গল্প বদলাতে লাগল, যেমন সব কিছুকেই বদলে দেয় সময়। পঞ্চম বছরে এসে অমিতের অফিসের কাজ বেড়ে গেল। ওকে প্রায় প্রতিদিন রাত দশটায় ফিরতে হতো। প্রথমে ফোনে রিনা জিজ্ঞেস করত, "আর কত দেরি?" তারপর বিরক্তি, তারপর অপেক্ষার বদলে অভিযোগ, "তুমি সবসময় দেরি করো। তুমি কেয়ার করো না।"

অমিত বোঝাতে চেষ্টা করত, "আজ খুব চাপ ছিল, রিনা।"

কিন্তু ওই একটা বাক্য যেন রিনার কানে ঘুরে ঘুরে শুধু একটাই মানে এনে দিত – তুমি আমার জন্য সময় দিতে পারো না। পরের দিনে রিনা সকাল থেকেই মুখ ফুলিয়ে থাকত। শুরু হ'ল ছোটখাটো কথা কাটাকাটি। অমিত হয়তো বলেছে, "চা দাও।"

রিনা উত্তর দিচ্ছে, "নিজে হাতে নাও, আমি কি সারাদিন একাই খেটে যাব?"

বিকেলে অমিত একটা নতুন প্ল্যান করল, "এই শনিবার আমরা সিনেমা দেখতে যাব, কেমন?"

রিনা বলল, "আমি আর বিশ্বাস করি না তোমার সেই প্ল্যান। অফিসে কাজ থাকলে আবার ফেলে দেবে।"

অমিত চুপ হয়ে গেল।

কেটে গেল আরও কয়েক মাস। অভিমান রিনার ভেতরে জমতেই থাকল, কিন্তু অমিত আর সেটা ভাঙানোর চেষ্টা করল না। রিনার সবচেয়ে বড় ভুলটা শুরু হ'ল এখান থেকেই। সে ধরে নিল যেহেতু অমিত চুপ করে রয়েছে, তাই সব দোষ ওর। শুধু অভিযোগ আর রাগ, আর মাঝেমধ্যে ভয়ংকর সব কথা, "আমি মরে গেলে বুঝবে! একদিন চলে যাব, তখন খুঁজে পাবে?"

এরপর একদিন সত্যিই এমন ঘটনা হ'ল যা সবকিছু বদলে দিল। অমিতের একটা অনেক বড় প্রেজেন্টেশন, তার প্রমোশনের সম্ভাবনা ছিল। সাথে সাথেই সে খুশি হয়ে আগের দিন রাতে রিনাকে বলে, "প্রার্থনা কোরো, আমার কালকের দিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

রিনা আন্দাজ করল, কালও সে হয়তো সময় পাবে না। ব্যস, সেদিন রাতেই শুরু হ'ল ঝগড়া। রিনা অকারণ ঝামেলা করল, অমিত হার মানল, রাতে ঘুম হ'ল না।

পরদিন সকালে অফিসে গিয়ে ভুল করে ফেলল। প্রেজেন্টেশন ভন্ডুল, বস হেসে বলল, "You seem distracted."

ওর প্রমোশন গেল, পাকাপাকিভাবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে সে লিফ্টে একা দাঁড়িয়েছিল। মনে হ'ল যেন বুকের ভেতর কেউ একটা ভারি পাথর বসিয়ে দিয়েছে। দুফোঁটা জল নামল চোখ থেকে, সেটাও সে লুকিয়ে ফেলল। সে আর রিনার কাছে কিছু বলল না। শুধু আরও বেশি চুপ হয়ে গেল। আর একটু একটু করে ভেতরে মরে যেতে লাগল প্রতিদিন।

রিনা তখনও বুঝল না। সে হয়তো ভাবছিল ওকে চুপ করিয়ে রাখা মানেই জিত! অথবা ও তো পালাতে পারছে না, তাই সবকিছু সহ্য করছে।

এরমধ্যে হঠাৎ একদিন অমিত বলল, "আমি চাই সামান্য একটু শান্তি। শুধু একটু নিজের মতো সময়।"

রিনা সে কথা শুনে উত্তর দিল, "ওহ, এবার বুঝলাম, তোমার অন্য কেউ আছে নিশ্চয়। তাই আর আমাকে সহ্য হচ্ছে না?"

সেই রাতে প্রথমবার অমিত মুখ ফিরিয়ে কাঁদল। কিন্তু আর কিছু বলল না।

পরের মাসে সে ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করল। যখন রিনাকে একথা জানাল, তখন রিনা প্রচন্ড রেগে উঠল, "তুমি পালাতে

চাইছ? আমি কি এতই খারাপ? যাও, যাও... আমি কারও কাছে মাথা নিচু করব না!"

ছুটির দিনের এক সকালবেলা অমিত সত্যি সত্যিই বেরিয়ে গেল। কোনো হাউমাউ, কোনো চোখের জল কিছুই দেখাল না। শুধু একটা ছোট ব্যাগ, একটা শান্ত মুখ আর একটা চাপা যন্ত্রণা নিয়ে বলেছিল "আমি চললাম, ভাল থেকো।"
তাও রিনা ভেবেছিল ও ঠিক ফিরবে, দু'দিন পরেই মেসেজ করবে, ফিরে আসবে। নিজেকে সে খুব সাহসী আর বিজয়ী মনে করছিল। কিন্তু অমিত ফিরে এল না।

তিন মাস কেটে গেল। প্রথমে সে ফোন করত, মেসেজ পাঠাত, কিছু উত্তর আসত, কিন্তু সবই শীতল, ভদ্র আর খুব দূরের। তারপর আর উত্তরও এল না।

একদিন বারান্দায় একলা চুপচাপ বসে চা খেতে খেতে হঠাৎ রিনা বুঝতে পারল, এই নীরবতাটাই আসল মৃত্যু, যেখানে কেউ মরে যায় না, কিন্তু সম্পর্ক মরে থাকে। ঘরের কোণ থেকে পুরনো একটা ফটো অ্যালবাম বের করে আনল। দুজনে পাহাড়ে গিয়েছিল, একটা ছবিতে রিনা পিঠে ব্যাগ নিয়ে সামনে হাঁটছে আর অমিত পেছন থেকে হাসিমুখে তাকাচ্ছে। সে ছবিটা দেখতে দেখতেই চোখ ঝাপসা হয়ে এল রিনার। সেদিন রাতেই সে মেসেজ করল, "অমিত, একটু কথা বলবে? আমি ভুল করেছি, খুব।"
কোনো উত্তর এল না। পরদিন দুপুরে একটা কুরিয়ারের পার্সেল এল। ভিতরে অমিতের হাতেলেখা একটা চিঠি আর একটা পুরনো চাবি। চিঠিতে লেখা ছিল –
তোমার রাগকে আমি অজস্রবার ক্ষমা করেছি। কিন্তু আমারও একটা মন ছিল, যেটা শুধু তোমারই কথা শোনার চেষ্টা করত। আমি আজ আর ফেরার কথা কল্পনাও করতে পারি না। তুমি যাকে হারিয়েছ, সে এখন আর আগের মতো নেই।
ভাল থেকো, শুধু এটাই চাই।
অমিত
সেদিন রাতে রিনা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, এতদিনের জেদ শিকল খুলে হৃদয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যে মানুষকে যতবার সে বলেছে "চলে যাই, মরে যাই", সেই মানুষই একদিন চুপচাপ চলে গেছে, সত্যিই, চিরদিনের জন্য। রিনা আগের মতো তর্ক করে বলার জায়গাও হারাল। কারণ আর কেউ নেই যে ওর কথার জবাব দেবে... এই প্রথম সে বুঝল, সম্পর্ক মানে জেতা বা হারার খেলা নয়। বুঝতে পারল একসাথে থাকার রাস্তার নাম ছিল অধৈর্যের বিপরীত দিক, সহনশীলতা।

তারপর একটা সন্ধ্যা, খুব নীরব। বাইরে টুপটাপ বৃষ্টি হচ্ছে। রিনা অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভেজা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিচে রাস্তায় গাঢ় আলোছায়া পড়ে আছে। দূরে কোথাও থেকে বাচ্চাদের হাসির শব্দ ভেসে আসে; কিন্তু তার ভেতরে শুধু একটাই শব্দ বেজে চলেছে, শূন্যতা।
সে ভাবল, কেউ যদি তখন একটু বলে দিত, 'থামো রিনা, তুমি যা হারাচ্ছ তা তোমার জানা নেই...' তাহলে হয়তো সবকিছু অন্যরকম হতে পারত।

কিন্তু বাস্তব গল্পে 'হয়তো' শব্দটা খুব একটা কাজে দেয় না। কারণ যা হওয়ার থাকে, সেটাই হয়ে যায় শেষপর্যন্ত। আর কিছু মানুষ সারাজীবন হাঁটে একলা পথ ধরে। এই সম্পর্কের পরিণতি শুধু সময়ই জানে। এইভাবে কত সম্পর্ক হারিয়ে যায় শুধু যত্নে প্রতিপালন না করার জন্য, একে অপরকে না বোঝার জন্য আর পরিস্থিতির গভীরতা না বুঝতে পারার জন্য।

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ১৪৩২ (2025)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হয়।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word**-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030-2802
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর পনেরো দিন আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

শুভ শারদীয়া